(সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী)

'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্‌ ॥"

শ্রীমতী ননীবালা ঘোষ

দুই টাকা

উপহার

সুবিখ্যাত প্রফেসর ও সুসাহিত্যিকের অভিমত

কাশ্মীর ভ্রমণ বিষয়ক এই "আর্য্যাবর্ত্ত" গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের এক উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। শ্রীমতী বনবালা ঘোষ পাকা লেখিকা। বইয়ের ভিতর পাই পর্য্যটনের গতিভঙ্গী আর নদী, পর্ব্বত, বন, জঙ্গল ও হরেক প্রকার নরনারীর সঙ্গে কুটুম্বিতা পাতাইবার নেশা। তাই কাশ্মীরি পল্লী-সহর গুলা চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। পাহাড়ী উপত্যকার লহরে লহরেও গ্রন্থকর্ত্রীর চিত্ত যথোচিত সাড়া দিয়াছে। আবোল তাবোল ভাবোচ্ছ্বাসের দিকে তাঁহার প্রাণ খেলে নাই। খুঁটি-নাটি গুলা বেশ ঠিকঠাক ধরিয়া রাখিবার দিকেই তাঁহার মেজাজ খেলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্তর হইতে সরস দরদশীল কবিতাও কয়েকটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বাঙলার নরনারী অনেক দিন ধরিয়া এই বই ভ্রমণ সাহিত্যের অন্যতম রত্ন বিবেচনা করিবে।

(সাক্ষর) শ্রীবিনয়কুমার সরকার

১৪ নভেম্বর, ১৯৩৩।

নিবেদন

পূর্ব্বে অনেকবার অনেক দেশ ভ্রমণ ক'রেছি, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন কিছু লেখবার জন্য একটা ইচ্ছা হয় নাই। কেবল মাত্র মাস্‌বার রাজপুতানা ভ্রমণকালে একবার সে ইচ্ছা মনে জেগেছিল বটে, কিন্তু নানা কারণে তাহা কার্য্যে পরিণত ক'রতে পারি নাই। এবার কাশ্মীর ভ্রমণ ক'রে সে সম্বন্ধে যে কিছু লিখব, এমন সঙ্কল্পও আমার বিশেষ ছিল না। কেবল বান্ধবের অনুরোধে এবং কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হ'য়ে অর্থাৎ স্বভাবে—বিশেষতঃ একমাত্র দুহিতা ও জামাতাকে এই সৌন্দর্য্য দর্শনজনিত সুখের অংশ বণ্টন ক'রে দেবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল,—তাই এই লেখনী ধরা। জানি না, ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের কতটুকু সুষমা, তাঁদের মানস নয়নে উপস্থিত ক'রতে পারলাম। স্বল্প শিক্ষিতা নারীর পক্ষে এ কাজে হস্তক্ষেপ করা বিড়ম্বনা মাত্র। যা দেখেছি তা সংগ্রহ ক'রতে যতদূর পারি, তাহাই লিপিবদ্ধ ক'রেছি। কাশ্মীরের পণ্ডিত শিবশর্ম্মা [illegible] ও অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হ'তে এবং অন্য স্থান হ'তে ঐতিহাসিক তত্ত্ব সকল সংগ্রহ ক'রেছি। সুতরাং এর স্থানে অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে, তবে ভরসা এই যে, আমার এই প্রথম উদ্যমের সকল ত্রুটি, সহৃদয় পাঠক পাঠিকা নিজ গুণে ক্ষমা ক'রে নেবেন।

যেতে যতদূর পেরেছি, জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ ক'রতে চেষ্টা ক'রেছি। এ হ'তে যদি ভ্রমণকারীর কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার হয়,—অথবা পাঠক-পাঠিকা পাঠ ক'রে কিছু আনন্দ লাভ করেন, তবে আমার শ্রম সফল জ্ঞান ক'রব। নিবেদন ইতি—

ধপধপী, ২৪ পরগণা
৪ঠা আশ্বিন, ১৩৪০ সাল

লেখিকা
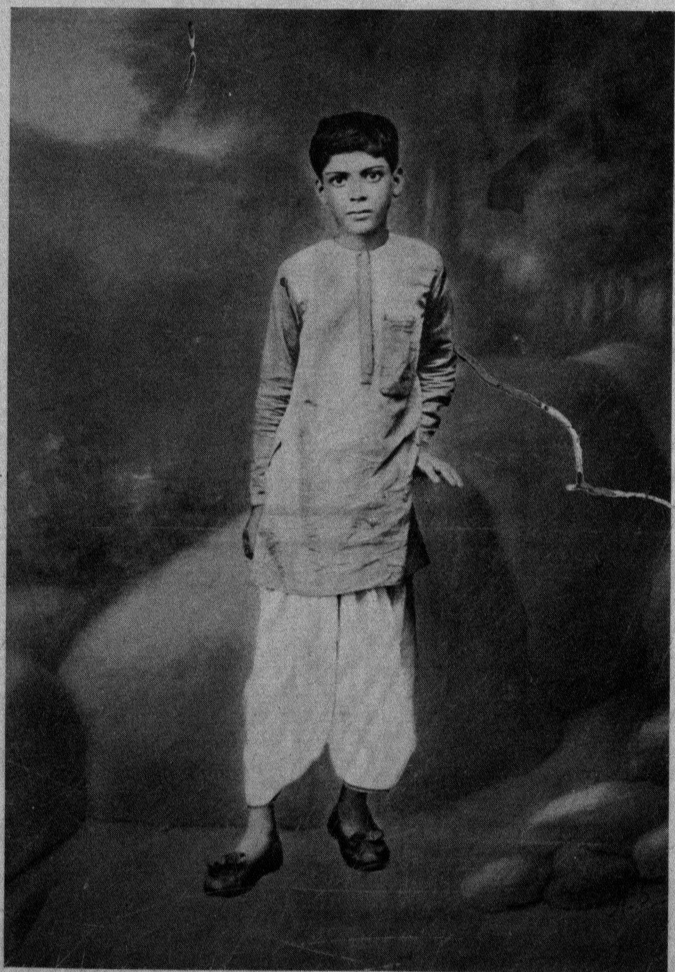
অজানা দেশে—চিত্তরঞ্জন ঘোষ

উৎসর্গ

রঞ্জন !

যতবার যেখানে গিয়েছি—তোমরা দুটী ভাই-বোন আমার কাছ-ছাড়া হওনি। কিন্তু এবার কাশ্মীর যাবার সময় তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পেলাম না। তোমার দিদিমণি এখন শ্বশুরবাড়ী—স্বামীর ঘরে; আর তুমি—জানি না ও-পারের ঐ অজানা দেশের কোন্ অজানা স্থানে চ'লে গিয়েছ? আমার কোল শূন্য ক'রে—কার কোলে আশ্রয় নিয়েছ!

এক এক ক'রে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাত-সাতটী বছর কেটে গেল। এই সাত বছর—এই শূন্য কোলে তোমায় ফিরে পাবার জন্য কত ডাক্‌লাম, কত কাঁদ্‌লাম, কিন্তু বাবা! কই, তুমি ত আর ফিরে এলে না—অভাগিনী মায়ের ডাকে সাড়া দিতে—আকুল অশ্রু মুছিয়ে দিতে?

জানি আমি—জগৎ-স্বামীর শান্তিময় কোল পেয়ে তুমি আমার কথা ভুলে গিয়েছ। কিন্তু আমি যে এই সাত বছর ধ'রে চেষ্টা ক'রেও মনকে শান্ত ক'র্‌তে পার্‌লাম না। প্রাণের জ্বালায় দেশ-বিদেশে ছুটাছুটী ক'রে বেড়ালাম—তীর্থে তীর্থে বেড়ালাম, তবু ত প্রাণের জ্বালা গেল না!

দেশ ভ্রমণে তোমার কতই আনন্দ হ'ত। শিমলা শৈল থেকে, পাঞ্জাব ও রাজপুতনা এবং বিহার—সব জায়গায় তোমার সেই আনন্দে আমরাও যোগদান ক'রে সাথে সাথে ঘুরে বেড়িয়েছি। দার্জ্জিলিংএর তুষার শুভ্র শৈল-শিখর, পুরীর সমুদ্রের নগ্ন সৌন্দর্য্যের শোভা, তোমার পিতার নিকট শুনে, তা দেখ্‌বার জন্যে আমার কাছে নিজের ইচ্ছা

সে বাবা ! একবার এস—অশরীরী আত্মা নিয়ে, অদৃশ্য দেহ কেন—ঐ অদৃশ্য পথ দিয়ে এই শোক-তাপ দগ্ধা জননীর শূন্য কোলে। যে দেবতার অশেষ কৃপায়—আজ এই শোক-সন্তপ্ত উদ্দেশ্যহীন প্রাণ নিয়ে এই 'স্মরণ-কাহিনী'—মালার আকার দিয়ে গ্রথিত ক'রে তোমার উদ্দেশে উৎসর্গ ক'রলুম, আমরা দুই মায়ে-পোয়ে সেই দেবতার চরণে এ মাথা পাতিয়ে দিয়ে ধন্য হই। ইতি—

তোমার অভাগিনী মা।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

চিত্রসূচী

আর্য্যাবর্ত্ত

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

সুদীর্ঘ পাঁচটা মাস প্রবাসে বাস কর্‌বার পর, প্রথম নিদাঘের একটা রৌদ্র-তপ্ত দুপুর বেলায় আমরা বাড়ী ফিরে এলাম।

সেই যে আশ্বিন মাসে, মায়ের নবমী পূজার দিনে ঠাকুরদালানে, বালিকা ছাত্রীদের সঙ্গে ফুলে, জলে, চন্দনে মায়ের পূজা সমাপ্ত ক'রে এসে শয্যা গ্রহণ করেছিলাম, মাসের বাকী দিনগুলো সেই শয্যায় পড়েই কাটিয়ে দিতে হ'য়েছিল। বাঙ্গলার সারা বছরের দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ, রোগ-শোক দূর ক'রে দিয়ে, তিনটে দিনের জন্য নিরানন্দ প্রাণে আনন্দের হাসি ফুটিয়ে তুল্‌তে যে আনন্দময়ী মায়ের আগমন,—কোথা দিয়ে কেমন ক'রে যে, সেই আনন্দময়ীর বিজয়া দশমীর হর্ষ-বিষাদ-বিজড়িত মিলনোৎসব-রজনী অতিবাহিত হ'য়ে গিয়েছিল, সেটাও অনুভব ক'র্‌তে পারিনি।

ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর অপার অনুগ্রহে বাড়ীখানা হাঁসপাতালে পরিণত হ'য়েছিল। একমাত্র আদরিণী কন্যা উমারাণী, আর তার শিশুপুত্র দেবীপ্রসাদ দিনের পর দিন রোগে ভুগে অস্থিচর্ম্মসার হ'য়ে প'ড়ল। এক মাত্র আদরের শিশু পুত্রের কুসুম পেলব অনাবিল হাসি-মাখা মুখখানি, রোগ-পাণ্ডুর হাস্যহীন দেখে, জামাতা বাবাজী নিশ্চেষ্ট হ'য়ে থাক্‌তে পারলেন না। সত্বরই নিজের স্ত্রী-পুত্রকে রাঁচিতে স্থানান্তরিত কর্‌লেন।

কিন্তু মানুষ যা ভেবে যে কাজ করে, অলক্ষ্যে থেকে বিধাতা পুরুষ ঠিক তার গতি বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দেন। পাঁচ সাত দিন যেতে না যেতে হঠাৎ রাঁচি থেকে জামাতা বাবাজীবনের জরুরী সংবাদ এলো, উষারাণী পীড়িতা, আপনারা সত্বরই চলে আসবেন।

তখনও আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই শয্যাগত; এবং পূজার পর, বাসি বাসরের মত বাড়ীটি পরিজন-পরিত্যক্ত, চারিদিকে দ্রব্যাদি-বিক্ষিপ্ত ও শ্রীহীন অবস্থায় অবস্থিত। এ অবস্থায় বাড়ী ছেড়ে যাওয়া এক রকম অসম্ভব, তত্রাচ থাকতে পারলাম না। স্নেহের টান—আদরিণী দুহিতার রোগশীর্ণ মুখখানির কথা মনে পড়তেই প্রাণটা অস্থির হ'য়ে উঠলো। নিজেদের যা হয় হ'ক—পরদিনই যাত্রা করা স্থির হ'ল।

বউমা—জ্ঞাতি ভাসুরের পুত্রবধূ—বাড়ীর তত্ত্বাবধানের ভার নিলেন। ঘর-সংসারের সকল দায়িত্ব তাঁর উপর সমর্পণ ক'রে ও গৃহ-দেবতাদের নিত্য সেবার আবশ্যক মত ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে, পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা রাঁচি যাত্রা করলাম।

তারপর সুদীর্ঘ পাঁচ্‌টা মাস রাঁচিতেই কেটে গিয়েছিল।

১৩৩৭ সালের চৈত্র মাসের ১২ই বৃহস্পতিবারের দুপুর বেলা, প্রবাস বাস সাঙ্গ ক'রে উষার শিশুপুত্র দেবীবাবুকে সঙ্গে নিয়ে, আমরা স্বামী স্ত্রী দু'জনেই নিজেদের সেই পল্লী-ভবনের বাড়ীখানিতে ফিরে এলাম। দাদু—দেবীবাবু আমাদের, তার নবজাতা শিশু ভগিনীটিকে (নানাপুতুকে) তার মার কোলে নিতে দেখ্‌লেই কান্না জুড়ে দেয়, ইচ্ছাটা—'ওকে ফেলে আমায় কোলে ক'রে লও।' কিন্তু তার মা (উষারাণী) তার সে আদর টুকু যে অনেক সময় পছন্দ করতো না, অভিমানী বালক সেটা বুঝে নিতে পারত! কাজে কাজে সে আর তার মার কাছে থাকতে তেমন ভালবাসতো না। রাঁচি থেকে বরাবরই

আমার সঙ্গে চ'লে এল,—আমাদের পল্লীমায়ের শান্ত শীতল কোলে,—ধপধপীর বাড়ীতে।

বধূমাতা সে বেলার মত বালকের ভার নিলেন। পুরোহিত ঠাকুরও ওঁকে (স্বামীকে) নিজের বাড়ীতে প্রসাদ পাবার জন্য আহ্বান ক'রে নিয়ে গেলেন। সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত মনে,—ধুলা-কাদা-মাখা দুষ্ট ছেলের মত বাড়ীখানাকে, ধূলি-জঞ্জাল হ'তে যথা সম্ভব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে, শেষ বেলায় স্নান ক'রে এলাম।

সে দিন ছিল—চৈত্র মাসের লক্ষ্মী পূজা। বধূমাতা মায়ের পূজার আয়োজন করেছিলেন। তাঁরই যত্নে আমি মায়ের প্রসাদ পেলাম।

আহারাদির পর, যখন মায়ের স্নেহ-শীতল কোলটির মত ঘরের মেঝেয়, নিজের দেহ ঢেলে দিয়ে বিশ্রাম করবার অবসর পেলাম, তখন মনে হ'ল,—'এটি আমার নিজের ঘর।' অতএব মনে বড় শান্তি পেলাম। বোধ হয় দীর্ঘ প্রবাসের পর, নিজের বাড়ী ফিরে এলে সকলেরই মনের অবস্থা এই রকমই হ'য়ে থাকে।

দু'চার দিন কাটতে না কাটতে উনি আবার আরম্ভ ক'রলেন—"চল একবার কাশ্মীর ঘুরে আসা যাক্।" কথাটা কিন্তু আমার মোটেই পছন্দ হলো না। এখন আমার এই নিজের বাড়ী, মায়ের ছায়া-শীতল কোলটি ছেড়ে আবার বিদেশে যাবার একটুও ইচ্ছা ছিল না। একে শরীর দুর্ব্বল, তার উপর বহুদিনের পরিত্যক্ত বাড়ী, ধুয়ে মুছে গুছিয়ে নূতন ক'রে সংসার পাত্‌তে শরীর আরও অবসন্ন হ'য়ে পড়েছিল; ইচ্ছা ছিল, কিছু দিন নিশ্চিন্ত হ'য়ে শান্তি উপভোগ করবো। কিন্তু সে-টা হ'য়ে উঠ্‌লো না। নিজের ইচ্ছায় অবাধ্য হ'য়ে তাঁকে মনঃক্ষুণ্ণ করতে পারলাম না। অগত্যা রাজি হ'তে হ'ল।

যাত্রা

এ দিকে উনিও কাশ্মীর যাত্রার দিনাস্থির ক'রে ফেল্‌লেন। সঙ্গে সঙ্গে আয়োজনও হ'তে লাগল। তারপর নির্দ্দিষ্ট দিনে, পুরোহিত ও সেবাইতের উপর গৃহ-দেবতাগণের সেবার ভার সমর্পণ করে ও বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের আবশ্যক মত বন্দোবস্ত সেরে ফেলে, শ্রীদুর্গার নাম স্মরণ ক'রে যাত্রা করলাম।

সে দিন শনিবার। ১৩৩৮ সালের বৈশাখ মাসের ১২ই তারিখের নিস্তব্ধ দুপুর বেলায় পল্লীমায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে ষ্টেশনের দিকে রওনা হ'লেম। ইচ্ছা ছিল, রাত্রি দশটার গাড়ীতে কাশ্মীর যাত্রা করা। সঙ্গের সাথী—দেবীপ্রসাদ বাবু। বন্দোবস্ত হ'য়েছিল, দেবীর বাবা বিভূতি, হাওড়া ষ্টেশন থেকে দেবীবাবুকে নিয়ে যাবে, আর আমরা কাশ্মীরের উদ্দেশে দূর পথের যাত্রী হ'ব।

কিন্তু বিধিচক্রে আর একরকম হ'য়ে গেল। হাওড়া ষ্টেশনে বিভূতির সঙ্গে দেখা হ'ল না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করা গেল। ট্রেনের শেষ সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রে, অগত্যা ট্যাক্সি ডেকে লগেজ ব্যাগেজ নিয়ে দেবীবাবুর পৈতৃক বাসস্থান—ব্যাঁটরা কদমতলার উদ্দেশে যাত্রা ক'রতে হ'ল।

এবারকার এ যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, গোপনে কাশ্মীর যাওয়া, এবং সেখান হ'তে পর দিনে আত্মীয় স্বজনকে তাক্ লাগিয়ে দেওয়া,—কিন্তু অন্য রকম হ'য়ে গেল। আমরা যখন দেবীবাবুদের কদমতলার বাড়ী এসে পৌঁছিলাম, তখন রাত প্রায় এগারটা। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ আমাদের দু'জনকে সেখানে উপস্থিত হ'তে দেখে, বাড়ীর

সকলেই অবাক হ'য়ে গেলেন। ব্যাপারটা জানবার জন্য সকলেরই ঔৎসুক্য। ব্যাপারটা আর গোপন থাকে না, প্রকাশ হ'য়ে যায় বুঝি। তবু যতটা সম্ভব, গোপন ক'রে বলা হ'ল "যাচ্ছিলাম কাশী, কথা ছিল দেবীকে ওর বাবা হাওড়া ষ্টেশন থেকে নিয়ে আসবে, আর আমরা চলে যাব। কিন্তু তা হ'ল না, দেবীর বাবা ষ্টেশনে দেবীকে আন্‌তে গেলো না। কাজেই আমরা সশরীরে আপনাদের বাড়ীতে এসে হাজির হলাম।"

বাবাজী একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে ব'ললেন—"আজকের তারিখটার কথা আমার ভুল হ'য়ে গেছে।"

বাড়ীর সকলের সে বেলার মত আহার শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। আমাদের জন্য আবার নূতন ক'রে আহারের ব্যবস্থা ক'রতে সকলেই ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। "সঙ্গে খাবার আছে, কিছুই আয়োজন করবার দরকার হ'বে না"—ব'লে বারংবার নিষেধ করা সত্ত্বেও—নিষেধ না শুনে সেই রাত্রেই আমাদের জন্য আবার রন্ধনের আয়োজন হ'ল। আমাদের সঙ্গের খাবার দেখে লক্ষ্মী মেয়ে উষারাণী সন্তুষ্ট হয় নি। তখনই ঠাকুরকে দিয়ে মাছের তরকারী রাঁধিয়ে নিয়ে, এবং নিজে ষ্টোভে লুচি ভেজে কাছে ব'সে তার পিতৃদেবকে আহার করিয়ে ছাড়লে। বোধ হয় তা না ক'রতে পারলে, তার মনে শান্তি হ'ত না। কিন্তু দেবী বাবুকে আর কিছু খাওয়ান গেল না। আহা! বেচারী সেই—কোন্ দুপুর বেলা একটুখানি মাত্র দুধ মুখে দিয়ে আমাদের সঙ্গে এসেছে। পথশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে বাছা যেন শুকিয়ে নেতিয়ে পড়েছিল। তার ওপর তত রাত জেগে থাকা বালকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হ'য়েছিল। ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন বালককে আর কিছুই খাওয়াতে পারা গেল না। শোবার সময় আমার কাছে শোবে, আর কারুর কাছে শোবে না ব'লে

বাযনা ধ'বে আমাব কাছে এসেই ঘুমিয়ে প'ড়ল। কিন্তু তাবপব যেমন বিজলী বাতি নিবিয়ে দেওযা হ'ল, অমনি বুড়োব ভযে দাদুব ঘুম ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কান্না—"বুযো (বুড়ো) আসবে, দাদু। আযো (আলো) আমা চাই।" অর্থাৎ কিনা আমি অন্ধকাবে থাকব না বুড়ো আসবে। কিন্তু যখন দেখলে বুড়োব আসবাব পথ বন্ধ কববাব জন্য আলো জ্বালবাব কোনও বন্দোবস্ত হ'ল না, তখন তাব মাব কথা মনে প'ড়ল। সঙ্গে সঙ্গে উষা মাযেব কাছে যাবাব জন্য আবাব কান্না জুড়ে দিল। উষা মা এসে হাজিব। আব দাদুব বিছানা পছন্দ হ'ল না, উষা মাব কোলে উঠে অন্য ঘবে চ'লে গেল।

সেই বাত্‌টা যে কি ভাবে কেমন সুনিদ্রায কেটে গিয়েছিল,—অনেক দিন সে কথা মনে থাকবে। কি মশাব দৌবাত্ম্য এই ঝাঁটাবা গ্রামখানিতে। সমস্ত বাতেব ভিতব চোখেব পাতা দু'টো একবাবেব জন্য বন্ধ ক'বতে পাবা যায নি। মশাব কামড়ে গাযেব জ্বালায অস্থিব হ'যে সাবা বাত্‌টা খাটেব ওপব কাত্‌লা মাছেব মত আছাড খেযেছিলাম। মশাবি থাকলে কি হ'বে,—দাদুব দৌবাত্ম্যে তাবা দলে দলে বাহিব থেকে ভিতবে এসে আশ্রয় নেবাব সুবিধা পেযেছিল। উনি ত সমস্ত বাত পাখা নেড়েই ক্লান্ত হ'লেন। এম্‌নি কবে সকাল হ'য়ে গেল।

১৩ই বৈশাখ ববিবাব, সকালে উঠে নিজেব শবীবেব দিকে চেয়ে মনে হ'ল,—বুঝি বসন্ত হ'য়েছে। যাই হোক্, যথা সময়ে স্নানাদি ক'বে আমাদের মাযেব হাতেব বান্না নানা বকমেব ব্যঞ্জন, আব দ্বাবভাঙ্গাবাসী ব্রাহ্মণেব হাতেব ভাত পবিতোষকপে আহাব ক'বে সমস্ত দুপুবটা খুব নিদ্রা দেওযা গেল। বিকালেব দিকে দু'টি সোণাব পুতুল নিয়ে খানিকটা খেলা চললো। পুনশ্চ স্নানাদি ক'বে সন্ধ্যাবেলা উষাবাণীর
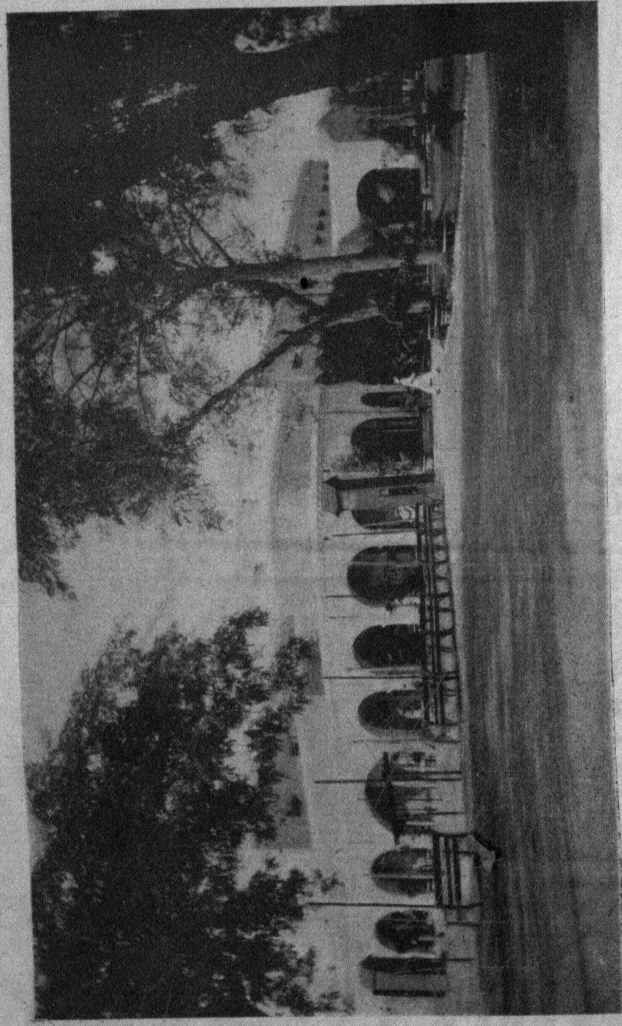
রাওলপিণ্ডি—অফিসারদের ক্লাব

নিজ হাতের প্রস্তুত আহারাদি গ্রহণ ক'রে, রাত্রি আটটার সময়, মায়ের চোখের জল, দাদুর কান্না এবং আত্মীয়-স্বজনের বিদায় সম্ভাষণের মধ্য দিয়া, কাশ্মীরের পথের সন্ধানে ডেরাডুন এক্সপ্রেসের উদ্দেশে, হাওড়া ষ্টেশনের দিকে রহনা হওয়া গেল। বালাজীবন পূর্ব্বাদনের ক্রুটি সংশোধন ক'রে, বরাবর আমাদের সঙ্গে এসে, আমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে, কিছু না ক'রে বসিয়ে, আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ী চলে গেলেন। (হাওড়া থেকে সাহারাণপুর দিয়ে রাওলপিণ্ডির ইন্টার ক্লাসের ভাড়া ২৮৸১০ আনা) রাত্রি ১০—১০ মিনিটের সময় ডেরাডুন এক্সপ্রেস ছাড়লো। মনের ইচ্ছা যে, প্রথমে ৺ বাবা বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করে, পবিত্র বারাণসীর ধূলি মাথায় ক'রে, মা অন্নপূর্ণার নিকট দীর্ঘ যাত্রা পথের সম্বল, করুণা ভিক্ষা নিয়ে যাব। ৺ বাবা বিশ্বেশ্বরকে স্মরণ ক'রে আপনার স্থানটীতে শুয়ে পড়লাম। উনি বসেই রইলেন। আমরা পুরা একখানা বেঞ্চ অধিকার করেছিলাম। আমি অতিশয় ক্লান্ত হওয়ায়, উনি মাঝে মাঝে আমাকে বাতাস দিচ্ছিলেন। এতে আর একটা সুবিধা হ'ল এই যে, গাড়ীর অন্য লোকগুলি মনে ক'রছিলেন—আমি বুঝি অতিশয় রুগ্না। একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসাও ক'রলেন—"মশায়, ওঁর কি অসুখ?" উনিও ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। কাজেই আমি রোগী সাব্যস্ত হ'লাম; এবং আমার উঠাও একদম নিষেধ হ'য়ে গেল। মাঝে মাঝে আমি যেই মাথা তুলে বলি, 'তুমি একটু শোও,' অমনি উনি আমাকে 'উঁহু তুমি শুয়ে পড—শুয়ে পড়' বলে নিরস্ত ক'রে দেন। কাজেই ওঁকে বসেই রাত কাটাতে হ'ল। সত্যি কথা, তখন আমার ব'সে থাকবার মত শরীরের সামর্থ্য ছিল না।

কাশী

পরদিন ১৪ই বৈশাখ সোমবার বেলা এগারটার সময় বেণারস ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিল। আমরা গাড়ী থেকে নেমে পড়্লাম। কুলিরা মোটগুলি নামিয়ে প্লাটফরমে রাখলো। আমরা দু'জনে পরামর্শ ক'চ্চি যে, কোথায় উঠ্‌বো। এমন সময় এক পাণ্ডা এসে ধ'রলো। ভালই হ'ল, তার সঙ্গে যাত্রা করাই স্থির হ'ল। সে আমাদের দুজনকে দশাশ্বমেধ ঘাটে * * মুখোপাধ্যায়ের যাত্রী-নিবাসে নিয়ে গেল। ষ্টেশন থেকে দশাশ্বমেধ ঘাট ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া বার আনা, বাস একখানা এক টাকা। কুলির অত্যাচার ভয়ানক। তা'দের সঙ্গে ব'কতে ব'কতে মাথা গরম হ'য়ে যায়। কুলির অত্যাচার সর্ব্বত্রই প্রায় এইরূপ,—শুধু কাশ্মীরে নয়। কাশ্মীরে কুলি খুব সস্তা—এমন কি এক পয়সাতেও পাওয়া যায়।

যাত্রী-নিবাসের মালিক * * লোকটী ভাল, বাড়ীটিও বেশ, একবারেই গঙ্গার উপর। উপরে নীচে কল। মুখোপাধ্যায় পাণ্ডার দ্বারা তীর্থাদি ক্রিয়া করালে ঘর ভাড়া দিতে হয় না,—নচেৎ দৈনিক প্রতি ঘর এক টাকা হিসাবে ভাড়া দিতে হয়। আমরা গঙ্গার দিকে উপরের একটী ঘর নিলাম। শুনলাম্, আমাদের পাশের ঘরে এক ব্রাহ্মণ-কন্যা এসেছেন। ভালই হ'ল। উপরে আর কোনও ভাড়াটে নাই। নীচে তিন চার ঘর ভাড়াটে আছে। তার মধ্যে এক জন ঝি, সে বাড়ী দেখা-শুনা করে ব'লে তাকে ঘর ভাড়া দিতে হয় না। তার হাত দু'টী শুধু, একখানা লাল রঙের লেস পাড় কাপড় পরা। সে ব'ললে—তার অন্ধ মাকে নিয়ে সে এখানে বাস করে। অন্য ঘরে, এক ঘর বারুই বাস করে, বোধ হ'ল তারা স্বামী-স্ত্রী। একটী বৌ আছে। তার একটী মেয়ে হ'য়েছে—হাঁসপাতালে আছে। ঝি তা'কে রোজ দেখ্‌তে যায়।

বৌটী নাকি বিধবা। গিন্নিকে ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করায়, গিন্নি ঠেক খেয়ে খেয়ে ব'ললে—'ছেলেটী দেড বৎসর হলো মারা গেছে।' শুনে আমার বুকের ভিতর কেমন ক'রে উঠল,—হায় রে পুত্র-হারা জননী! মনে হ'ল—আমার চিত্তরঞ্জন! জিজ্ঞাসা করলাম—'আহা তাই বুঝি তোমরা এখানে এসে বাস ক'রছ? গিন্নি থেমে থেমে বল্লে—'হাঁ। আর তিনটী ছেলে আছে।' জিজ্ঞাসা করলাম্ 'বৌটী হাঁসপাতালে কেন?' ব'ললে 'বৌয়ের অসুখ।' দুঃখিত হ'লেম। পরে শুনলাম্—ঐ বৌ অন্তঃসত্বা হ'য়েছিল, সেটী নষ্ট করবার জন্য হাঁসপাতালে গিয়েছে। আজ ঘরে আস্‌বে। হরি! হরি!! আর একটী ঘরে একটী বিধবা ও অন্য ঘরে দু'টী ছোক্‌রা।

কাশী জায়গা অতি ভয়ানক। এখানে এইরূপ অনেক যাত্রী-নিবাস আছে, কিন্তু অধিকাংশ যাত্রী-নিবাসগুলি নিরাপদ নয়। উপর হ'তে ইহাদের গৃহস্থের মতই দেখায়, কিন্তু ভিতর অন্যরূপ। এখানে ভদ্র গৃহস্থের অতিশয় সাবধানে থাকা উচিত।

আমরা ঘরে জিনিষ-পত্র রেখে পাণ্ডাকে সঙ্গে নিয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান ক'রতে গেলাম। পরে ৺ বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে গেলাম। আহা, বাবার মন্দির কি শান্তিময় স্থান! মন্দিরের মধ্যে মস্ত রূপার প্রদীপে সুগন্ধি ঘৃতের প্রদীপ জলছে। মধ্যে রূপা-বাঁধান কৃত্রিম সরোবরের ভিতর, রাশি রাশি প্রস্ফুটিত পদ্মের মধ্যে জল-নিমজ্জিত বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজ করছেন। বাবার মাথার উপর, একটী প্রকাণ্ড রূপার ঝারা হ'তে বৃষ্টির মত বিন্দু বিন্দু জলকণা, বাবার মাথা এবং ঘরের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ছিটিয়ে পড়ে ঘরটীকে স্নিগ্ধ শীতল ক'রে রেখেছে। দেয়ালের গায়ে আর একটী রূপার পদ্ম-কোরকাকৃতি ঝারা হ'তে, একটী মাত্র ধারা ফিনিক দিয়ে বাবার মাথায় এসে পড়েছে। ঘরটী ধূপ-ধুনার গন্ধে ভরপূর।

দরজায় খসখসের ভিজা পরদা। ভক্তগণের কণ্ঠোচ্চারিত মধুমাখা স্তোত্রগাথা, পূজকগণের বেদধ্বনিযুক্ত পূজামন্ত্র, আর মাঝে মাঝে 'হর হর বোম বোম' নিনাদের সঙ্গে গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি, সকলগুলি একত্র হ'য়ে স্থানটীকে যেন তপোবনের শান্তি দিয়ে পূর্ণ ক'রে রেখেছে। আমি কাশীতে অনেকবার এসেছি, কিন্তু ৺বাবা বিশ্বনাথের এই বৈশাখী রূপ-দর্শন, আমার ভাগ্যে আর কখনও ঘটেনি। এ দৃশ্য যাঁরা দেখেছেন—ভক্তিতে তাঁদের হৃদয় ভ'রে গিয়েছে,—চোখে আনন্দের অশ্রু ফুটে বেরিয়েছে। শান্তিহারা আমি,—তাই আমার চোখে জল এল না! যথাশক্তি বাবার পায়ে অঞ্জলি দিয়ে প্রণাম ক'রতে গিয়ে, কি কামনা ক'রতে হ'বে, তা ভুলে গেলাম। শেষে কলের পুতুলের মত বাবাকে প্রণাম ক'রে বেরিয়ে এসে, একবার মন্দির প্রদক্ষিণ ক'রে মা বিশ্বেশ্বরী অন্নপূর্ণার উদ্দেশে চললাম।

তখন অন্নপূর্ণার মন্দির বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে, এবং সামনের দরজায় দু'জন পাণ্ডা চরণামৃত ল'য়ে দরজা জোড়া ক'রে বসে আছে। যেন ঘরে কেউ না প্রবেশ ক'রতে পারে। আমার শুষ্ক নীরস হৃদয়ে মায়ের চরণ স্পর্শ করবার কামনা এল না। আমি নাটমন্দিরে ব'সে মায়ের দরজায় মায়ের নামে, যথাশক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে, মন্দির প্রদক্ষিণ ক'রে বেরিয়ে এলাম।

ওর তখন খুবই কষ্ট হচ্ছিল। বেলাও অনেক হ'য়েছে,—বোধ হয় দু'টা হ'বে। বৈশাখ মাস,—এ সময় এখানে দারুণ গ্রীষ্ম। দ্বিপ্রহরে—পাথরের রাস্তা আগুনের মত উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে। খালি পায়ে চলা একরকম অসম্ভব। বাতাসও যেন আগুনের হল্কা,—সারা সহরটা পুড়িয়ে দিচ্ছে। নিঝুম দুপুর বেলা প্রকৃতির সেই অসহ্য তাণ্ডব-লীলায় অনেকে দোকানপাট বন্ধ ক'রে থাকে।

কিন্তু সন্ধ্যার সময় কাশী নগরী যেন উৎসবের আনন্দে মেতে উঠে। সমস্ত দোকান পাট সুসজ্জিত হ'য়ে রাজপথের শোভা বৃদ্ধি করে। গঙ্গার ধারে—প্রায় প্রতি স্নানের ঘাটে গান, কীর্ত্তন, কথকতা ও ধর্ম্ম-কথার আলোচনা হয়। স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে অনেকেই সেই আলোচনায় যোগদান করেন। স্থানে স্থানে নানাবিধ তামাসার ব্যবস্থা আছে। সে সময় ভ্রমণরত নাগরিকগণের বেশ-ভূষার পারিপাট্যে, আতর গোলাপের সুগন্ধে, মধুর হাস্য কোলাহলে—কাশী নগরী উল্লাসে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে,—মনে হয় যেন কাশীর প্রত্যেক স্থানেই উৎসব।

প্রাতঃকালে কাশীর অন্য মূর্ত্তি। ভোর চারটা থেকে, 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' শব্দে সুষুপ্ত নগরী আনন্দে জেগে উঠে। হিন্দু স্ত্রী পুরুষ প্রায় প্রত্যেকেই গঙ্গাস্নানের ও দেবদর্শনের উদ্দেশে—অধীর আগ্রহে পথ অতিবাহিত করে। প্রত্যেকের মুখেই পুণ্যময় ধ্বনি ফুটে উঠে, সমস্ত সহর যেন ভক্তির বন্যায় ভেসে যায়।

আমরা মা অন্নপূর্ণার মন্দির থেকে বাসার দিকে ফিরলাম। ফেরবার পথে, কিছু দধি ও ফল কিনে নিলাম। সঙ্গে মিষ্টান্ন ছিল। বাসায় এসে পাণ্ডা ঠাকুরকে কিছু জলযোগ করিয়ে বিদায় দিয়ে, ওঁকে সেই সব ফল কেটে, এবং সঙ্গে যে চিড়ে ছিল, তাই আর দধি খেতে দিলাম। উনি খেতে ব'সলেন,সেই অবসরে কিছু সন্ধ্যা-ভজন ক'রে রোজ-সই ক'রে নিলাম। তার পর ওঁর পাতে প্রসাদ পাওয়া গেল। আহারাদি শেষ ক'রে নিতে একেবারে বেলাও পড়ে গিয়েছিল। অপরাহ্ণের দিকে—জিনিষ-পত্র যথা শক্তি গুছিয়ে রেখে, দু'জনে এক সঙ্গে বাজারের পথে বেরিয়ে পড়লাম। ইচ্ছা ছিল, আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্র কিছু খরিদ ক'রে-বাবার আরতি দেখতে যাব। কিন্তু পথেই সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। আর ক্লান্ত পা দু'টী, ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। কাজেই বাবার আরতি দেখা

আর পারা হ'য়ে উঠলো না, বাসায় ফিরে এলাম। উনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন। বারাণ্ডায় সেই ব্রাহ্মণ-কন্যাটীর সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল। মেয়েটী যুবতী। দু'টী ছেলে এবং একটী মেয়ে নিয়ে বিধবা হ'য়েছে। বড় ছেলেটীর বয়স বোধ হয় বছর দশেক হবে। বামুনের ঘরের বিধবা, কিন্তু মাথার চুল গুলো বেশ কেতা ক'রে ফিরান। গায়ে সেমিজ, হাত শুধু, থান কাপড়। জাতি-বিচার বড় একটা নাই, ব্যবহার খুব অমায়িক। শুনলাম ইনি কাশী বাস ক'রতে এসেছেন। একলাই আছেন, ভগ্নিপতি রেখে গিয়েছেন। ভাই দেশ থেকে পাণ্ডা ঠাকুরের নামে টাকা পাঠাবেন—সেই টাকায় ইনি কাশীবাস ক'রবেন। সকল ভার পাণ্ডা অর্থাৎ মুখোপাধ্যায় ঠাকুরের উপর। বুঝতে পারলাম না,—কাশীবাস কি অজ্ঞাতবাস! যাহা হোক আমি তাকে উপদেশ দেবার ছলে একটু সাবধান ক'রে দিলাম। বাজার হ'তে আসবার সময় কিছু মিষ্টান্নাদি আনা হ'য়েছিল, সেই সব মিষ্টান্ন দিয়ে জলযোগ শেষ ক'রে নিয়ে শোওয়া গেল। ভয়ানক গরম, তা'হ'লেও পরিশ্রান্ত শরীর—ঘুমের কোনও ব্যাঘাত হ'ল না।
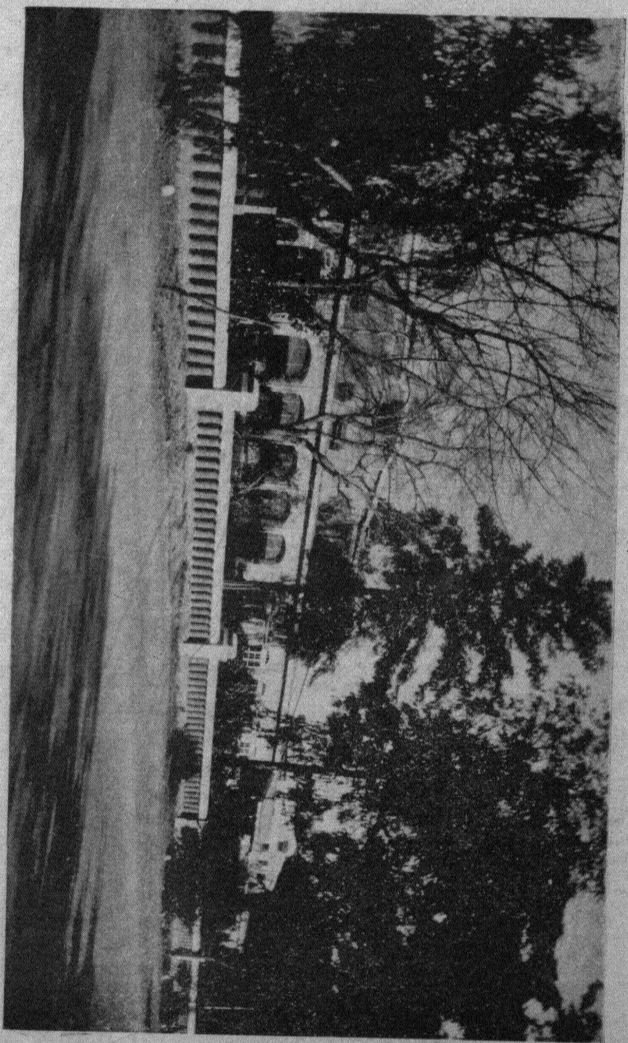
রাওলপিণ্ডি—ফ্ল্যাসম্যান'স হোটেল

রাওলপিণ্ডির পথে

পরদিন ১৫ই বৈশাখ মঙ্গলবার সকালে কিছু ফল মূল আনবার জন্য বাজারের উদ্দেশে যাত্রা করা গেল। এই উপলক্ষ্যে আমারও কাশীর বাজার দেখে আসা হ'ল। মস্ত বাজার, ভয়ানক ভিড়। আমার পক্ষে ভিতরে যাওয়া একেবারেই দুঃসাধ্য। বাজারের পায়ে নমস্কার ক'রে দরজা থেকেই কিছু ফল কিনে বাসায় ফিরে আসা গেল। তারপর কিছু জলযোগ ক'রে জিনিষ-পত্র গুছিয়ে নিয়ে, আমরা ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। যথা সময়ে গাড়ী এলে, গাড়ীতে উঠে বসা গেল। আমরা কাশীতে বিশ্রাম (হল্ট) করেছিলাম—সুতরাং আর টিকিট ক'রতে হয় নাই। এ বার গাড়ীতে ভিড় ছিল না। এ গাড়ীর নামও ডেরাডুন এক্সপ্রেস্। বেলা ১১-২৬ মিনিটের সময় গাড়ী ছেড়ে দিলে।

ক্রমে ক্রমে ট্রেণ জোনপুর, আকবরপুর, ফয়জাবাদ, বড়বাঙ্কি, লক্ষ্ণৌ, বালামৌ, হারদৈ, সাজাহানপুর, বেরিলী, মোরাদাবাদ, নাজিবা-বাদ প্রভৃতি বড় বড় ষ্টেশন অতিক্রম করে পরদিন ১৬ই বৈশাখ বুধবার ভোর চারটার সময়, লাক্সার জংসনে গাড়ী এসে দাঁড়াল। আমাদের এখানে গাড়ী বদল ক'রে, সাহারাণপুরের গাড়ীতে উঠতে হবে, কারণ এ গাড়ী সাহারাণপুর যাবে না, —অন্য লাইন দিয়া ডেরাডুন যাবে। আমরা গাড়ী থেকে নেমে ষ্টেশনে বসলাম। বড় ষ্টেশন,—অনেক গুলি কল। চা, গরম দুধ ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সবই পাওয়া যায়। আমরা গাড়ীর ভিতরেই কোন প্রকারে স্নান পর্য্যন্ত সেরে নিয়েছিলাম। এখানে চা ও কিছু মিষ্টান্নাদি জলযোগ করা গেল। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে হরিদ্বার প্যাসেঞ্জার ট্রেণ আসিলে, আমরা সাহারাণপুরে যাবার

জন্য সেই ট্রেণেই উঠে বসলাম। এখান থেকে সাহাবাণপুর খুবই কাছে —মাত্র দু'ঘণ্টার পথ। সাড়ে ন'টার সময় গাড়ী সাহাবাণপুর এসে পৌঁছিল। ষ্টেশনে কুলি নাই—অন্ততঃ ডেকে ডেকে কাকেও পাওয়া গেল না।

তখন উনি গাড়ী থেকে নেমে প্লাটফরমে দাঁড়ালেন, আমি মোট গুলি জানালা দিয়ে বার ক'রে ক'রে দিলাম, উনি নীচেয় রাখতে লাগলেন। ট্রাঙ্কটা দু'জনে ধ'রে গাড়ী থেকে নামিয়ে নেওয়া হ'ল। যেমন কাজ সারা হ'ল, অমনি একজন কুলি ছুটে এলো। তার কাছে শুনলাম, সে দিন মুসলমানদের পরব ব'লে অনেক কুলি আসে নাই। কুলি তাড়াতাড়ি মাল গুলি উঠিয়ে নিতে নিতে ব'ললে'কাঁহা যায়েগা জী?' উনি বললেন—'রাওলপিণ্ডী'। কুলি তাড়াতাড়ি ব'ললে 'গাড়ী তৈয়ার,— জলদি আইয়ে।' 'সে কি—গাড়ী তৈরী কিরে? আড়াই ঘণ্টা পরে বম্বে এক্সপ্রেস,—আমরা সেই গাড়ীতে যাব।' সে কথা কে শুনে, সে তাড়াতাড়ি ক'রতে লাগলো। উনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন —'এ গাড়ী মেল, —না প্যাসেঞ্জার?' কুলি উত্তর দিল—'মেল।' এই শুনে আমরাও কুলির সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম। আমাদের কথা ছিল —সাহারাণপুরে রাওল-পিণ্ডির গাড়ীর জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রতে হবে, সুতরাং এখানে উত্তমরূপে স্নানাদি ক'রে জলযোগ করা যাবে। কিন্তু তা হ'ল না। সাহারাণপুর খুব বড় ষ্টেশন। কিছুদূর এসে রেলের সেতুর উপর উঠতেই একজন টিকিট কালেক্টার টিকিট পরীক্ষা ক'রে ব'ললেন—'জলদি যাইয়ে, গাড়ী আবি ছোড়েগা।' আমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলাম —সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীও ছেড়ে দিলে। তখনও আমাদের সব জিনিষ-পত্র গাড়ীতে তোলা হয় নি। যা হোক ওস্তাদ কুলিটা ছুটোছুটি ক'রে কোনও রকমে চলন্ত গাড়ীতে জিনিষগুলো সব তুলে দিয়ে তার মজুরী

নিয়ে গেল। আমরাও নিশ্চিন্ত হ'য়ে গাড়ীর ভিতর বসলাম। পরে 'টাইম টেবেল' দেখে জানা গেল—এ গাড়ী ৩৩নং এক্সপ্রেস, আরও আগে ছাড়বার কথা, কিন্তু লেট্ হওয়ায় এই বিভ্রাট। আমাদের বম্বে এক্সপ্রেসে যাবার কথা ছিল। যাহা হো'ক এখন স্থির করা হ'ল, আম্বালায় নেমে স্নান ক'রে বম্বে এক্সপ্রেসে যাওয়া যাবে।

প্রায় সাড়ে এগারটার সময় আম্বালা কাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে গাড়ী এসে দাঁড়াল। আমরা সেইখানে নেমে পড়লাম। প্লাটফরমের উপরেই শেডের ভিতর মালপত্র নিয়ে আমি বসে রইলাম, উনি স্নান ক'রতে গেলেন। সামনেই কল। উনি স্নান ক'রে ফিরে এলে, আমিও কোনও রকমে দু'ঘটী জল মাথায় ঢেলে স্নানটা সেরে এলাম। সঙ্গে যে খাবার ছিল, তা'তেই দু'জনের জলযোগ শেষ করা গেল। পূর্ব্বে পাঞ্জাব ভ্রমণ-কালে এই আম্বালায় দু'মাস বাস করেছিলাম। তখনকার একটী পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ প্লাটফরমে ওঁর দেখা হ'ল। ওঁর সহিত কথা-বার্ত্তায় সময়টা বেশ কেটে গেল। বেলা দু'টার সময় বম্বে এক্সপ্রেস এসে পৌঁছিল। আমরাও মালপত্র নিয়ে সেই গাড়ীতে উঠে বসলাম।

পনর মিনিট পরে গাড়ী ছেড়ে দিলে। গাড়ীতে খুব ভিড়। আমি মেয়েদের গাড়ীতে উঠেছিলাম। অনেকগুলি পাঞ্জাবী শিখ মেয়ে সে গাড়ীতে ছিল। তাদের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে গেল। পাঞ্জাবী ও উর্দ্দু-মিশ্রিত এক রকম বোধগম্য ভাষায় তারা আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিল। বেশ অমায়িক সরল ব্যবহার। ধর্ম্মভাব এদের মধ্যে খুব প্রবল। পূর্ব্বে এদের সম্বন্ধে আমার অন্যরকম ধারণা ছিল। এখন সে ধারণাটা বদ্‌লে গেল। শুনেছিলাম, এদের সামাজিক আচার-ব্যবহার আমাদের সঙ্গে মোটেই মিশ খায় না, কিন্তু কথাবার্ত্তার [illegible] হ'য়ে গেল।

তবে এরা যে খুব সুবিধাবাদী, সেটা বুঝে নিতে দেরী হ'ল না। দুঃখের মধ্যে যখন নিজেরা কথাবার্ত্তা কয়, তখন সে দুর্ব্বোধ্য ভাষা কার সাধ্য যে বুঝে।

আম্বালা থেকে ট্রেণ ছাড়বার পর, ভয়ানক গরম বোধ হ'তে লাগল। একে বৈশাখ মাস, তার উপর বেলাও দু'টো। মাঠের উপর দিয়ে গাড়ী ছুটেছে। গরম বাতাস গায়ে লেগে, গা যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে। সেই অবস্থায় সমস্ত দুপুরটা কেটে গেলে বেলা প্রায় পাঁচটার সময় লুধিয়ানা ষ্টেশনে গাড়ী পৌছিল। লুধিয়ানা একটা সহর। শাল ও রামপুরী চাদরের জন্য বিখ্যাত। ইহার একটু পরে 'শতদ্রু' নদী (বর্ত্তমান সুতলেজ) পার হলাম। আরও কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে, প্রায় সাড়ে ছ'টার সময় জলন্ধর ষ্টেশনে পৌছিলাম। জলন্ধর থেকে ছাব্বিশ মাইল দূরে বিয়াস ষ্টেশন। ষ্টেশনের পর নদী। প্রায় সাতটা পনর মিনিটের সময় বিপাসা (বর্ত্তমান বিয়াস নদী) পার হ'লাম। শতদ্রু ও বিপাসার উত্তরের ভূভাগে পুরাকালে 'কেকয়' রাজ্য ছিল। বিয়াস থেকে ছাব্বিশ মাইল দূরে, অমৃতসরে রাত্রি আটটার সময় গাড়ী এসে দাঁড়াল। অমৃতসর একটা বহু পুরাতন বড় সহর। এখানে শিখ-গুরু নানকের সমাধি মন্দির (গোল্ডেন টেম্পল) আছে। অমৃতসর পশমি বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত। কাশ্মীরের পরই এখানকার শালের আদর। এই খানেই প্রসিদ্ধ জালিয়ানওয়ালাবাগ। একটা অত্যন্ত অপরিসর রাস্তা দিয়ে খানিকদূর গেলে একটা ছোট খোলা মাঠ পাওয়া যায়। মাঠের চারিদিকে ছোট বড় বাড়ী। সভার সময়, ঐ মাঠে প্রবেশের ও বহির্গমনের ঐ একমাত্র গলি-পথের মধ্যে গুলি চালিয়ে ডায়ার সাহেব ইংরেজ যে জঘন্য প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করেছিলেন,—তাহা ইতিহাসের বুক থেকে কখনও মুছ্‌বে না।

অমৃতসর থেকে বত্রিশ মাইল দূরে, পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে রাত্রি ন'টা চল্লিশ মিনিটের সময় আমরা এসে উপস্থিত হ'লাম। লাহোর খুব বড় সহর। পাঞ্জাবের গভর্ণর এই সহরেই বাস করেন। এখানে সালামারবাগ (সাততলা বাগান), জাহাঙ্গীরের সমাধি, নুরজাহানের সমাধি, রণজিৎ সিংহের সমাধি, গুরুদোয়ারা প্রভৃতি অনেক দেখ্‌বার জিনিস আছে। এখানকার জেলখানায় বিশ্ববিশ্রুত স্বদেশ ভক্ত—অমর বাঙ্গালী বীর—যতীন দাস, অনশনে তিলে তিলে জীবন দান ক'রেছিল এবং ভগৎ সিং ও রাজগুরু প্রভৃতির ফাঁসি হ'য়েছিল। লাহোর একটী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান।

লাহোর ত্যাগ ক'রে ইরাবতীর (বর্ত্তমান রাভি নদী) পুল পার হ'লাম। এখান থেকে বাষট্টি মাইল দূরে ওয়াজিরাবাদ। এই ওয়াজিরাবাদ থেকে জম্বুর লাইন গিয়েছে, মাঝখানে মাত্র বায়ান্ন মাইল ব্যবধান। জম্বু হ'তেও কাশ্মীর যাওয়া যায়। জম্বু থেকে কাশ্মীর দু'শ'তিন মাইল। আগাগোড়া পার্ব্বত্য পথ।

ওয়াজিরাবাদের পরই চন্দ্রভাগা (বর্ত্তমান চেনাব) নদী পার হ'য়ে চল্‌লাম। প্রাচীন কালে ইরাবতী ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম 'মদ্রদেশ' ছিল। এই স্থান অতিক্রম ক'রে আমরা লালামুসা পার হ'য়ে গেলাম। এখান থেকে দূরে দূরে পর্ব্বত-শ্রেণী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অনতি-উচ্চ মাটীর পাহাড় কেটে রেলের লাইন চ'লে গিয়েছে। রেল-পথের দুই পাশেই ধ্বংস সহরের মত মাটীর বল্মীক-স্তূপ দেখা যাচ্ছিল। এগুলি যথার্থই বল্মীক-স্তূপ অথবা বহু-বিস্তৃত প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ, এই চিন্তায় আমাকে কিয়ৎ কালের জন্য বিহ্বল ক'রে তুলেছিল। অতি সুনিপুণ শিল্পীর খোদিত স্তম্ভ, হর্ম্ম্য, দেউল, মন্দির প্রভৃতির অর্দ্ধাংশ ও শেষাংশের মত মনে হ'চ্ছিল। মনে হ'চ্ছিল যেন—বড় বড় মাটীর

বিল্ডিং এই ভাবে ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়েছে। বাস্তবিকই তাই কিনা, সে তথ্য আবিষ্কার করবার ক্ষমতা আমার নাই। কিন্তু সত্যই যদি তাই হ'য়ে থাকে, তবে সে কালের সেই আত্মাগুলি কি এখনকার এই ধ্বংস-স্তূপে বিচরণ ক'রে থাকে? যদি করে—তবে তাঁদের মনে কি হয়? প্রকৃতির এই মর্ম্মান্তিক উপহাস কি তাঁদের মনে বৈরাগ্য এনে দেয়? অথবা তাঁদের আজীবনের চেষ্টা-প্রসূত এই সমস্ত কারু-শিল্প কালের কঠোর হস্তে ধ্বংস-প্রায় দেখে তাঁদের সন্তপ্ত আত্মা কি এখানে ঘুরে বেড়ায়? কতকগুলি বড় বড় জলপথ ইহার মধ্য দিয়ে হিলবিল ক'রে এঁকে বেঁকে চারিদিক দিয়ে চলে গেছে। পথগুলির এমন চমৎকার মসৃণতা, মনে হ'চ্ছিল—এগুলি যেন এই সকল বাড়ীর অঙ্গন ও দালান। যদি বাস্তবিক এগুলি বল্মীক-স্তূপ হয়, তবে ভগবানের সৃষ্ট এই ক্ষুদ্র জীবের দিগন্ত-ব্যাপ্ত কারুকার্য্যের অদ্ভুত ক্ষমতার প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। আর বাস্তবিকই এদের ক্ষুদ্র জীবনের বৃহৎ শক্তির তুলনায় মানবের শক্তি কত টুকু!

লালামুসা থেকে একুশ মাইল দূরে ঝিলম ষ্টেশন। রাত্রি তিনটে ছ'চল্লিশ মিনিটের সময় এখানে এসে পৌঁছিলাম। ঝিলম ষ্টেশনের নিকট কাশ্মীরের বিখ্যাত নদী বিতস্তা (বর্ত্তমান ঝিলম)। এখানে ঝিলম বেশ প্রশস্তা। রেল সেতুর পার্শ্বেই লোক চলাচলের এবং যান বাহনাদি গমনাগমনের জন্য আর একটী সেতু আছে। পূর্ব্বে বিতস্তার তীরবর্ত্তী প্রদেশ 'শিবি' রাজ্যভুক্ত ছিল। একে একে পঞ্চনদের অর্থাৎ পাঞ্জাবের পাঁচটী নদই ছাড়িয়ে, পরদিন বেলা প্রায় ন'টার সময় রাওলপিণ্ডি ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে ধীরে ধীরে গাড়ী এসে দাঁড়াল।

রাওলপিণ্ডি

১৭ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার বেলা প্রায় ন'টার সময় রাওলপিণ্ডি ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। প্রকাণ্ড ষ্টেশন। সমস্ত পাথরের দ্বারা নির্ম্মিত, কেল্লার মত সুদৃঢ়। ষ্টেশনে অনেকগুলি গেট। প্লাটফরম খুব লম্বা, এরূপ লম্বা প্লাটফরম আর কোনও ষ্টেশনে দেখিনি। আমরা গাড়ী থেকে নামবা মাত্র কয়েকজন মটরের এজেণ্ট ও দালাল আমাদের জিজ্ঞাসা ক'রলে,—'কাশ্মীর যাবেন?' অবশ্য তা'দের ভাষায়। উনি বললেন, 'হাঁ—কিন্তু আজ নয়, দু' একদিন পরে যাব। এখন কালী-বাড়ী যাচ্ছি, সেখানে থাকবো।' তারা কালীবাড়ী গিয়ে দেখা ক'রবে ব'ললে। আমরা একটা টঙ্গা ক'রে কালীবাড়ী গেলাম। ভাড়া বার আনা নিলে, ব'ললে—এই রেট্। মোটরের এজেণ্টকে জিজ্ঞাসা করায়, সেও ব'ললে—ঐ রেট—অর্থাৎ এক ঘণ্টার ভাড়া। এখানে প্রথম শ্রেণীর টঙ্গার প্রথম ঘণ্টার ভাড়া বার আনা, পরে আট আনা হিসাবে। টঙ্গাওয়ালাকে বার আনা ভাড়া দেওয়া গেল। পরে শুনলাম যে, ষ্টেশন থেকে কালীবাড়ীর ন্যায্য ভাড়া চার আনা। পরে আমরাও চার আনাতে গিয়েছি। কালীবাড়ী—ষ্টেশন থেকে এক পোয়া রাস্তার মধ্যে।

এখানকার কালীবাড়ীটি ভাল। অনেক জায়গা,—থাকবার বন্দোবস্তও ভাল। কল-পাইখানার বেশ সুবিধা আছে, কলে দিবা-রাত্র জল থাকে। এই কালীবাড়ীর পূজারি ব্রাহ্মণ অতি সজ্জন ও অমায়িক। আমরা সেখানে যেতেই ঘর খুলে দিলেন,—ব'ললেন—'আপনাদের জন্যই এই ঘর রয়েছে—আপনারা আসুন, কোনও কষ্ট হবে না, নিজের বাড়ীর মত থাকবেন।' আমাকে বাড়ীর ভিতর

দেখিয়ে দিলেন, ব'ললেন—'মা, ওদিকে যাও, কল-পাইখানা সব ওদিকে আছে।' আবও ব'ললেন—'বাড়ীব ভিতব উনান আছে,—ঐখানে মা রান্না করুন,—মেয়ে ছেলে—ভিতবে রান্না সুবিধা হবে।' ব্রাহ্মণটী প্রৌঢ়, বর্দ্ধমান জেলায় বাড়ী। ব্রাহ্মণেব কথাবার্ত্তা খুব ভাল। কিছুদিন হ'তে বৈদিক কর্ম্ম পবিত্যাগ ক'বে বেদান্ত চর্চ্চায় নিমগ্ন আছেন। ইঁহাব পুত্রই কালীমায়েব সেবক। ইঁহাবা পিতা-পুত্রে অল্পদিন আগে এখানে এসেছেন। আমি তাঁকে পিতৃ সম্বোধন ক'বে গৌববান্বিতা হ'য়েছিলাম। কালীবাড়ীব দ্বাববান সমস্ত বাসন এবং কাঠ দিয়ে গেল। চুলাও ধবিয়ে দিলে,—সঙ্গে সঙ্গে বাজাব থেকে আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যও এনে দিলে। সবদিকেই সুবিধা হ'ল। আমাদেব স্নান ও আহাবাদি বেশ হ'ল, কোনও অসুবিধা হয় নি। আহাবাদিব পব বিশ্রাম কবা গেল। বাত্রে আব রান্না হ'ল না,—বাজাবেব খাবাব খেয়ে কাটিয়ে দেওয়া গেল। অন্যান্য জায়গায় কালীবাড়ী,—যেমন আম্বালা, লাহোব, পেশওয়াব ও সিমলাব পাহাড়ে তিন দিন খেতে দেয়, এখানে সে নিয়ম নাই, তবে চাকবে চৌকা বর্ত্তন সব ক'বে দেয়। সেদিন শবীব অত্যন্ত ক্লান্ত থাকায় বাহিবে যাওয়া হ'ল না। বাত্রে জলযোগাদি ক'বে শুয়ে পড়া গেল। এখানে এখন (বৈশাখ মাস) প্রায় সাড়ে আটটাব সময় সন্ধ্যা হয়।

পবদিন ১৮ই বৈশাখ শুক্রবাব সকালে আমবা দু'জনে খুব খানিকটা বেড়িয়ে এলাম। কালীবাড়ীতে এখন আব কোনও অভ্যাগত ছিলেন না, সুতবাং আমবা সমস্ত বাড়ীখানি ইচ্ছামত ব্যবহাব কববাব সুযোগ পেলাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েব দয়ায় ও যত্নে এবং দ্বাববানেব সেবায় সত্যই আমবা এখানে নিজেব বাড়ীব মতই আবামে ছিলাম। সমস্ত দিন বেশ নির্জ্জন থাকতো, কেবল বিকাল থেকে সন্ধ্যাব পব পর্য্যন্ত

এখানকার বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয়গণ এখানে এসে খেলা-ধূলা প্রভৃতি আমোদ আহ্লাদ করতেন। তখন আমি ঘরের মধ্যে আমার ডায়েরী নিয়ে বসলাম। কালীবাড়ীটি এখানকার সমস্ত বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয়গণের সম্মিলনের স্থান।

রাওলপিণ্ডি—পাঞ্জাব প্রদেশের বিভাগ, জেলা ও সহর। গুজরাট, আটক, ঝিলম, সাপুর ও রাওলপিণ্ডি এই পাঁচটি জেলা লইয়া এই বিভাগটি গঠিত। এই জেলার মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ মরি পর্ব্বত ও তদুপরিস্থ স্বাস্থ্যনিবাস। রাওলপিণ্ডি 'লে' নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা মুসলমান-প্রধান স্থান। এক সময়ে যে এখানে হিন্দু-মন্দিরাদি ছিল, অদ্যাপি স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ান ও প্লিনর বিবরণে এই স্থানে আলেকজাণ্ডারের কীর্ত্তি কলাপের বিষয় উল্লেখ আছে। তক্ষ নামক তুরাণী জাতি এই স্থান কিছুকাল শাসন করে, পরে ইহা মগধরাজ্যের অধীন হয়। গজনীর মামুদ যখন ভারত আক্রমণ করেন, সেই সময় ঘক্কর নামক এক অসভ্য জাতি তাঁহাকে বাধা দেয়। ১২০৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী এই জাতিকে পরাজয় ক'রে তাহাদিগকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রতে বাধ্য করেন। পরে বাবর সাহ ঘক্করদিগের হস্ত হ'তে এই স্থান নিজ অধিকারভুক্ত করেন। কালক্রমে ইহা শিখ-শাসনাধীন হয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সমস্ত শিখরাজ্যের সহিত রাওলপিণ্ডি ইংরাজের অধিকারে আসে।

রাওলপিণ্ডি একটী বহু পুরাতন ও বড় সহর। এখানে রকমারি জিনিষের বহুবিধ দোকান আছে। শাক সব্জী ও নানাবিধ ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অধিকাংশ ফল কাবুল ও কাশ্মীর থেকে আমদানী হয়। দধি, দুগ্ধ এবং বাঙ্গালা দেশের খাবারের দোকানও অনেক আছে। এখানে ঘাসের প্রস্তুত অতি সুন্দর সুন্দর ডালি,

চেয়ারি আসন প্রভৃতি নানাবিধ জিনিষ বিক্রয় হয়। সহর থেকে সদর এক মাইল। টঙ্গার শেয়ার ছু' পয়সা মাত্র, তিনজন পর্য্যন্ত যাওয়া চলে। সহরে সৈন্যাবাস, সৈনিক কর্ম্মচারীদের ক্লাব, মাসিগেট, জুম্মা মসজিদ, টোপী পার্ক প্রভৃতি দেখবার যোগ্য। এখানে তিন চারটি বায়োস্কোপ আছে।

মোগল রাজত্ব সময়ে রাওয়ালপিণ্ডি ফতেপুর রাওরি নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ রক্ষাকল্পে ও সামরিক কেন্দ্র ব'লে এখানে ইংরাজ-বাহিনীর বিপুল সৈন্য সমাবেশ। শুনলাম, ভারতের অন্যান্য সকল স্থান অপেক্ষা এখানে সৈন্য সামন্ত অনেক বেশী থাকে। পিণ্ডি থেকে ছু' মাইল দূরে 'চকলালা' নামক স্থানে, গোলাগুলি বারুদের এবং অন্যান্য যুদ্ধোপকরণাদি প্রস্তুতের খুব প্রকাণ্ড কারখানা আছে। অধুনা রাওলপিণ্ডি ইংরাজের ভারতস্থ বৃহত্তম সেনানিবাস।

সহর অপেক্ষা ক্যাণ্টনমেণ্ট বা সদর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,—বিশেষতঃ মল রোড ও এরই ছু'পাশের বৃক্ষশ্রেণী, ঘরবাড়ী এবং দোকান-গুলি দেখতে অতি মনোরম। মনে হয় যেন রাস্তার ছু'ধারে বাগান বাড়ী সাজিয়ে রাখা হ'য়েছে, অথবা বাগান-বাড়ীর মধ্য দিয়েই রাস্তা বেরিয়ে গেছে। স্থানে স্থানে রাজপথের উপর কামান সাজান রয়েছে। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, এডওয়ার্ড রোড প্রভৃতি আরও অনেকগুলি অতি প্রশস্ত ও পরিষ্কার রাস্তা আছে। রাস্তার ধারে ধারে বৃক্ষশ্রেণী ও পানীয় জলের কল। বড় বড় হোটেল, ইংরাজ-পরিচালিত বায়োস্কোপ অতি সুন্দর, জেনারেল পোষ্ট আফিস, প্রকাণ্ড টেলিগ্রাফ আফিস, অফিসারস ক্লাব, চার্চ্চ, মনুমেণ্ট এবং বড় বড় সুন্দর সুন্দর দেশী ও বিলাতি নানাবিধ দোকান উল্লেখযোগ্য। সমস্ত সদরটা দেখতে বড়ই সুন্দর।

কর্ম্মোপলক্ষে এখানে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক বাস করেন। পূর্ব্বে

এখানে বাঙ্গালী অনেক বেশী ছিলেন, বদলি হ'য়ে এখন অনেকে অন্যত্র চ'লে গেছেন। এখানকার বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের মাসিক চাঁদায় কালী-বাড়ীর অধিকাংশ খরচ নির্ব্বাহ হয়। কালীবাড়ীতে বাঁধা থিয়েটারের ষ্টেজ আছে। ৺দুর্গাপূজার সময় বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা এখানে থিয়েটার করেন। মহাষ্টমীর দিন মায়ের খুব ধুম ধামের সহিত পূজা হয়। এখানকার সমস্ত বাঙ্গালী স্ত্রী-পুরুষ ছেলে মেয়ে এই পূজায় যোগদান করে। বঙ্গের বাহিরে—বহুদূরে—বাঙ্গলার বাঙ্গালীর প্রধান উৎসব দুর্গোৎসবের আনন্দ, প্রবাসী বাঙ্গালীরা মায়ের কাছে এইভাবেই উপভোগ করেন। খাওয়া দাওয়া এবং অতিথি-সেবাও যথেষ্ট হয়। পিণ্ডি অতি স্বাস্থ্যকর স্থান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তক্ষশীলা

তক্ষশীলা যাত্রা

১৯শে বৈশাখ শনিবার, খুব সকালে উঠা গেল। এদিন আমাদের তক্ষশীলা যাবার কথা। তক্ষশীলা একটী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। এখানে এসে তক্ষশীলা না দেখলে—দেখাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কাজেই এত বড় একটা জিনিস না দেখে এখান থেকে যাওয়াটা সঙ্গত মনে না ক'রে সকালেই তক্ষশীলা যাওয়া স্থির হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে খাবার আয়োজন করা গেল। বলা বাহুল্য, দ্বারবানই সব যোগাড় ক'রে দিল। সময় অতি অল্প, তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া ক'রে নিয়ে, একটা টঙ্গা ক'রে ষ্টেশনের দিকে যাওয়া গেল।

তক্ষশীলা রাওলপিণ্ডি হ'তে কুড়ি মাইল পশ্চিমে। বরাবর টঙ্গা ক'রেও যাওয়া যায়, তবে বড় কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য। ট্রেণে যাওয়ারই সুবিধা। ইণ্টার ক্লাসের ভাড়া আট আনা—রিটার্ণ টিকিট নাই। আমরা ষ্টেশনে গিয়ে দেখলাম—যে তক্ষশীলা-গামী গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি দু'খানা টিকিট ক'রে গাড়ীতে উঠে বসলাম।

ক্রমে ক্রমে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হ'ল, কিন্তু গাড়ী আর ছাড়ে না;—প্রায় এক ঘণ্টার উপর গাড়ীতে ব'সে বিরক্ত হ'য়ে গেলাম। কালীবাড়ী থেকে বেরুবার সময়, উনি এমন তাড়া দিলেন যে, আমার পানের কৌটাটা আনতেই ভুল হ'য়ে গেল। পথে পানের কথা

তক্ষশীলা—ধর্ম্মরাজিক স্তূপ

—৩২
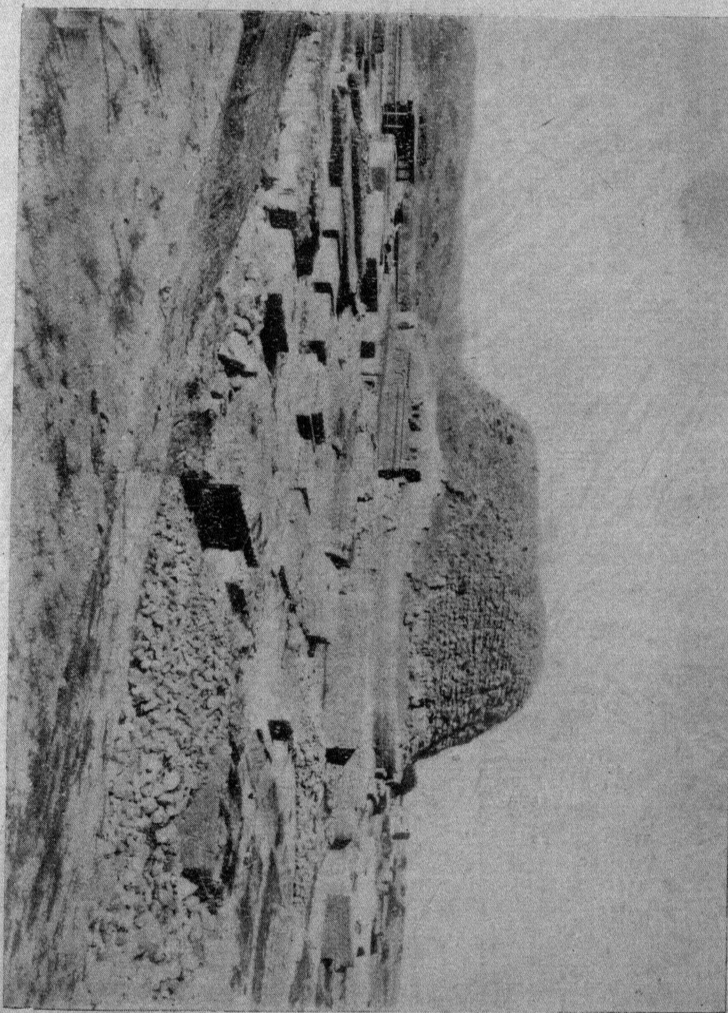
ব'ল্‌তে, উনি মোটেই গা দিলেন না, উনি তো আর পান খান না—যা কষ্ট আমারই হ'বে,—ওঁর আর কি! ব'ললাম,—'গাড়ী ফেল হ'ব ব'লে যে অত তাড়া দিলে,—তা এখন তোমার গাড়ী চলে কই? এক ঘণ্টার উপর তো কেটে গেল, গাড়ী আর যাবে না—চলো—বাড়ী ফিরে যাই।'

তখন আমার পানের জন্য বড় কষ্ট হ'চ্ছিল; অবশ্য ষ্টেশনে উনি পান কিনে দিলেন বটে—কিন্তু এ পান পানই নয়। আমি অমন তোয়াজ ক'রে পানগুলো সব সেজেছিলাম—সমস্ত দিন খাব বলে। উনি আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে, অনুচ্চস্বরে রেল কোম্পানীর উদ্দেশে দু'একটা অসঙ্গত কথা ব'ল্‌লেন। গাড়ীতে আর কেহ ছিল না—ইণ্টার ক্লাসে কেবল আমরা দু'টী প্রাণী।

এইভাবে প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে, গাড়ী গা নাড়া দিয়ে, অচল অবস্থা থেকে সচল অবস্থা প্রাপ্ত হ'য়ে, ধীরে ধীরে রাওলপিণ্ডি ষ্টেশন ত্যাগ ক'র্‌লে। মধ্যে দু'টো ষ্টেশনে একটু একটু বিশ্রাম ক'রে এক ঘণ্টার কিছু পরে গাড়ী পিণ্ডি থেকে কুড়ি মাইল দূরে তক্ষশীলা ষ্টেশনে গিয়ে পৌছিল। আমরা গাড়ী থেকে নেমে পড়্‌লাম। তক্ষশীলা একটী ছোট জংসন ষ্টেশন। ছোট হ'লেও ষ্টেশনটী ভাল, পাথরের তৈরী। খাবার—পুরি, কচুরি, মিঠাই সব পাওয়া যায়। সোডা লেমনেড্‌ বরফও আছে। আমরা তৃষ্ণার্ত্ত ছিলাম বরফ লেমনেড খেয়ে কতকটা তৃপ্ত হ'লাম। পরে রেলের পোল পার হ'য়ে ওপারে গেলাম। সেখানে তিন চার খানা টঙ্গা ছিল, তার মধ্যে থেকে একখানা ভাল টঙ্গা ভাড়া ক'রে, আমরা দু'জনে তাতে উঠে বস্‌লাম। সমস্ত দেখিয়ে পুনরায় ষ্টেশনে পৌছে দেবে, দু'টাকা ভাড়া চুক্তি হ'ল।

প্রাচীন ইতিহাস

পুরাকালে তক্ষশীলা গান্ধার রাজ্যের অধীন ছিল। ঢেরি সাহা নামে বর্ত্তমানে যে গ্রাম আছে, জেনারেল কানিংহামের মতে এই গ্রামই প্রাচীন তক্ষশীলা। তক্ষ বা তক্ষক নামক তুরাণী জাতি পূর্ব্বকালে এই প্রদেশে বাস ক'র্তো ব'লে অনুমিত হয়। সম্ভবতঃ এই জাতির নামানুসারে তক্ষশীলা নামের উৎপত্তি। সূর্য্যবংশীয় রাজা ভরত ঐ রাজ্য জয় করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তক্ষ এই নগরীতে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগরী ব'লে মহাভারতে উহার উল্লেখ আছে।

চন্দ্রবংশীয় মহারাজ জন্মেজয় এই তক্ষশীলা অধিকার করেন। এখানেই তাঁহার সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে এই স্থান পারস্যের বিশাল সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। এই সময়ে ও তৎপরবর্ত্তী শতাব্দীতে এখানে ভারতের বিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত ছিল। ঐ সময়ে তক্ষশীলা ঋষিগণের জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান স্থান ছিল। গোনর্দ্দিতনয় পাণিনি ও নীতিশাস্ত্র বিশারদ চাণক্য এই স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করেন ও এখানেই তাঁহাদের শিক্ষালাভ হয়। বেদ, বেদান্ত, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ ছিল। বৌদ্ধজাতক গ্রন্থাবলীতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতীয় শিক্ষার্থী ব্যতীত মিশর, ব্যাবিলন, সিরিয়া, আরব, চীন, তির্ব্বত প্রভৃতি নানা দেশের বিদ্যার্থীরাও সেই সময় এইখানে বিদ্যালাভ ক'রতে আসতেন।

গ্রীক্‌রাজ আলেকজাণ্ডার খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে এই প্রদেশ জয় করেন। বিতস্তা ও চেনাব নদীর মধ্যস্থিত পুরুরাজ্য আক্রমণের পূর্ব্ব

পর্য্যন্ত তিনি এইখানে অবস্থান করেছিলেন। এর ২৩ বৎসব পবে মহাবাজ চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদিগকে বিতাডিত ক'বে এই প্রদেশ মগধ রাজ্য-ভুক্ত কবেন। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২৯৮ অব্দে চন্দ্রগুপ্তেব পুত্র বিন্দু-সারের বাজত্বকালে তক্ষশীলা মৌর্য্য সাম্রাজ্যেব অধিকাব ভুক্ত ও পশ্চিম ভাবতেব বাজধানী ছিল। তক্ষশীলাব বিশ্ববিদ্যালয় তখন উন্নতির উচ্চতম সোপানে অধিষ্ঠিত।

বিন্দুসাবেব পব তাঁহাব পুত্র অশোক খৃঃ পূঃ ২৬৩ অব্দে মগধের বাজা হন এবং ইহাব কয়েক বৎসব পবে খৃঃ পূঃ ২৫৮ অব্দে হিন্দুধর্ম্ম পবিত্যাগ ক'বে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তৎপবে ইনি প্রাণনাশকব যুদ্ধ-ব্যাপাব পবিত্যাগ ক'বে রাজ্যের সুশাসনে ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচাবে মনোযোগ দেন। মহাবাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্মকে হীনজান নামে পবিবর্ত্তিত ও পবিমার্জ্জিত কবেছিলেন। এই হীনজান ধর্ম্ম পালি বা মাগধী ভাষায় বচিত। ঐ ধর্ম্ম প্রচারার্থে তিনি তাঁহাব প্রিয় পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে সিংহলে প্রেরণ করেন। (২৪৪ খৃঃ পূঃ) উল্লেখ আছে যে, ইনি সর্ব্বসমেত ৮৪০০০ হাজাব বুদ্ধ চৈত্য নির্ম্মাণ কবিয়ে-ছিলেন এবং সাধাবণেব শিক্ষাব জন্য প্রস্তর-স্তম্ভে ও পর্ব্বত-গাত্রে ভারতেব বিভিন্ন স্থানে অনুশাসন ও উপদেশ বাক্য খোদিত কবিয়েছি-লেন। এঁর সময়ে মগধ রাজ্য হিমালয় হ'তে কুমাবিকা ও উড়িষ্যা হ'তে কাবুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হ'য়েছিল এবং বৌদ্ধধর্ম্মের অসাধারণ উন্নতি হ'য়েছিল। তক্ষশীলায় মহারাজ অশোকের কীর্ত্তিচিহ্ন সকল এখনও বিদ্যমান আছে।

খৃঃ পূঃ ২৩২ অব্দে অশোকের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পর, মৌর্য্য-বংশীয় আরও সাত জন রাজা মগধের সিংহাসনে আবোহণ করেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ধ্বংস সূচিত হয়, এবং তক্ষশীলা

কিছুকাল স্বাধীনতা উপভোগ করে। কিন্তু পরে খৃঃ পূঃ ১৯০ সনে উহা পুনরায় বক্ত্রিয়ার গ্রীকরাজ্য ভুক্ত হয় এবং প্রায় একশত বৎসর কাল ঐ নগরী গ্রীক শাসনাধীন থাকে। গ্রীকগণের পরে, মধ্য এসিয়ার শক জাতি বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়ে ভারতে এসে তক্ষশীলা অধিকার করে। এই শক রাজগণ ক্ষত্রপ ও মহাক্ষত্রপ নামে অভিহিত। শকগণের পরে পহ্লবগণ এই রাজ্য অধিকার করে। বহুকাল তক্ষশীলা পার্থীয়ান বা পহ্লবগণের অধীন থাকে। ইহাদের রাজত্ব সময়ে তক্ষশীলার অন্তর্গত সারকপ সহর গ্রীকদিগের সুদৃঢ় দুর্গের মত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এই প্রাচীর-বেষ্টিত সহরের মধ্যে রাজ-প্রাসাদ ও সূর্য্য-উপাসনার মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। যাণ্ডিয়ালের মন্দির সম্ভবতঃ সহরের বহির্ভাগে অবস্থিত।

মধ্য এসিয়াবাসী ইয়ু-চি নামে প্রসিদ্ধ তাতার জাতীয় লোক, হিন্দু কুশ পর্ব্বতের উত্তর ভাগে পাঁচটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। এই পঞ্চ রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী কুসাণ রাজ্যের রাজা কুজুল কড্‌ফিস পহ্লবগণকে পরাজিত ক'রে আনুমানিক ৫০ খৃষ্টাব্দে তক্ষশীলা অধিকার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র বিমকড্‌ফিস প্রভৃতি কতিপয় রাজা রাজত্ব করেন। কুসাণ নৃপতিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মহাপরক্রম-শালী রাজা কণিষ্কের শাসন সময়ে, খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে তক্ষশীলা সমৃদ্ধির উচ্চ সীমায় আরোহণ করে। তিনি ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন এবং শেষ জীবনে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মহারাজ কণিষ্কের শাসন সময়ে নানা স্থানে বহুতর বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাঁরই সময়ে বৌদ্ধগণের চতুর্থ ও শেষ 'সঙ্গীতি' আহূত হয় এবং মহাযান নাম দিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংস্কার সাধন করা হয়। এই ধর্ম্ম-পদ্ধতি সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হয় এবং মধ্য এসিয়া, চীন, তিব্বত, জাপান প্রভৃতি উত্তর

দেশে আদরের সহিত গৃহীত হয়। বৌদ্ধ শূন্যবাদের ভিত্তির উপর তিনি হিন্দুশাস্ত্রের যোগ ও ভক্তিমার্গ প্রতিষ্ঠিত করেন, এইজন্য প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মমত অপেক্ষা মহাযান মত সহজে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হয়। তিনিই বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রধান প্রবর্ত্তক। মহারাজ কনিষ্কের শাসন সময়ে বৌদ্ধ আচার্য্য নাগার্জ্জুনের অভ্যুদয় হয়েছিল। কেহ কেহ বলেন কনিষ্কের সময় থেকে শকাব্দ প্রচলিত হয়। প্রথম শকাব্দ ৭৮ খৃষ্টাব্দের সমসাময়িক। 'বুদ্ধচরিত' লেখক কবি 'অশ্বঘোষ' তাঁহার সভার রাজকবি ছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর হবিষ্ক ও বাসুদেব এবং অন্য একজন রাজা কুষান সাম্রাজ্য শাসন করেন। ১২৫ খৃষ্টাব্দে বাসুদেবের মৃত্যুর পর কুষান রাজত্বের অবনতি আরম্ভ হয়। খৃষ্ট পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে, মধ্য এসিয়াবাসী পরাক্রান্ত বর্ব্বর হুন্ জাতি পঙ্গপালের মত ভারতে উপস্থিত হ'য়ে কুষান রাজ্য অধিকার করে, এবং অসি ও অগ্নির সাহায্যে তক্ষশীলার প্রায় সমস্ত পুরাতন কীর্ত্তিস্তম্ভ ও অট্টালিকা ধ্বংস করে দেয়।

অধুনা—সেই অতীত গৌরবের প্রতীক, তাহারই কতক ভগ্নাবশেষ মাত্র প্রত্নতত্ত্ববিদগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অদম্য উৎসাহে আবিষ্কৃত হয়েছে। ৪০০ শত খৃষ্টাব্দে গুপ্তবংশীয় রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব সময়ে চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারত ভ্রমণ কালে তক্ষশীলায় বৌদ্ধ শ্রমণদিগের সুবৃহৎ মঠ, মন্দির, স্তূপ প্রভৃতি দর্শন করেছিলেন। খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে, চীনদেশীয় পরিব্রাজক পণ্ডিত হুয়েনাথসাঙ ভারত ভ্রমণের সময়, এই নগরী কাশ্মীর রাজ্যের অধীন দেখে গিয়েছিলেন।

বিহারের বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দার ন্যায় পাঞ্জাবের এই তক্ষশীলাও অতীত ভারতের সভ্যতা, জ্ঞান-চর্চ্চা ও সমৃদ্ধির পরিচায়ক। ইহা ভারতবাসীর বিশেষ গৌরবের স্থল।

এই নগরী ধ্বংস হওয়ার পর, সেই ধ্বংসাবশেষ শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল ধ'রে মৃত্তিকার গর্ভে লোক-দৃষ্টির সম্পূর্ণ অগোচরে ছিল। বর্ত্তমানে—সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্ম্মচারিগণ অশেষ পরিশ্রমে মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থিত সেই সমুদয় পুরাতন ভগ্নাবশেষের পুনরুদ্ধারে ও প্রাচীন তথ্য সংগ্রহে যত্নবান।

২৫ বর্গ মাইল পরিমিত স্থানে তক্ষশীলার ভগ্নাবশেষের অস্তিত্ব অবস্থিত। তক্ষশীলার ধ্বংসাবশেষ ছয়টি পৃথকভাবে বিভক্ত। (১) 'বীর স্তূপ' এটি ঢেরি সাহান গ্রামের সন্নিকট। এখানে প্রত্নতত্ত্ববিদগণের অভিলষিত বিস্তর মুদ্রা, প্রস্তর ও ইষ্টকাদি পাওয়া যায়। (২) হাতিয়াল; মারগলা পর্ব্বতশ্রেণীর একাংশে অবস্থিত প্রাচীন দুর্গ। (৩) শিরকাপ, এটি পূর্ব্বোক্ত দুর্গের সহিত সংযুক্ত অতিরিক্ত দুর্গ ব'লে অনুমিত। তাম্রনালা নদীর অপর পারে—সম্ভবতঃ এইখানে গ্রীকদিগের প্রতিষ্ঠিত সারকাপ্ সহর ছিল। এই সহরের এক মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে সারসুখ নগরী ছিল। চীন পরিব্রাজক হুয়েনাথ সাঙ এইখানে পদার্পণ করেন। (৪) কাপ-কোট, সম্ভবতঃ এইখানে যুদ্ধের সময়ে হস্তী ও অন্যান্য পশু রক্ষিত হ'ত। (৫) বাবর খানা; এটি অশোক-নির্ম্মিত স্তূপ ব'লে কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন। হুয়েনথ সাঙ এই স্তূপের উল্লেখ করেছেন। (৬) বহুদূর বিস্তৃত মঠ ও বৃহদায়তন অট্টালিকার সমষ্টি।

এখানে পর পর তিনটি সহর ছিল। এখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আফিস, বাঙ্গলা প্রভৃতি যেই স্থানে অবস্থিত, সেইখানে ও তাহারই দক্ষিণে খৃঃ পূঃ দুই সহস্র বৎসর হ'তে প্রায় খৃঃ পূঃ ১৮০ সন পর্য্যন্ত 'ভীরমণ্ড' নামক সহরের অস্তিত্ব ছিল। এই কয়টি স্থানই ক্রমান্বয়ে তক্ষশীলা নামে পরিচিত।

তক্ষশীলা—মিউজিয়াম
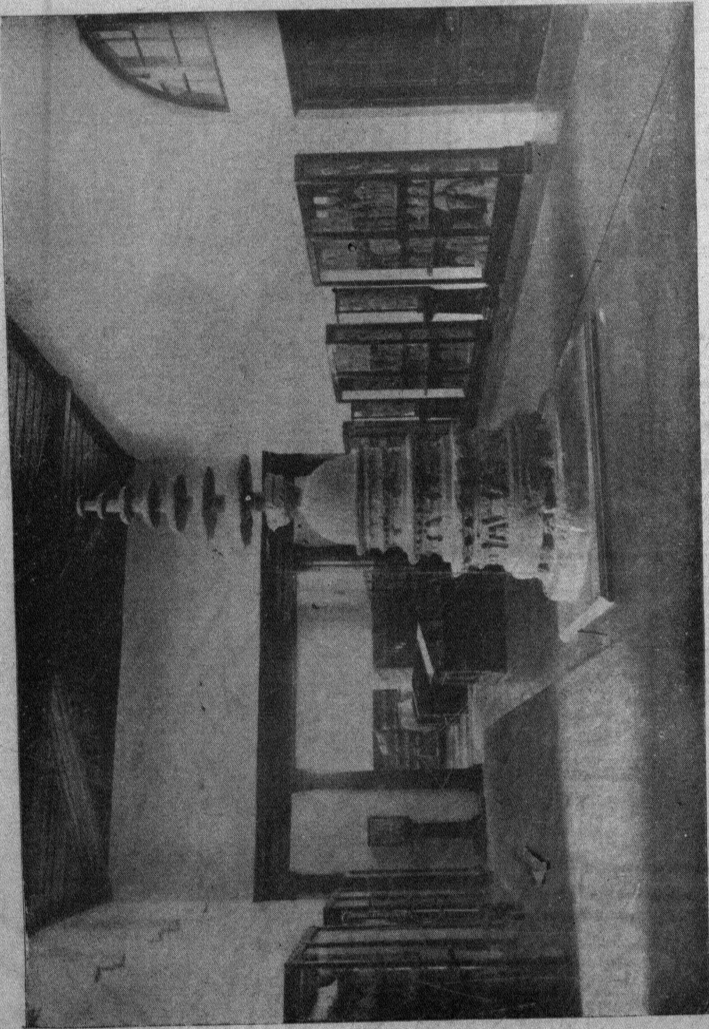
মিউজিয়াম

আমাদের টঙ্গা প্রথমে মিউজিয়মে গিয়ে পৌছিল। ষ্টেশন হ'তে মিউজিয়ম প্রায় এক মাইল দূরে। একটা সুন্দর সুদৃশ্য বাড়ী—উঁচু টিলার উপর নির্ম্মিত। লোহার ফটক পার হ'য়ে আমরা ভিতরে গেলাম। ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রেই দেখলাম—এক ধারে একটা টেবিল, তার উপর কতকগুলি কাগজ পত্র ও পাশে চেয়ার রয়েছে, এবং সেখানে দু' পাঁচ জন লোক আছেন। সেখান থেকে তক্ষশীলা দেখ্‌বার জন্য পাস নিতে হয়, এবং সেখানে নাম ধাম সব লিখিয়ে দিতে হয়। পাসের মূল্য লোক প্রতি দু'আনা। দু'জনের চার আনা দর্শনী দিয়ে আমরা ভিতরে গেলাম।

এখানে, মাটীর তলদেশ হ'তে উদ্ধৃত নানাবিধ পাথরের ও মাটীর ধ্যানস্থ বুদ্ধ-মূর্ত্তি রয়েছে, এবং নানা রকম পাথরের ফলকে বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি, ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন প্রভৃতি বুদ্ধ-জীবনের ঘটনাবলী প্রদর্শিত হ'য়েছে। নানা শতাব্দীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির নৃপতিগণের সময়ে প্রচলিত মুদ্রা ও নানা প্রকার কারুকার্য্য-শোভিত সোণার ও রূপার গহনা, হীরা মুক্তার গহনা, নানা রকম ধাতুর ও মাটীর বাসন, জীর্ণ দরজার ভাঙ্গা কব্জা, পেরেক, জীর্ণ লোহার অস্ত্র, খন্তা, কোদাল, কুড়ুল ও সাবোল, বিবিধ রকমের পুতুল, মণি মুক্তা বসান (দু'একটা লাগান আছে) মন্দিরের চূড়া, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেব মূর্ত্তি ও বৌদ্ধ মূর্ত্তি, আধ ভাঙ্গা বড় বড় মানবের প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি অতি পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে রাখা হ'য়েছে। মাটীর হাঁড়ি, কলসী, জালা বেশ অখণ্ড অবস্থায় রয়েছে। পাথরের পুতুলগুলির সুন্দর ও সূক্ষ্ম কাজ এত কাল পরে, এমন সুন্দর ভাবে রয়েছে যে, দেখ্‌লে মন মোহিত হয়। সাত কৌটা ও কুড়ি কৌটার মধ্যে রক্ষিত

রেণু রেণু সোণা রূপার গুঁড়া গুলি, 'সো'-কেসের মধ্যে নানা দ্রব্যের সঙ্গে সাজান রয়েছে। এখানে একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক (শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র নাথ দত্ত গুপ্ত) কাজ করেন। তিনি ঘর খুলে (সোণা রূপার দ্রব্যাদি ও অলঙ্কারের ঘর তালা বন্ধ থাকে) আমাদের সব দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিলেন। মণীন্দ্রবাবু খুব ভদ্রলোক। অন্যান্য স্থানে কি কি দেখবার আছে, তা'ও ওঁকে ব'লে দিলেন। যে সকল দ্রব্য মিউজিয়মে রক্ষিত হ'য়েছে, তাহা যাণ্ডিয়াল, জণ্ডলিয়ান, সারকাপ সহর, মোহরা-মোরাডু ও ধর্ম্মরাজিক স্তূপ হ'তে এ পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে। খনন-কার্য্য এখনও স্থানে স্থানে চল্‌ছে। উপরোক্ত স্থানগুলি দর্শনযোগ্য। ঐ গুলি দেখবার জন্য পাসের আবশ্যক। আমরা পাস নিয়ে মিউজিয়ম থেকে বেরুলাম।

তক্ষশীলা—জওলিয়ান

জওলিয়ান

নিউফিজম থেকে বেরিয়ে প্রথমে আমরা জওলিয়ান দেখতে গেলাম। জওলিয়ানই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দূরে—প্রায় তিন শত ফুট উচ্চ পর্ব্বত-শীর্ষে বড় মঠ ও স্তূপ প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। বড় চত্বরের চতুর্দ্দিকে—শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ছোট ছোট ঘর।

এরই মাঝখানে প্রধান স্তূপ এবং তৎসংলগ্ন অনেক ছোট ছোট স্তূপ চারিদিকে রয়েছে দেখলাম। এ গুলির গঠন দোলমঞ্চের মত। কতক-গুলি স্তূপের উপরিভাগ নাই, অধোভাগের সকল দিকেই ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি পাথর খোদাই ক'রে প্রস্তুত হ'য়েছিল। মনে হয়, ইহার মধ্যে কতকগুলি চূণ ও পাথরের প্রস্তুত, আর কতকগুলি মাটীর,—কিন্তু মাটীর হ'লেও পঞ্চম শতাব্দীর ভীষণ অগ্নিদাহে পাথরের মত কঠিন হ'য়ে রয়েছে। এই সকল বুদ্ধ-মূর্ত্তি বুদ্ধদেবের বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি,—যেমন একটি হ'চ্চে—বুদ্ধদেব উপদেশ দিচ্চেন, আর সমবেত নরনারী বদ্ধাঞ্জলি হ'য়ে তা শুনচেন। আর একটি মূর্ত্তি হ'চ্চে—ধ্যানস্থ বুদ্ধদেব যোগাসনে উপবিষ্ট, আর দণ্ডপাণি, বজ্রপাণি প্রভৃতি দেবগণ নানারূপে সেবা-তৎপর। অন্য আর একটি মূর্ত্তিতে আছে—সিংহাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধদেব, আর সম্মুখে দেব-দেবীগণ যোড় হস্তে সমবেত। এইরূপ মূর্ত্তি সকল কারুকার্য্যময় আসনে ভগ্নাবস্থায় রয়েছে। স্থানটি নির্জ্জন এবং শান্তিময়—সাধনার যোগ্য।

মোহরা-মোরাড়ু

পরে আমরা মোহরা-মোরাড়ুর দিকে যাত্রা করলাম। মোহরা মোরাড়ু জওলিয়াঁনের এক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। খানিকদূর যাবার পর একটা পাহাড়ের তলায় এসে আমাদের টঙ্গা থাম্‌লো। একটা সরু পথ, ক্রমশঃ বন্ধুর পথে পাহাড়ের অভ্যন্তরে উঁচু নীচু আঁকা-বাঁকা হ'য়ে চ'লে গিয়েছে। টঙ্গাওয়ালার নির্দ্দেশমত আমরা ঐ পথে অগ্রসর হ'লেম। অনেকটা গিয়ে কয়েকটা মোড় ঘুরে একটা ছোট নদী দেখ্‌তে পেলাম। নদীর ও-পারে উচ্চ পর্ব্বত। পর্ব্বতের অন্তরালে ঘুরে ঘুরে বহুদূর অগ্রসর হ'য়েও কোথাও কিছু না দেখ্‌তে পাওয়ায় প্রাণে ভীতির সঞ্চার হ'চ্ছিল। জনহীন নির্জ্জন স্থান—প্রাণী মাত্রের চিহ্ন নাই;—ক্রমশঃ পর্ব্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রতে হ'চ্চে, সঙ্গে আমি স্ত্রীলোক এবং আমার যথা-সর্ব্বস্ব। গুপ্ত দস্যুর আশঙ্কায় অন্তর কম্পিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। ফিরে আসার ইচ্ছাও মনে হ'চ্ছিল। কেবল দুঃসাহসে নির্ভর ক'রে দু'টী প্রাণী অগ্রসর হ'লেম। কিছুদূর ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হ'য়ে, একটা টীলার উপর কিছু ভগ্নাবশেষ দেখা গেল। তখন আমাদের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হওয়ায় আমরা দ্রুতপদে অগ্রসর হ'লাম। এই টীলা পার হ'য়ে একটা চত্বর দেখা গেল। উচ্চ প্রশস্ত চত্বর। সোপান বেয়ে আমরা উঠলাম। দেখলাম—উচ্চ প্রাচীর-ঘেরা ভগ্ন মঠ, মন্দির ও ছোট ছোট ঘর দালান প্রভৃতি রয়েছে। উপরের অংশ নাই। নীচের অংশ আট ন' হাত পর্য্যন্ত এখনও আছে। বড় বড় বুদ্ধমূর্ত্তি নূতন সেড্ লাগিয়ে রক্ষা করা হ'য়েছে। মূর্ত্তিগুলি মাটীর। কিন্তু এমন সুন্দর গঠন, গায়ে মাটীর চাদর জড়ান, চাদরের সুন্দর ভাঁজ, হাতের আঙুল ও নখ পর্য্যন্ত এমন

সুন্দর আছে যে দেখ্‌লে বিস্মিত হ'তে হয়। দু' একটী কুলুঙ্গীর মধ্যে স্থাপিত মূর্ত্তি নূতন কবাট লাগিয়ে চাবি দেওয়া র'য়েছে। একটী প্যাগোডা সুন্দর কারুকার্য্য শোভিত, প্রায় নূতন অবস্থায় ঘরের মধ্যে সুরক্ষিত র'য়েছে। ঘরের প্রকাণ্ড দরজা—তাহা তালাবন্ধ।

উচ্চ পর্ব্বত-গাত্রে—এই মঠেরই একাংশে, একটী ঘরের ছাদে একজন মুসলমানকে দেখা গেল। একটী ছোট কুঠরী,—তার মধ্যে মানবের বাসযোগ্য কিছু কিছু আসবাব দেখ্‌লাম। ঐ লোকটী আমাদের দেখে নীচে নেমে এল, এবং কোথা হ'তে আসা হ'য়েছে, কি প্রয়োজন প্রভৃতি প্রশ্ন ক'রে পাস দেখ্‌তে চাইলে। পাস দেখে, আমাদের সঙ্গে ক'রে সব ঘর খুলে, ঘুরে ঘুরে দেখালে। আমরা তৃষ্ণার্ত্ত ব'লে, একটী বহু পুরাণ ইঁদারার কাছে আমাদের নিয়ে গিয়ে জল পান ক'র্‌তে অনুরোধ ক'র্‌লে। লোকটীর বেশ ভদ্র ব্যবহার। ইহার সৌজন্যের প্রশংসা ক'রে এবং কিছু বকসিস্ দিয়ে আমরা বিদায় হ'লেম।

এই জনহীন অরণ্য ও শৈল-শিখরে, এই লোকটী একলা বসবাস করে, সাধু বা ফকিরের মত বেশভূষাও নহে। আমরা এই ব্যক্তির বিষয় আলোচনা ক'র্‌তে ক'র্‌তে এবং তার সাহস ও বীরত্বের প্রশংসা ক'র্‌তে ক'র্‌তে সেখান থেকে ফির্‌লাম। পথের পার্শ্বে বহু কণ্টকতরু—পথটীকে বিপদ-সঙ্কুল ক'রে রেখেছে। খালি পায়ে যাওয়া একরকম অসম্ভব। আমার পা-দু'খানি তখন কণ্টকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোনও রকমে টঙ্গায় এসে উঠলাম। টঙ্গা ষাণ্ডিয়াল অভিমুখে রওনা হ'ল। আমি গাড়ীতে ব'সে ব'সে পায়ের কাঁটাগুলি তুলতে লাগলাম। ক্রমে আমাদের টঙ্গা ষাণ্ডিয়ালে এসে পৌঁছিল।

যাণ্ডিয়াল

দেখ্‌লাম,—একটী উচ্চস্থানে—একটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। নীচে, কিছুদূরে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম, দু'চারখানি ঘর। টঙ্গাওয়ালা ব'ল্‌লে,—যদি জলপানের প্রয়োজন হয়, তবে ঐ গ্রামে গেলে জল পাওয়া যাবে। আমাদের সে প্রয়োজন থাকলেও গেলাম না,—পায়ের যাতনাও না যাবার আর একটী কারণ। এখানে সঙ্গে জল আনা উচিত। এত বড় প্রকাণ্ড জায়গা, জনহীন হ'য়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে দু'চারখানা ক'রে অসভ্য জাতির ঘর—তাহাই গ্রাম। আর ঐ সকল ক্ষুদ্র গ্রামের নামেই এই সকল ধ্বংস-কীর্ত্তির নাম। এখানেও এই ক্ষুদ্র গ্রামের নাম যাণ্ডিয়াল।

অনেক উচ্চ একটী প্রশস্ত ঢিপির উপর চকমিলান বারাণ্ডা ঘর প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে। প্রথমেই রাস্তা থেকে প্রশস্ত সোপান বেয়ে একটী চত্বরে উপস্থিত হ'লাম। প্রকাণ্ড কটকের দু'টী বৃহৎ স্তম্ভ, এবং চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত অঙ্গন,—সেখানে প্রবেশ করলাম্। অঙ্গনে মোটা মোটা স্তম্ভের উপর ছাদ ছিল,—এখন নাই। স্তম্ভের কতকাংশ অঙ্গনের মধ্যে মধ্যে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। অঙ্গন পার হ'য়ে পুনরায় সোপান অতিক্রম ক'রলেম। এখানে মন্দির বেষ্টন ক'রে চকমিলান বারাণ্ডা। বারাণ্ডা পার হ'য়ে পুনরায় সোপান অতিক্রম করলেম। এখানে আর একটী বারাণ্ডা এবং তার দু'দিকে সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ ঘর। এই সকল ঘরের একটী ক'রে গবাক্ষ-পথ রয়েছে। এই সকল কক্ষের সম্মুখ দিয়ে চকমিলান প্রশস্ত দালান ঘুরে এসেছে। এই দালানের পর সোপান, সোপান বেয়ে মন্দিরে

উঠ্‌লাম। মন্দিরে কোনও মূর্ত্তি নাই, কোনও বেদী নাই—শুধু একটা সম চতুষ্কোণ প্রশস্ত ঘর, ঘরের ছাদ নাই। এই ঘরের পিছনে ঘুরে গিয়ে দেখ্‌লাম, উভয় প্রান্তে সরু সরু দু'টী সোপান ঊর্দ্ধে উঠে গিয়েছে।

সোপান বেয়ে উপরে উঠ্‌লাম। দেখলাম,—এখানে দিব্য প্রশস্ত ছাদের মত প্রকাণ্ড মঞ্চ। বহুলোক একত্রে উপাসনা করবার যোগ্য স্থান। কত ঊর্দ্ধে এই স্থান! সংসারের কোলাহল বড একটা এখানে আসে না, এখানে উপবেশন ক'র্‌লে উপরে অনন্ত আকাশ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। কি মনোরম আরাধনার স্থল! সেখানে একটু উপবেশন ক'রলাম্। এই স্থানটী প্রদক্ষিণ ক'রতে যা লাভ হ'ল, তারই যাতনা দু'মাস যাবৎ ভোগ ক'রলাম্। ছোট ছোট কাঁটা এমন ভাবে পায়ে ফুটে গিয়েছিল, যে অনেকদিন তা বা'র হয় নাই। পায়ে এক-তিল পরিমাণ স্থানও বাদ ছিল না। জুতা না প'রে সফরে যাওয়া বাঙ্গালীর মেয়ের বিডম্বনা মাত্র। এখান থেকে পিণ্ডি সহরে ফিরে গিয়ে আগে জুতা কিনেছিলাম।

যাণ্ডিয়ালের মন্দির অনেকটা গ্রীক পার্থেননের অনুকরণে প্রস্তুত। অনেকে এইরূপ ধারণা করেন যে, ইহা সাইথোপার্থিয়ান সময়ের নির্ম্মিত এবং পূর্ব্বে জোরোয়াসট্রীয়ান পারসিকদের অগ্নি উপাসনার মন্দির ছিল।

সারকপ্ সহর

এখান থেকে আমরা সারকপ সহরের ধ্বংসাবশেষ দেখ্‌তে চ'ললাম। এটি একটা মাটী চাপা সহরের যেন একখানি নক্সা। বাড়ী গাঁথবার সময় দু'হাত আড়াই হাত ভিত উঠ্‌লে, বাড়ীর নক্সাটী যেমন পরিষ্কার বুঝা যায়, এও ঠিক তাই। প্রথমে মনে ক'রলাম—এ বুঝি কোনও প্রাসাদের ভিত গাঁথ্‌তে গাঁথ্‌তে অসমাপ্ত অবস্থায় পতিত রয়েছে। কিন্তু অগ্রসর হ'য়ে অদ্ভুত ব্যাপার দেখ্‌লাম। প্রায় আট দশ হাত মাটীর ভিতর খুঁড়ে ফেলেছে, কেবল পাথরের গাঁথনি,—প্রকোষ্ঠ, বারাণ্ডা, মন্দির, অঙ্গন, সোপান, প্রাচীর প্রভৃতি বা'র হ'য়ে আসছে। শ্রেণীবদ্ধ সারি সারি ঘর, তোরণ-দ্বার, প্রকাণ্ড চত্বর, অঙ্গন, চকমিলান বারাণ্ডা প্রভৃতি দেখলে—এখানে যে রাজবাড়ী ও প্রকাণ্ড সহর ছিল, তারই জ্বলন্ত প্রমাণ চোখের উপর ভেসে ওঠে।

খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই নগরী স্থাপিত হয়, এবং কুষণ নৃপতিগণের সময় পর্য্যন্ত ইহার সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি ছিল। বিশেষজ্ঞগণ এই স্থানেই তক্ষশীলার স্বনাম প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধ্যাপক ও বিদ্যার্থিগণের বাসস্থান ছিল ব'লে নির্দ্দেশ করেন।

এতদ্ভিন্ন আরও বহু গৃহীলোক এখানে বসবাস্ ক'র্‌তেন। তার প্রমাণ স্বরূপ এই স্থান খননের সময়, অনেক রকম রত্নালঙ্কার, স্বর্ণালঙ্কার ও নানারকম সোণারূপার পুতুল এবং বহুবিধ দেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে এবং এখনও পাওয়া যাচ্ছে। খনন কার্য্য স্থানে স্থানে এখনও চ'লছে। এমন প্রতিপত্তিশালী সহর—এমন ভারত-বিখ্যাত তক্ষশীলা নগরী,—সূর্য্যবংশীয় রামচন্দ্রের বংশধর ভরতের পুত্র তক্ষ যাহার অধিপতি ছিলেন,

তক্ষশীলা—সারকপ্ সহর

—৩৮
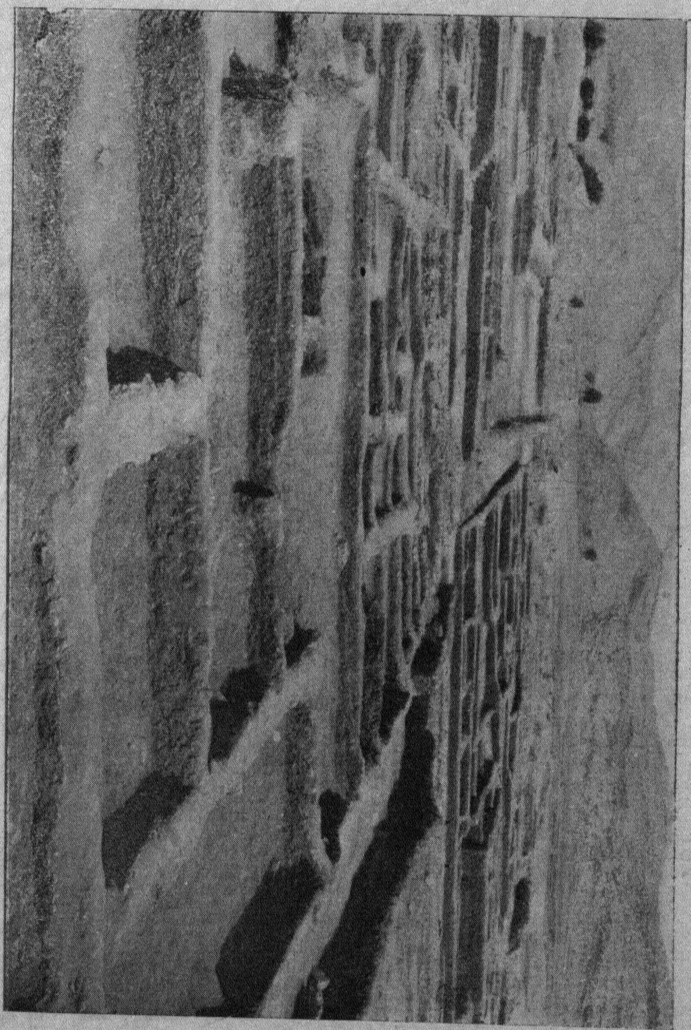
এবং ভিন্ন ভিন্ন হিন্দুরাজগণের রাজত্ব সময়ে যে স্থান জ্ঞান-গরিমায়, শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে ভারতের মস্তক স্বরূপ ছিল,—কালের প্রভাবে যুগ প্রলয়ে বসুমতী সেই তক্ষশীলা নগরীকে সম্পূর্ণ গ্রাস ক'রে ফেলে ছিলেন। বলিহারী ইংরাজ বাহাদুর—আবার সেই বসুমতীর উদরস্থ নগরীকে কেমন অক্ষত অবস্থায় জগতের সমক্ষে উপস্থিত ক'রেছেন।

এই তক্ষশীলা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের স্রোতে ভেসে গিয়েছিল। অনেক বৌদ্ধ কীর্ত্তি—এখনও তক্ষশীলার অঙ্গে—তক্ষশীলার অঙ্গে ভগ্নাবস্থায় মাটীর গর্ভে—কত অতীত যুগের স্মৃতি বিজড়িত হ'য়ে বিরাজ ক'রছে। কত রাজ্যের উত্থান ও পতন এরই বুকে লুকিয়ে রয়েছে। এই আমাদের হিন্দুরাজ্য—হিন্দুর গৌরবের স্থল। আমাদের হিন্দু-কীর্ত্তি মাটীর তলায় চাপা র'য়েছে। বিদেশী বর্ব্বর জাতি—এ নগর ধ্বংস ক'রলেও এখানকার কীর্ত্তি সকল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় নাই। তাহাদের অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান আছে। ইহা খাঁটি হিন্দুর কীর্ত্তি,—আমাদের পুণ্য ভূমি।

এই সব ছাড়া এখানে সারসুখ নগর, কুণাল স্তূপ, ধর্ম্মরাজিক স্তূপ প্রভৃতি আরও অনেক দেখ্‌বার জিনিষ আছে। একদিনে সমস্ত দেখা সম্ভবপর নহে, তার উপর পায়ে কাঁটা ফুটে পা অত্যন্ত ব্যথা হওয়ায়, আর কোথাও না গিয়ে এখান থেকে ষ্টেশনে ফিরে গেলাম।

তখনও ট্রেণের অনেক বিলম্ব। ষ্টেশনে বস্‌বার তেমন সুবিধা-জনক স্থান নাই, তার উপর রৌদ্রের তাপে ও পিপাসায় বড়ই কষ্ট হ'তে লাগ্‌ল। ষ্টেশনে বরফ লেমনেড খেয়ে কতকটা পিপাসার নিবৃত্তি হ'ল। অতি কষ্টে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করবার পর গাড়ী আস্‌লে গাড়ীতে উঠে ব'স্‌লাম এবং প্রায় সাড়ে সাতটার সময় পিণ্ডি ষ্টেশনে এসে পৌছিলাম। তখনও প্রায় এক ঘণ্টা বেলা আছে। ষ্টেশন থেকে

টঙ্গা ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া ক'রে খানিকটা সহর ঘুরে এবং পরদিন কাশ্মীর যাবার জন্য আমার জুতা, মোজা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কিছু কিছু জিনিষপত্র কিনে সন্ধ্যার পর কালীবাড়ী ফিরলাম। অত্যন্ত পরিশ্রমের জন্য সে রাত্রে আর রান্না ক'রতে পারলাম না। বাজার থেকে খাবার আনিয়ে আহার করা গেল। পরদিন কাশ্মীর যাবার জন্য কতকটা গোছগাছ ক'রে শোয়া গেল এবং সমস্ত দিনের পরিশ্রমের ফলে সত্বরই নিদ্রিত হ'লাম।

তৃতীয় অধ্যায়

কাশ্মীর

কাশ্মীরের পথে

শনিবার তক্ষশীলা যাবার আগে, মোটরওয়ালা কালীবাড়ী এসে, আমাদের কাশ্মীর শ্রীনগর যাবার জন্য বন্দোবস্ত ক'রে দু'খানা সিট্ রিজার্ভ ক'রে অগ্রিম পাঁচ টাকা নিয়ে গিয়েছিল। আমরা মোটর লরীতে গিয়েছিলাম। দু'জনের ভাড়া সম্মুখের সিটে টোল ট্যাক্স সমেত পনর টাকা। কারের ভাড়া লোক প্রতি আঠার কুড়ি টাকা, টোল ট্যাক্স আলাদা—তিন টাকা চার আনা। কিন্তু এই ভাড়ার কোনও নির্দ্দিষ্ট রেট নাই—কম বেশীও হয়। মোটরওয়ালার সঙ্গে কথা হ'য়েছিল—যে পরদিন বেলা দশটার সময় রওনা হ'ব।

পরদিন ২০শে বৈশাখ রবিবার সকাল সকাল দুটী ভাত রেঁধে খেয়ে, কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে দশটার মধ্যে প্রস্তুত হ'য়ে রইলাম। খাবার—পরোটা কালীবাড়ীর দ্বারবান প্রস্তুত ক'রে দিলে। খাবার নেবার কারণ—লরী দু'দিনে শ্রীনগর পৌছাবে। পথে কোনও চটিতে রাত্রিবাস ক'রতে হবে। অবশ্য 'কারে' গেলে এক দিনে শ্রীনগর যাওয়া যায়। আমরা পথের দৃশ্য ধীরে সুস্থে দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাব ব'লে 'কার' পছন্দ ক'রলাম না। (পয়সারও সাশ্রয় হ'ল) ধীরে সুস্থে দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাওয়ায় এবং চটিতে রাত্রিবাস করায় বেশ আমোদ আছে এবং ইহাতে নানারূপ অভিজ্ঞতাও হয়। পূর্ব্বে জ্বালামুখীতে যাবার সময় হোসিয়ারপুর থেকে

ক্রমান্বয়ে চারদিন গরুর গাড়ীতে (তখন সেখানে অন্য যান ছিল না) গিয়েছিলাম, তা'তে আমোদও বেশ পেয়েছিলাম।

প্রায় সাড়ে এগারটার সময় মোটরবাস কালীবাড়ীতে এসে পৌছিল। দ্বারবান, চাকর ও মেথর প্রভৃতিকে যথাযোগ্য পুরস্কৃত ক'রে, কালীমাতা ও পুরোহিত ঠাকুরকে যথাসাধ্য প্রণামী দিয়ে ও তাঁহাদের চরণে প্রণাম ক'রে জিনিষপত্র নিয়ে মোটরে উঠে ব'সলাম। মোটর ছেড়ে দিলে, দুর্গা দুর্গা ব'লে যাত্রা ক'রলাম। একটা কথা লিখ্‌তে ভুল হ'য়েছে—মোটর ওয়ালা সঙ্গে কাটা এনেছিল, আমাদের মালপত্র ওজন ক'রে, দু'খানা টিকিটের আধ মণ ক'রে একমণ বাদ দিয়ে, বাকি মালের দরুণ তিন টাকা লগেজ ভাড়া আদায় ক'রে নিলে। লগেজ প্রতি মণ তিন টাকা বারো আনা।

কালীবাড়ী থেকে মোটর ছেড়ে পিণ্ডি সহরে মোটরের আফিসে এসে গাড়ী দাঁড়াল, এবং আমাদের নামিয়ে নিয়ে আফিস-ঘরের ভিতর যত্ন ক'রে ব'সতে দিলে। সেখানে আমরা বাকি ভাড়া দিয়ে রসিদ নিলাম। প্রায় দু' ঘণ্টা পরে একটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময় সেখান থেকে গাড়ী ছাড়লো এবং কিছু দূর এসে এক বাড়ী থেকে একটী পাঞ্জাবী ভদ্রলোক, দু'টী স্ত্রীলোক ও দু'টী ছোট মেয়েকে উঠিয়ে নিলে। তাঁদের সঙ্গে একজন শিখ চাকর ছিল, লোকটী বেশ বিনয়ী, পথে অনেক জায়গায় আমরা তাহার দ্বারা অনেক সাহায্য পেয়েছিলাম। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটী বড় সজ্জন ও অমায়িক, তিনি কাশ্মীরের শাল ব্যবসায়ী জাতিতে পাঞ্জাবী শিখছত্রি। সপরিবারে শ্রীনগর যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ হওয়ায় শ্রীনগরে নেমে আমাদের একটু সুবিধা হ'য়েছিল। পথে চটিতেও ভদ্রলোক আমাদের অনেক তত্ত্বাবধান করেছিলেন।

বেলা দু'টার সময় মোটর রাওলপিণ্ডি ছেড়ে কাশ্মীরের উদ্দেশে

উত্তব মুখে ছুটতে লাগলো। পিণ্ডি থেকে শ্রীনগব এক শ' সাতানব্বুই মাইল। সুন্দব চওড়া বাস্তা। ১৪ মাইল সমতল ভূমিব পব—পর্ব্বত আবম্ভ হ'ল, পথ ক্রমশঃ চড়াই। এ স্থানেব নাম 'ববাকো'—সমুদ্র-পৃষ্ঠ হ'তে আঠাব শ' ফিট উচ্চ। আবও তিন মাইল যাবাব পর মোটব সাত্রামেল বা (১৭ মাইল) নামক স্থানে উপস্থিত হ'ল। এই স্থান দু' হাজাব ষাট ফিট উচ্চ। দেখ্‌লাম, বাস্তাব এ-ধাব থেকে ও-ধাব পর্য্যন্ত একটা কাষ্ঠদণ্ড (বাবেব মত) পথ বন্ধ ক'বে প'ড়ে ব'য়েছে। সেখানে আবও দু' তিনখানা মোটব দাঁড়িয়ে আছে, আমাদেব মোটবও সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। সেখানে ইংবাজ সবকাবেব টোল আদায় কবা হয়। (লোক প্রতি ছ' আনা) বলা বাহুল্য আমাদেব টোল ট্যাক্স ভাড়াব সঙ্গেই বন্দোবস্ত ছিল সুতবাং আমাদেব আব দিতে হ'ল না। টোল আদায় ক'বে মোটব ছেড়ে দিলে।

এব পব পার্ব্বত্য পথ ক্রমান্বয়ে চড়াই ও উৎবাই। বাস্তা ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ। ক্রমে চড়াই ও উৎবাই এত বেশী যে, গা বমি বমি ক'বৃতে থাকে। আমবা মোটবওয়ালাব কথামত সঙ্গে মিছবি ও ছোট এলাচ নিয়েছিলাম, অন্যান্য জিনিষও কিছু কিছু সঙ্গে ছিল। বকমাবি কিছু মুখে দিলে বমিব উপশম হয়। পাঞ্জাবী পবিবাব তেঁতুল ও লবণ সঙ্গে নিয়েছিলেন।

পর্ব্বত কেটে, পর্ব্বতেব গা ঘেঁসে ঘুবে ঘুবে বাস্তা চ'লে গেছে। দৃশ্য ক্রমশই সুন্দব। ঠিক যেন বায়স্কোপেব ছবিব মত চোখের উপব ভেসে ভেসে চলে যেতে লাগ্‌লো। পথ যত উপবেব দিকে উঠে গেছে, ততই দেখ্‌তে পাওয়া গেল, পথেব পাশে নুড়ি পাথব দিয়ে প্রায় দেড় হাত চওড়া ক'বে, দেড় হাত দু' হাত উচ্চ প্রাচীবেব মত দেওয়া বয়েছে, বিশেষতঃ ব্যাঁকেব মাথায়। বোধ হয়, পাছে অসাবধানে গাড়ী

কিনারায় গিয়ে পড়ে, তাই এই ব্যবস্থা। রাস্তার একদিকে গগনস্পর্শী পর্ব্বত, অন্যদিকে গভীর খাদ। চালক একটু অসাবধান হ'লে গাড়ী যে কোন খাদে—কোথায় গিয়ে প'ড়বে, তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত পাওয়া যাবে না। যেখানে যেখানে বেশী বাঁক এবং বিপদের সম্ভাবনা অধিক, সেই সেই স্থানে সতর্কতাসূচক চিহ্ন দিয়ে খুঁটি দেওয়া হ'য়েছে, এবং উহাতে বোর্ডের গায়ে রাস্তা কি ভাবে বেঁকে গেছে, তাহা অঙ্কিত করা আছে। এরূপ খুঁটি বহু স্থানে দেওয়া আছে। অনেক জায়গায় রাস্তা ইংরাজি অক্ষর 'ভি' এবং 'এস'এর মত বাকা। একে রাস্তা এরূপ ভয়ানক, তার উপর আবার কখন' কখন' পর্ব্বতের উপর হ'তে ধ্বস প'ড়ে আরোহী সমেত মোটরকে অতলতলে সমাধিস্থ করে দেয়,—তবে সে ঘটনা অতি বিরল। কিন্তু পাথর প'ড়ে রাস্তা বন্ধ হ'য়ে যাওয়াটা প্রায়ই ঘটে। সন্ধ্যার পূর্ব্ব থেকে এ পথে কোনও রকম গাড়ী চালান নিষেধ। বিচিত্র ব্যবস্থায় ঘুরে ঘুরে রাস্তা পর্ব্বতের গা দিয়ে উপরে উঠেছে।

এই ভাবে ছাব্বিশ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে, অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত নানা রকম ছোট ছোট গুল্ম এবং পাহাড়ী ঝোপের মত ছোট বড় গাছে ঢাকা জঙ্গলময় পর্ব্বতের পথ ভেদ ক'রে, চার হাজার ফিট উপরে 'ট্রেট্' নামক জায়গায় উপস্থিত হ'লাম। এর পর পাইন গাছের দৃশ্য দেখা গেল। এই গাছ হিমালয়ের দিকেই হয়। ইহা অতিশয় ঊর্দ্ধশির। শাখাগুলি নীচের দিকে বড় বড়, এবং ক্রমশঃই ঊর্দ্ধদিকে ছোট হ'য়ে একটি আরতির গাছ-প্রদীপের বা ঝাড়ের মত শোভা ক'রেছে। এর পাতাগুলি শিরাশূন্য গোল, আঙ্গুলের মত লম্বা লম্বা এবং খুব সরু সরু। আমাদের দেশের ঝাউ গাছের ভাব কিছু আসে। পাতার ডগায় ফিঁকে সবুজ বর্ণের ফলগুলি—কুঁড়ি অবস্থায় তুঁতে রঙ্গের আনারসের কুঁড়ির মত, এবং পাকা ফলগুলি—গৈরিক বর্ণের বেশ বড় বড় হয়, এবং খোপ

ছেড়ে কতকটা ফুলের মত হয়। এই ফল ভুট্টা বা মকাইয়ের মত বড় ; নীচের দিকে ঝোলে না, ঊর্দ্ধ শিরে ঝাড়ের গ্লাসের মত শোভা পায়। কাঁচা ফলগুলি বর্ণের উজ্জ্বলতায় যেন গাছের গায়ে জ্বলতে থাকে। পাতার মুখের গুচ্ছগুলিও ঊর্দ্ধমুখে থাকে। ঐ গুচ্ছগুলির বর্ণও অতি উজ্জ্বল। দেখ্‌লে মনে হয়—যেন এই গাছে শত শত সবুজ ঝাড়ে বাতি জ্বেলে দিয়েছে। চমৎকার শোভা! এখানে একটা ডাক বাঙ্গলা আছে। পূর্ব্ব থেকে বন্দোবস্ত ক'রলে খাবার ব্যবস্থাও হ'তে পারে। পিণ্ডি শ্রীনগর রাস্তার এইটুকুর নাম 'ঝিলম ভ্যালি রোড।'

আরও এক মাইল অগ্রসর হ'য়ে দেখ্‌তে পাওয়া গেল, পার্ব্বত্য ঝরণা ঝর্ ঝর্ ক'রে পর্ব্বতের গা বেয়ে চতুর্দ্দিকে নেমে আস্‌ছে এবং নীচের দিকে ছুটে চ'লেছে। শুন্‌লাম—এই জায়গার নাম ছড়াপানি। ইহার উচ্চতা ৪০৩১ ফিট। এখানে একটা ক্ষুদ্র পল্লী ও চায়ের দোকান আছে। ঝরণার সব জল নির্ম্মল নয়। শীতল বাতাস সলিল-সিক্ত হ'য়ে, মন বেশ প্রফুল্ল ক'রে দিচ্চে। এই জঙ্গল আর পর্ব্বতের শোভা বোঝাবার নয়, মনকে মুগ্ধ ক'রে রাখে।

ছড়াপানি ছেড়ে আরও উপরে পাঁচমাইল দূরে 'ঘোঁড়াগলি', ৫২৮০ ফিট উচ্চ। ঘোঁড়াগলি হ'তে ৫ মাইল দূরে আরও উপরে 'স্যানিব্যাঙ্ক'। এই স্থান ছ'হাজার পঞ্চাশ ফিট উচ্চ। স্যানিব্যাঙ্ক বড়ই মনোরম স্থান, পর্ব্বতের শৃঙ্গের উপর ব'ললেও হয়। এখানে ক্ষুদ্র বাজার, মদের ভাটি, ডাক বাঙ্গলা, কয়েকটা ছোট ছোট হোটেল ও স্যানিব্যাঙ্ক নামক বড় একটা হোটেল আছে। এখান হ'তে দু'দিকে দু'টা রাস্তা চ'লে গেছে,—একটা দক্ষিণে মারি পর্ব্বতের দিকে অপরটা বামে কাশ্মীরের দিকে। মারি পর্ব্বত এখান থেকে তিন মাইল দূরে আরও সাত শ' ফিট উচ্চে। মারি একটা সহর, এখানে ইংরাজ সৈনিকদিগের বৃহৎ ছাউনি ও পোলো

গ্রাউণ্ড আছে। এখান থেকে পর্ব্বতের গায়ে মারি সহরের বাড়ীগুলি কিছু কিছু দেখা যেতে লাগ্‌লো। রাওলপিণ্ডি এবং অন্যান্য স্থান হ'তে অনেকে গ্রীষ্মকালে এখানে এসে বাস করেন। মারি বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান। স্থানিব্যাঙ্কের পর উৎরাই আরম্ভ হ'ল। বিকাল সাড়ে ছ'টার সময় স্থানিব্যাঙ্ক হ'তে তেইশ মাইল ও পিণ্ডি হ'তে ষাট মাইল দূরে 'ছাবাটা' নামক স্থানে এক চটীতে গিয়ে আমাদের মোটর দাঁড়ালো। এখানে রাস্তার দু'ধারে কয়েকখানি চটী ও কয়েক খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান ভিন্ন আর কিছুই দেখ্‌লাম না।

এইখানে আজ রাত্রি বাস ক'র্‌তে হবে। এই সময় অর্থাৎ বৈশাখ মাসে রাওলপিণ্ডি ও এদিকে প্রায় সাড়ে আটটার সময় সন্ধ্যা হয়। কিন্তু এখানে দু'দিকে উচ্চ পর্ব্বতের মধ্যে,—নদীর কূলে সন্ধ্যা যেন কিছু আগেই বোধ হ'ল। এখানে সমতল ভূমি মোটেই নাই। পার্ব্বত্য পথে—পর্ব্বতের গায়ে এসে মোটর দাঁড়ালো। চটি একেবারেই পর্ব্বতের গায়ে। বেশ লাগলো—আজকের মত বনবাস। আজ কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া। যতই সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌লো—আলো আঁধারে পর্ব্বতের দৃশ্য ততই যেন ভয়ানক হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো; প্রাণে ভীতির সঞ্চার করে!—তবে আমরা দলে অনেক ছিলাম এবং পরে পরে আরও তিন চার খানা মোটর আসায় চটীতে আরও অনেক লোক এসে জমেছিল,— আর চটীও হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে চার পাঁচ খানা ছিল,—তাই এমন ভয়ানক স্থানে রাত্রিবাস করবার আনন্দটুকু নির্ভয়ে উপভোগ ক'রতে পারলেম। ভীতিহীন চিত্তে আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হ'চ্ছিল। নচেৎ এমন স্থলে যদি একলা রাত্রিবাস ক'র্‌তে হ'তো—জানিনা মনের অবস্থা কি রকম দাঁড়াতো।

পর্ব্বতের গায়ে—চটির অনেক উপরে ঝরণা। সেখান থেকে জল

আনিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ও জল পান ক'রে পিপাসা দূর করা গেল। চটি থেকে মালকটী ও পেঁয়াজের চাটনি কিনে এনে সকলেই বাঘের মত আহার সেরে নিলে। আমাদের সঙ্গে পরোটা, তরকারী ও মিষ্টান্নাদি ছিল, তা'তেই আমাদের আহারের পালা সাঙ্গ হ'ল। চটিতে কিছু দিতে হয় না,—কেবল প্রতি খাটিয়ার ভাড়া এক আনা হিসাবে দিতে হয়।

পরদিন ২১শে বৈশাখ সোমবার খুব ভোরে ওঠা গেল। চটির লোক আর একটা ঝরণা দেখিয়ে দিলে,—সেটি চটির নীচে রাস্তার ধারে। উপরে ছাদ ঢাকা, পাশে একটা চাতালের মত গাঁথা। মানুষের মাথার চেয়েও উঁচু একটা পরিষ্কার ঝরণার জলে নল লাগান হ'য়েছে। সেই নল দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে সুশীতল ঠাণ্ডা জল তোড়ে নেমে আস্‌ছে। ঝরণার জল ব্যবহারের সুবিধার জন্য এ দিকের প্রায় অধিকাংশ ঝরণায় এইরূপ নল লাগান আছে। ঐ ঝরণার জলে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে, কাপড়গুলা কেচে নেওয়া গেল। পরে ভোর পাঁচটার কিছু পূর্ব্বে পুনরায় রওনা হ'লেম।

নিটোল স্বাস্থ্য. নাতি ক্ষীণ নাতি প্রশস্থ, তেজোদ্দীপ্ত স্বচ্ছনীলাভ হাস্যোৎফুল্ল চটুল কিশোরের মত এই যে স্রোতস্বিনী, কল্‌ কল্‌ রবে শত প্রকার অস্ফুট ভাষায় আমার হৃদয় বীণায় ঝঙ্কার তুলে আমাদের আগে আগে নাচ্‌তে নাচ্‌তে পথ দেখিয়ে ছুটে চলেছে,—এই নদীর পরিচয় নিয়ে জানলেম যে, এই মনোরঞ্জনকারী উৎসধারা,—ভূস্বর্গ কাশ্মীরের সেই শোভাময় বিখ্যাত ঝিলম। এই কিশোর বালকরূপী সলিলের চাঞ্চল্যময় মনোমুগ্ধকর খেলা, আমাকে অভিভূত ক'রে তুলছিল। আমি যেন এই খেলার মধ্যে—এই নদীর রূপমাধুরীর মধ্যে—আমার চিত্ত-রঞ্জনের ব্যাপ্তরূপ প্রত্যক্ষ ক'রছিলেম! আর এই উছলিত জলস্রোতের কলকাকলীর মধ্যে, সেই কিশোর বালকের অস্পষ্ট মধুমাখা ভাষাগুলি

শুন্‌তে পাচ্ছিলেম। সে যেন আমাকে আহ্বান ক'রে ব'লছিল—'মা, আমায় দেখ দেখি,—আমি, এই জলের মধ্যে মিশিয়ে আছি,—আমায় প্রণাম করো।' আমার মনের কথা কলমের মুখে প্রকাশ করবার শক্তি আমার নাই,—শুধু এই মাত্র বলি, চটির কিছু আগে থেকে পর্ব্বতের মধ্য দিয়ে নিম্ন হ'তে নিম্নস্তরে ছড়িয়ে পড়া ক্ষীণরেখা শতমুখী যে স্রোতস্বতীর দেখা পেয়েছিলাম, সেই এখন কিশোর বালক ঝিলম হ'য়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পথ দেখিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে ছুটে চলেছে, অর্থাৎ সে যেন ব'লছে,—'আমার সঙ্গে এস। আমি দেখিয়ে দেব তার বাসা,—যাকে তুমি নিতুই খুঁজে বেড়াও।'

খরস্রোতা ঝিলম, উভয় পর্ব্বতের চরণ চুম্বন ক'রে, নির্ভীক অন্তরে নীলরঙের ছটা ছড়িয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। ঝোপ, ঝোপ ঝোপ-জঙ্গল-বিশিষ্ট পর্ব্বত আকাশ চুম্বন ক'রছে। পায়ের কাছে, ছলছল খলখল হাস্য ক'রে নদী ছুটে চ'লেছে। মাঝে মাঝে নানা রঙের ফুলকুল, গন্ধে আকুল ক'রে ফুটে র'য়েছে—চমৎকার দৃশ্য। এই জনবিরল পার্ব্বত্য পথে,—বিশ্ব-শিল্পীর অপূর্ব্ব রচনায়,—তাঁর কণামাত্র করুণার কথা, যাঁর মনে না পড়ে—তিনি পাষাণ।

এখান থেকে চার মাইল দূরে কোহালা নামক স্থান। কোহালা একটী ছোট নগর। এখানে ইংরাজ সরকারের টোল আদায়ের ব্যবস্থা আছে। এই স্থান বৃটিশ রাজ্যের শেষ সীমানা। পিণ্ডি হ'তে ইহার দূরত্ব চৌষট্টি মাইল। এই স্থান এক হাজার আট'শ আশি ফুট উচ্চ। এরই পরে কাশ্মীর রাজ্যের অধিকার। মধ্যে ঝিলম। ঝিলমের উপর প্রশস্ত সেতু। সেতুর ও পারে কাশ্মীর রাজার টোল আদায়ের ব্যবস্থা। আমাদের মোটর সেতুর এ পারে ইংরাজ অধিকারে, এবং ও পারে কাশ্মীর অধিকারে টোল গেটের নিকট দাঁড়াল। আমরা সেই অবসরে

কাশ্মীর—দো-মেল

মোটর থেকে নেমে একটু বেড়িয়ে নিলাম। এখানে কাশ্মীরের মহারাজার বিশ্রামাবাস আছে। এই স্থানে ঝিলম অনেক নীচে,—খরবেগে কল কল হাস্যে নাচ্‌তে নাচ্‌তে ছুটে আস্‌ছে। বালারুণের শুভ্র হাসি গায়ে মেখে বড় বড় পাথরের সঙ্গে বড় জোরে কোলাকুলি ক'রে, লাফিয়ে লাফিয়ে হীরকের দ্যুতি বিকীর্ণ ক'র্‌ছে। প্রভাতের মৃদু সমীরণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, বড় বড় ঢেউগুলি, ধর্‌ ধর্‌ ক'রে ছুটে চ'লেছে। কলহাস্য-নিরত এই কিশোর বালকের চপল খেলা বাঁ দিকে রেখে, কিছুক্ষণ পরে আমাদের মোটর ছুট্‌লো। রাস্তা বরাবর ঝিলমের ধার দিয়ে। এখান হ'তে দশ মাইল দূরে 'দুলাই'। এখানেও একটী ডাকবাঙ্গলা আছে। তারপর ক্রমে ক্রমে তিনটী পর্ব্বতের সুড়ঙ্গ পার হ'য়ে 'দো-মেল' নামক স্থানে পৌছালাম,—দুলাই হ'তে 'দো-মেল' দশ মাইল ব্যবধান।

এখানে কৃষ্ণ-গঙ্গা ও ঝিলম পাশাপাশি সঙ্গমে মিলিত হ'য়ে ছুটে চ'লেছে। লক্ষ্য ক'র্‌লে বর্ণের তফাৎ বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়। ওপারে নিদ্রিত ঐরাবত তুল্য সীমাহারা বিরাটকায় শায়িত নীলপর্ব্বত, এপারেও কাননকুন্তলা আকাশচুম্বী পর্ব্বতমালা, মধ্যে পদতলে শৈলবালা বিতস্তা ও কৃষ্ণ গঙ্গার দুরন্ত খেলা। উভয় তীরের সংযোজনা রক্ষার জন্য নদীর উপর একটী সেতু ঝুল্‌ছে, এই সেতুর উপর দিয়ে এবোটাবাদের দিকে একটী রাস্তা চ'লে গেছে। এ-হেন নীরব কাননের সৌন্দর্য্যের নিবিড়তায় প্রাণে যেন অতি প্রিয়জনের হারাণো স্মৃতি জাগিয়ে তুল্‌ছে—

করি-পৃষ্ঠ সম হেরি নীলাঞ্জন প্রভা গিরি
এলায়ে বিরাট দেহ ক'রেছ শয়ন,
আসন্ন মরণ সম আবরি নয়ন মম
কে তুমি পাষাণ-দেহ কেন অচেতন ?

ঊর্দ্ধশির আনমিত শৈলেন্দ্র কি নিদ্রাগত
অথবা কি দ্বন্দ্বাতীত সমাধিস্থ প্রায়,
কিম্বা কোন অভিশাপে নিদারুণ মনস্তাপে
শায়িত হ'য়েছ এই অনন্ত শয্যায় ?
কত কথা উঠে মনে শত ব্যথা জাগে প্রাণে
প্রাণহীণ কলেবর কি—বা এলাইত,—
অন্তর প্রদেশে কি—বা জাগরিত নিশি-দিবা
সুখ-দুঃখ ক্ষুধা-তৃষ্ণা—নহে নিবারিত !
আকুল হৃদয় মম হে নগেন্দ্র, অনুপম
হেরি তব সাম্যরূপ নীরব শয়ন,—
হে বাঞ্ছিত বন্ধুবর, আকর্ষিছ নিরন্তর
অলক্ষিতে ধায় প্রাণ চুম্বিতে চরণ !
জান কি ভূধর তুমি কি ব্যথায় কাঁদি আমি
কেন চাহি তব পদে লইতে শরণ ?
তিক্ত আজি এ সংসার বিষময় চারিধার
তাই সাধ এ নির্জ্জনে বরিতে মরণ !
হৃদয়ের ছবি মম তব রূপ নিরুপম
বাহিরে প্রকাশ দেখি বিকল হৃদয়,—
কামনা বাসনা ছার আশা-নিরাশার পার
তুমিই আমার ভাষা আজি মূর্ত্তিময় !
যবনিকা তুলি ধীরে ফুটে উঠে স্মৃতি' পরে
অন্তিমেতে পিতৃদেব শায়িত ধরায়,—
তারকা-বেষ্টিত শশী ভূতলে পড়িল খসি
করি আশীর্ব্বাদ সবে, নিলেন বিদায়।

তাংলিঙ

সেই মহাপুরুষের শেষ ছবি শয়নের
ফুটাইলে হৃদিতলে মর্ম্মভেদ করি,
কে তুমি কেন বা আজ পরিয়া বৈরাগ্য-সাজ
মন-মাঝে কও কথা বিবেক সঞ্চারি ?
দুর্লঙ্ঘ্য গিরির সম সে বিয়োগ-ব্যথা মম
জীবনের ধারা-তটে হ'য়েছে অচল,
সীমাহারা চিত্তাকাশে কৃষ্ণ ছায়া ভেসে আসে
ছায়াতলে স্মৃতিরাশি বেদনা কেবল !
মৃতের সমান আজ শুয়ে আছ শৈলরাজ,
শৈলসুতা পদতলে শত লীলা করি,
অপূর্ব্ব তরঙ্গমালা বরাঙ্গে ধরিয়া বালা
উল্লাসিতা,—কত খেলা খেলিছে সুন্দরী।
হে নগেন্দ্র, তোমা হেরে— আর ওই তটিনীরে
মনে হয় মৃত্যুকোলে জীবনের স্রোত—
চলেছে অনন্ত পথে নাহি কেহ ফিরাইতে
বৈরাগ্য পাষাণ-স্তূপে ক্ষণ গতিরোধ !
মরণের রূপ নিয়ে আছ হোথা এলাইয়ে
তোমারে ঘেরিয়া নদী হ'য়েছে বাহিত,
অমনি মরণ-পারে করম-নদীর নীরে
আমার' জীবন-তরী হ'তেছে চালিত !
মম জীবনের স্রোত চলে, নাহি গতিরোধ
দুঃখময় স্মৃতিরাশি অচলের সম,—
আমিত্ব সংজ্ঞার তটে দাঁড়াইয়া আছে বটে
স্নেহরূপী নীরা ছুটে কাঁদি অবিরাম !

পিতা ভ্রাতা কোথা মম কোথা পুত্র অনুপম
মাতৃহীনা ভ্রাতৃকন্যা পালিনু যতনে,
জ্যেষ্ঠ আর্য্য-পুত্র সুতা সুখে দুঃখে অনুগতা
ভাগ্যবতী ভ্রাতৃজায়া যুগল রতনে।
হৃদয়ে গোপন কোণে পুষেছিনু কত জনে
সোহাগে আদরে আহা কুসুম-কোরক,—
কি যেন যাদুর বলে হরণ করিল কালে
নিশা-শেষে মিশাইল তারকা স্তবক !
জীবনের ধারা কুলে বসি, হাতে ডালি তুলে
একে একে ভাসাইনু বিয়োগের জলে,
তাদেরি, যাদের তরে হৃদয ফাটিয়া ঝুরে
বিন্দু বিন্দু রক্তধারা মিশি অশ্রুজলে।
মম প্রিয় সাথী যারা একে একে গেছে তারা
সেই স্মৃতি ধারাকারে ঝরে অশ্রুবারি,—
নগেন্দ্র, তোমায় হেরে পরাণ বিকল করে
ছায়াময স্তব্ধ কিবা বিষাদ বিথারি।
তারা গেছে যেই দেশে আমি যার আছি ব'সে
মরণের কুলে মোর তরি ভেসে যায়,
ডাকে কাল কাণে কাণে, কাঁদে প্রাণ তারি টানে
কে যেন গাহিছে কাণে—'আয় কুলে আয়'।
তোমার চরণতলে বিতস্তা নাচিয়া চলে
মেতেছে তাণ্ডব-নৃত্যে না লয বিশ্রাম,
ফুৎকারে ছিটায়ে জল হাসিতেছে খল খল
উন্মাদনাময়ী গীতে তোলে বীর তান !

কভু বা ললিত নৃত্যে মধুর মোহন গীতে
জুড়ায় শ্রবণ সদা তৃপ্ত করে প্রাণ,
উৎসাকারে মুক্তা-ধারা তুলি কভু শত ধারা
মুক্তাময়ী মুক্তামালা গাঁথে অবিরাম !
মনে হয় দেব-বালা জলে নেমে করে খেলা
ফণীর আকারে বেণী পিছে ভেসে যায়,
সন্তরণে দিয়া পাড়ি ভাসাইয়া নীল সাড়ী
করি কিবা জলকেলী, চলেছে কোথায় !
তরঙ্গ তুফান তুলে ঘন ঘন হাস্য রোলে
বাধা পেয়ে ছুটে চলে, শিরে শিরস্ত্রাণ,
ফেনার মুকুট শিরে দুধ-শুভ্র জ্যোতি ক্ষরে
তরঙ্গের ভঙ্গে গাহে জীবনের গান !
নাচিতে নাচিতে তায় দলে দলে ছুটে যায়
মনোহর গতি-ভঙ্গ অপরূপ শোভা,—
কভু বীরত্বের খেলা কভু মৃদু শত ছলা
কভু রবি-কিরণের বিকীর্ণিছে আভা !
নীল কায়া জলরাশি 'কৃষ্ণা' তায় গেছে মিশি
সফেন তরঙ্গরাশি উঠে লাফাইয়া,
বরুণের মেয়ে বুঝি জলে করে কুলকুচি
উৎক্ষেপি সলিলরাশি দেয় ছিটাইয়া ।
জল-কুমারীরা মিলে খেলা করে জল-তলে
এলাইত শুভ্র কেশ ভেসে যায় জলে,
জলতলে সন্তরণ জল ভঙ্গ অগণন
উর্ম্মিমালা সৃষ্টি করি আগু পাছু চলে ।

কোথা জল-বালকেরা　　　করিতেছে জল-খেলা
উৎক্ষেপিয়া জলরাশি দিতেছে ছিটায়ে,
বুঝি মুষ্টি-যুদ্ধ কত　　　করিতেছে অবিরত
ঝাঁপ দিয়া জল-তলে যেতেছে লুকায়ে।
উহারে হেরিলে আর　　　হৃদয়ে হয় না তার
মরণের বিভীষিকা পিছনে বসিয়া,
তিলে তিলে হ'রে লয়　　　জীবিতের আয়ুচয়
এ শুধু জীবন্ত ছবি রয়েছে ফুটিয়া!
ও-ই জলকেলী হেরি　　　মনে হয় আহা মরি
এই জীবনের ছবি নির্ব্বাণ ওখানে,
বাসনা-জড়িত চিতে　　　খেলিতেছে পৃথিবীতে
জীব কুল, জানে না সে—স্পর্শিবে মরণে!

এই দো-মেলে দেখ্‌লাম—ঝিলমের ধারে, রাস্তার ওপরে ষ্টেশনের মত কি একটা রয়েছে। রাস্তার দু'ধারে সারি সারি আফিস ঘর, মধ্যে রাস্তার উপর সেড্। সম্মুখে রাস্তার উপর একটী লৌহ-দণ্ড রাস্তা বন্ধ ক'রে র'য়েছে, উপরে লেখা আছে 'টোল-গেট।' এখানে টোল আদায় হয় ও সমস্ত কাশ্মীর-যাত্রীর মাল-পত্র সব পরীক্ষা করা হয়। ইহার জন্য এখানে মহারাজার অনেক কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। এখানে আরও অনেক 'কার' ও 'লরী' দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের মোটরও এসে এখানে দাঁড়ালো। এখানে নূতন কাপড়ের উপরই বেশী জুলুম। নূতন কোনও জিনিষ নিয়ে যাওয়া উচিত নয়—বিশেষতঃ কাপড়। অন্ততঃ একবার ব্যবহার ক'রে নিয়ে গেলে আর কোনও গোল থাকে না। নূতন কাপড়ের উপর অতিরিক্ত মাশুল আদায় করে।

একটী ভদ্রলোক ইঞ্জিনিয়ার রেঙ্গুন থেকে সপরিবারে কাশ্মীর গিয়েছিলেন। খালসা হোটেলে আমাদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হ'য়েছিল। তাঁর কাছে শুনলাম, তিনি কাশ্মীর যাবার সময় ৺কাশীধাম হ'তে আটচল্লিশ টাকার সিল্কের কাপড় নিজের ব্যবহারের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন, এখানে তাঁকে ধ'রেছিল, নিজের ব্যবহারের জন্য বলাতেও নিষ্কৃতি পান নাই। তাঁকে তের টাকা মাশুল দিতে হ'য়েছিল। ব্যবসায়ের জন্য কোনও রকম নূতন দ্রব্য নিয়ে গেলে, আরও অতিরিক্ত মাশুল দিতে হয়। এখানে কাহারও রেহাই নাই,—এমন কি ইংরাজ পর্য্যন্ত। সকলের মালপত্র, ট্রাঙ্ক পর্য্যন্ত খুলে তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান করা হয়,—তবে বেশ ভদ্রভাবে। শুনলাম কাশ্মীর থেকে ফেরবার সময় এখানে কোনও হাঙ্গামা নাই, কাশ্মীর থেকে আনীত কোনও দ্রব্যের উপর মাশুল দিতে হয় না।

শুনলাম, এখানে প্রত্যেক 'লরী'র জন্য পঁচিশ টাকা ও প্রত্যেক 'কারের' জন্য দশ টাকা ট্যাক্স দিতে হয়। এখানকার এই সমস্ত আদায়ী টাকা এ অঞ্চলের রাস্তা মেরামতাদি কার্য্যে ব্যয় করা হয়। আফিসে মোটা মোটা লেজারের মত খাতায়,—নাম, ধাম, পিতার নাম, জাতি, পেশা, কি জন্য কাশ্মীরে গমন, কোথায় কতদিন থাকা হবে, সঙ্গে আর কে কে আছে, এই সমস্ত লিখে দিতে হয়। কাশ্মীর হ'তে ফিরে রাওলপিণ্ডি অবস্থান কালে শুনেছিলাম, আমাদের কাশ্মীর থেকে ফিরে আসার কিছু দিন পরে, রাজ-সরকার হ'তে এখানে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। যদি কাহারও কাসির ব্যারাম বা ঐ সংক্রান্ত কোনও ব্যারাম থাকে, তা' হ'লে তাঁহার কাশ্মীর যাওয়া নিষেধ।

এই সব ক'রতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা কেটে গেল। এই সময়টা আমরা ক'জন মেয়েছেলে নদীর ধারে গিয়ে ব'সে কিছু জলযোগ ক'রে

নিলাম। এখানে খাবার—মিষ্টান্ন, চা, লেমনেড্, গরম দুধ প্রভৃতি পাওয়া যায়। একটী সুন্দর ঝরণা আছে, তাহার জল অতি সুস্বাদু। আমরা এই জল আকণ্ঠ পান ক'রে তৃপ্ত হ'লাম। উনিও এখানে জলযোগ ক'রে নিলেন।

দো-মেলে আড়াই ঘণ্টা গাড়ী দাঁড়াবার পর প্রায় বেলা সাড়ে দশটার সময় পুনরায় গাড়ী চলতে সুরু ক'রলে। ক্রমে ক্রমে নূতন নূতন মনোরম দৃশ্য চোখের উপর ভাস্‌তে লাগ্‌ল। মনে হ'তে লাগল—যেন কোন স্বপ্ন-রাজ্যে বা মায়াময় রাজ্যে বিচরণ ক'চ্চি, মন মোহিত হ'য়ে গেল। দু'দিকে গগনস্পর্শী পর্ব্বত—পর্ব্বতের গা দিয়ে কৃষ্ণগঙ্গা ও ঝিলম মিলিত হ'য়ে, খরতর বেগে রূপের লহর তুলে সশব্দে এঁকে বেঁকে ছুটে চলেছে। আর তার ধার দিয়ে রাস্তাও সেইরূপ সর্পগতিতে, চড়াই উৎরাই এর মধ্য দিয়ে চ'লে গেছে। মাঝে মাঝে পর্ব্বতের গা দিয়ে ঝরণার জল, ঝর্ ঝর্ শব্দে নেমে এসে নদীতে মিশে যাচ্চে। কোথাও পর্ব্বতের গায়ে ছোট ছোট কুটীর,—কোথাও বা ছোট ছোট শস্যক্ষেত্র শোভা পাচ্চে। বিতস্তার পথ-প্রদর্শিতা সর্পগতি রাজপথে,—চালকের অদ্ভুত নিপুণতায়, আমাদের গাড়ী এ কোন্ কল্পিত স্বর্গে বা মায়াময় স্বপ্ন-রাজ্যে এসে উপস্থিত হ'ল!—

কোন্ মায়াময় রাজ্য কার শিল্প কারুকার্য্য
নির্ব্বিচারে এইখানে উঠেছে ফুটিয়া?
কবির কল্পনা নয়— কিম্বা চারু চিত্রচয়
বাস্তবে নয়ন-পথে রয়েছে ভাসিয়া!
বিশাল জলধি সম পর্ব্বত তরঙ্গ ঘন
স্তরে স্তরে চ'লে গেছে দূর দূরান্তর,—

নয়নরঞ্জনকর অথচ কঠিন স্তব
বিচিত্র সবুজ বর্ণে রঞ্জিত ভূধর !
ঘন বৃক্ষরাজি তায় গহন কানন প্রায়
আকাশ চুম্বন করে সমুন্নত শির,—
তলে গিয়া দেখ তার মার্জ্জিত সু-পরিষ্কার
প্রদানিছে পরিচয় কিবা সুরুচির !
আবার ভূধর-গাত্রে ফিরাইয়া মুগ্ধ নেত্রে—
হের গো ! বিশাল বপু পর্ব্বতের গায়,—
নেমে আসে স্বর্গ-সুধা অতিক্রমি সর্ব্ব বাধা
বনশ্রেণী ভেদ ক'রে চ'লেছে কোথায় !
কল কল ছল ছল তালে তালে পড়ে জল
কোথাও মলিন কোথা হেরি সুনির্ম্মল,
মুকুতার ঝুরা মত ঝর ঝর অবিরত
রাশি রাশি ফেনা নামে, ক'রে কল কল।
মৃদঙ্গ নিনাদ সম সু-গম্ভীর গর্জ্জে ঘন
কোথাও বা রিণি রিণি বীণার নিক্কণ,
কোথাও রয়েছে হরি,— বদন ব্যাদন করি
ধীরে ধীরে ঝরে হরি, ভেদিয়া বদন !
নেমে—হাসে খল খল ক্রমে ধরি ভীম বল
পর্ব্বতের সানুদেশে—করিছে বিহার,
করুণার ধারা দিয়ে কে সাজালে হিমালয়ে
এ পাষাণে কে পরালে মেখলার হার !
আবার ফিরায়ে আঁখি হের, শৈল-অঙ্গ ঢাকি
পারস্য গালিচা যেন রেখেছে বিছায়ে,

কভু লাল নীল কভু   শ্যামল হরিদ্রা কভু
মসৃণ সুবর্ণ চিত্রে তরঙ্গ উঠায়ে,—
তোল' নেত্র ঊর্দ্ধ পথে   অপূর্ব্ব আলোক-রথে—
হেরিবে—বিরাট দেহ হিমাদ্রি শিখর,
কালো রূপ আলো ক'রে   তুসার মুকুট শিরে
হীরকের দ্যুতি ক্ষরে মনোমুগ্ধকর!
দাও নেত্র নিম্নস্তর   বুঝি দেব সরোবর
মাণিক্য রতনরাজি সোপান-শোভনা—
চৌদিকে পর্ব্বত ভায়   চত্বর সোপান তায়
কোন্ শিল্পী এই স্তর করেছে রচনা?
ঝরণার জলরাশি   বেঁধেছে নিপুণ চাষী
মাটি আর পাথরের আলি দেছে তায়,—
সোপানের শ্রেণী মত   নেমে গেছে স্তর যত
শশাঙ্কের রেখা সম ভূধরের গায়!
টল টল করে জল   কাচ সম সুবিমল
শোভে আলি শ্যাম রেখা অতি মনোহর,—
আকাশের ছবি তায়   পড়ি কিবা খেলে যায়
রজত মুকুর সম নব ভাবান্তর।
নীলিমা ঢালিয়া জলে   অঙ্কুরিত তৃণদলে
রেখেছে সজ্জিত ক'রে তুলিকা-সম্পাতে,
কোথাও নীলের খেলা   কোথা সবুজের মেলা
কি ছবি উঠেছে ফুটে সুনিপুণ হাতে!
চৌদিকে পর্ব্বতশ্রেণী   মধ্যে শোভে নিম্নভূমি
নিম্নমুখে নির্ঝরিণী যেতেছে ছুটিয়া,

উপরে ভূধর-গায় ঘন বন শোভা পায়
বিচিত্র বরণ ফুল রয়েছে ফুটিয়া !
বিচিত্র বরণ মাখা বিচিত্র শোভায় ঢাকা
বিচিত্র রূপেতে কিবা চিত্রিত ভূধর,—
হে শিল্পি, নির্জ্জনে বসি জগতের রূপরাশি
রেখেছ বিচিত্র ভাবে ভুলাইতে নর।
অতিক্রমি যত পথ নবরূপে রূপান্তর
নর্ত্তকীর অঙ্গ-শোভা ভঙ্গী করে কিবা,—
বিকাশি নয়ন-পথে চটুল চপল শ্লথে
নৃত্যকলা বিকীর্ণিছে নিত্য নব আভা !

ক্রমে ক্রমে গড়হি, চেনারি প্রভৃতি স্থান ছাড়িয়ে চ'ল্‌লাম। এইরূপে প্রায় পঞ্চাশ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে 'উরি' নামক স্থানে মোটর এসে বিশ্রাম লাভ ক'রলে। এখানে একটী ডাক বাঙ্গলা আছে। হোটেল ও চটি অনেক আছে, হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে পৃথক পৃথক। এ দিকের প্রত্যেক স্থানের হোটেল ও চটি এইরূপ। আমরা হোটেল থেকে রুটী, ডাল, তরকারী ও দধি কিনে সে বেলার মত আহারাদি সেরে নিলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে আবার কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা গেল। উরি ছাড়িয়ে প্রায় আট মাইল দূরে মাহুরা গ্রাম। এখানে ঝিলমের তীরে বিজ্‌লীর কারখানা দেখ্‌লাম। এখান থেকে শ্রীনগরে তড়িৎ সরবরাহ হয়। এর পর গাড়ী নীচের দিকে নাম্‌তে লাগল। এখান থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দূরে বারমূলা নামক স্থানে মোটর এসে দাঁড়াল। বারমূলা একটী উপত্যকা ও সহর। পথের ধারে কাঠ ও

পাথরে গাঁথা বাড়ী ও দোকান—দেখতে বেশ সুন্দর। এখানে টঙ্গার দেখা পাওয়া গেল। এখান হ'তে জলপথে, সোপর ও উলার হ্রদের মধ্য দিয়েও শ্রীনগর যাওয়া যায়। দু'কূলে দিগন্ত-বিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী। ঝিলম এখানে নীল কায়া। ঝিলম-বক্ষে সুন্দর সেতু। বড় বড় সুন্দর সুন্দর মাঠ ও উদ্যান। দূরে পর্ব্বতশ্রেণী ও আকাশে মেঘপুঞ্জের শোভা,—সবগুলি এক সঙ্গে মিশে মনোরম ছবির মত দেখাচ্ছিল। দূরে পর্ব্বত-গাত্রে ঘন জঙ্গলাকার আকাশস্পর্শী পাইন গাছের সারি, তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘরগুলি—যেন দেববালা অপ্সরাদের বিলাস-কুঞ্জের মত মনকে মুগ্ধ করে তুলেছিল। প্রতিক্ষণেই মনে হ'চ্ছিল—হয়ত এখনই বৃক্ষ-শিরের উর্দ্ধদেশে—আকাশ-পথে পক্ষ সঞ্চালনে গৃহাভিমুখিনী পরীগণের ফুটন্ত কুসুম সদৃশ সুন্দর মুখখানি দৃষ্টি পথে পড়বে; অথবা শকুন্তলার মত কোনও ঋষি-বালিকার দুষ্মন্তের ন্যায় কোন প্রিয়তমের মিলনাভিলাষিণী মূর্ত্তি মানস-নেত্রে ফুটে উঠে আবার নয়নান্তরালে চ'লে যাবে। মারী পর্ব্বতের সীমান্ত হ'তে কাশ্মীরের পথে—কোথাও চিত্র—কোথাও বিচিত্র—কোথাও মনোরম—কোথাও মোহকর এই মায়াপুরী বা দেবপুরীর সৃষ্টি হ'য়েছে। বাস্তবিক কাশ্মীর যে ভূ-স্বর্গ অথবা স্বর্গ,—এই সমুদয় দৃশ্যই সেই কথার মীমাংসক। অবশ্যই ইহা স্বর্গের সোপান। এই স্তরে স্তরে সজ্জিত মনোরম বিলাস-কুঞ্জ,—বিশ্ব-শিল্পী কার জন্য রচনা করেছিলেন? কা'কে সন্তুষ্ট করবার জন্য—তিনি এই মহা প্রকৃতিকে নিত্য নৃত্যশীলা নটীর বেশে, কাশ্মীরের দ্বারে বন্দিনী ক'রে রেখেছেন!

চ'লতে চ'লতে পত্তন সহরে উপস্থিত হলাম। বারমূলা হ'তে পত্তন সতেরো মাইল। এখান থেকে শ্রীনগর আঠার মাইল। বারমূলার পর থেকে প্রায়ই সমতল ভূমি। মাঝে মাঝে ধানের ক্ষেত ও মাঠ। দূরে

আম্যাবর্দ

চারিদিকে পর্ব্বত বেষ্টিত। উত্তরে ২৬,৬০০ ফুট উচ্চ 'নাঙ্গা' পর্ব্বত ও ১৬,৯০০ ফুট উচ্চ 'হরমুখ শৃঙ্গ' বা 'কৈলাস পিক' এবং আরও অন্যান্য পর্ব্বতশ্রেণী,—ইহারা হিমালয়ের অংশ। ইহাদের শীর্ষদেশে বরফ জমিয়া অতি সুন্দর শোভা ধারণ ক'রেছে। তখন বেলা পাঁচটা। অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ সেই বরফের উপর প'ড়ে, দুগ্ধ-ফেন-নিভ শুভ্র তুষারের উপর বঙ্কিম ছটা ছড়িয়ে দিয়ে, রূপের তরঙ্গ তুলে দিয়েছে। এখান হ'তে শ্রীনগর যাবার রাস্তার দু'ধারে, সফেদা (পপ্‌লার) বৃক্ষশ্রেণী সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন, কোনও নরপতিকে অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্য তাঁহার সৈনিকগণ, নিশ্চলভাবে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে, তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা ক'র্‌ছে। অনেক জায়গায় রাস্তা ঠিক সোজা এবং পপলার বৃক্ষগুলিও সেইরূপ সমান ভাবে সারি দিয়ে বসান হ'য়েছে। সব গাছগুলিই এক রকম। খুব উচ্চ—ক্রমশঃ উর্দ্ধে গিয়ে প্রায় পরস্পর মিশে গেছে, এবং তার মধ্য দিয়ে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। দূরে চারিধারে পর্ব্বতশ্রেণী তুষার মুকুট পরে দাঁড়িয়ে আছে। সব গুলির সমন্বয়ে ইহা এত সুন্দর হ'য়েছে যে, দেখ্‌লে মন মোহিত হ'য়ে যায় ও অনিমেষ লোচনে পথের দিকে চেয়ে থাক্‌তে হয়, এবং মনে হয়—কাশ্মীর ভূ-স্বর্গ—সেই ভূস্বর্গে যাবার সোপান স্বরূপ এই পথ—তাই এর এত সৌন্দর্য্য! শুনা যায়—এ সৌন্দর্য্য ভারতের আর কোথাও নাই।

সফেদা বা পপ্‌লার বৃক্ষগুলি আমাদের দেশের ঝাউ গাছের মত খুব উঁচু। গুঁড়িগুলি সুগোল এবং চূণের মত সাদা। জমি হ'তে পাঁচ ছ'হাত পর্য্যন্ত ডাল নাই—পরে শাখাগুলি কাণ্ডের গা ঘেঁসে উর্দ্ধমুখে উঠে গেছে। শাখার প্রশাখা নাই। পাতাগুলি ছোট ছোট পানের মত,—সুতরাং ইহার পরিধি বেশী নয়। দেখ্‌লে ফাঁক ফাঁক কাজ জড়োয়া গহনার মত,—পান্নার মত সবুজ পাতা, গুঁড়ির সাদা বর্ণ, রূপার

প্লেটের মত বেশ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। যেখানে এই গাছ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সেখানেই এমন ঘন সন্নিবিষ্ট ভাবে রোপন করা হ'য়েছে,যে দেখ্‌লে মনে হয়,—যেন পরস্পরে বাহু-বন্ধনে দাঁড়িয়ে আছে। এই গাছের তলায় ইহার রাশি রাশি সাদা সাদা ছোট ছোট ফুল (বাঙ্গলা দেশের বকুল ফুলের মত) বিছিয়ে আছে,—দেখ্‌লে মনে হয়, কে যেন তাহা সুবিন্যস্ত রেখাঙ্কিত ক'রে পথের ধারে সযতনে সাজিয়ে রেখে দিয়েছে। এই ফুলের গন্ধ অতিশয় সুন্দর, প্রায় সর্ব্বদাই পুষ্প বৃষ্টির মত (শিমুল তুলার ফল ফাট্‌লে যেমন বাতাসে উড়ে দেশময় হয়) পতিত হ'চ্ছে। ইহার গন্ধে পথ আমোদিত ক'রে রেখেছে। শুন্‌লাম এই সফেদা গাছ ভারতের আর কোথাও নাই বা হয় না, ইহা কাশ্মীরের নিজস্ব। কাশ্মীরের প্রায় সর্ব্ব স্থানেই এই গাছ দেখা যায়। পাইন দেয়ার ও সফেদা—উচ্চ শিরবিশিষ্ট এই তিন শ্রেণীর বৃক্ষে কাশ্মীরের শোভা বর্দ্ধন ক'রে রেখেছে। কোনও পর্ব্বতের উপর থেকে যখন কাশ্মীরের দৃশ্য দেখা যায়,—তখন রেখাঙ্কিত সবুজ মাঠের উপর, যেমন নদী,জল, ক্ষেত্র এবং ঘর বাড়ীর রোপাপাত হ'য়েছে দেখতে পাওয়া যায়, তেমনই আকাশের গায়ে,এই বৃক্ষগুলির দীর্ঘ চিত্র শোভা পায়। কাশ্মীরের স্থানে স্থানে সীমানার ন্যায় সফেদা বৃক্ষগুলি শোভা বর্দ্ধন ক'র্‌ছে।

শ্রীনগর

১৩৩৮ সাল, ২১শে বৈশাখ, সোমবার বিকাল সাড়ে ছ'টার সময় আমরা কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে গিয়া উপস্থিত হ'লাম। সমস্ত মোটর খালসা হোটেলের প্রায় সম্মুখে গিয়া দাঁড়ায়। সেই খানেই সমস্ত মোটরের আড্ডা। আমাদের মোটর সহরের ভিতর প্রবেশ করে হরিসিং হাই ষ্ট্রীটে মাল নামাবার জন্য দাঁড়াল। সঙ্গের পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটী সপরিবারে সেই খানেই নেমে গেলেন। কেবল আমরা দু'জনে গাড়ীতে রইলাম। আমাদের খালসা হোটেলে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সেই ভদ্রলোকটী আমাদের হোটেলে যেতে নিষেধ ক'রে নিকটবর্ত্তী এক ধর্ম্মশালায় যেতে অনুরোধ ক'র্‌লেন এবং ব'ল্‌লেন যে ঐ ধর্ম্মশালার বন্দোবস্ত খুব ভাল, আপনাদের কোনও কষ্ট হবে না।' তাঁহার কথায় আমরা রাজি হওয়ায়, তিনি তিন জন কুলি ঠিক ক'রে, মাল পত্র সহ আমাদের ধর্ম্মশালায় পাঠিয়ে দিলেন।

পাঁচ ছ' মিনিটের মধ্যে আমরা ধর্ম্মশালায় এসে উপস্থিত হ'লাম। ধর্ম্মশালাটী চারিদিকে চক্‌মিলান দোতলা বাড়ী। উপরে নীচে অনেক গুলি ঘর। বিজলি বাতি আছে,—কিন্তু ঘরের ভিতর নয়,—বারাণ্ডায়। জলের কল ও পাইখানা নীচেয়, রাঁধবার বন্দোবস্তও নীচেয়। এক সঙ্গে পাশাপাশি অনেক গুলি চুলা,—মাঝে মাঝে তিন চার চুলা অন্তর পার্টিসান করা। নাম বদ্রীনাথ ধর্ম্মশালা।

আমরা উপরের এক ধারের একটী ঘরে আশ্রয় নিলাম। ধর্ম্মশালার দ্বারবান একটী চাকর ঠিক ক'রে দিলে, মাইনা সাত টাকা ও খাওয়া। আমাদের ঘরে দু'খানা চার পাই (দড়ির খাটিয়া) দিল। প্রত্যেক

খানার ভাড়া দৈনিক এক আনা। ঘরের ভাড়া নাই। (কোন জায়গায় ধর্ম্মশালার ঘর ভাড়া নাই) সে রাত্রি বাজার থেকে খাবার এনে তাই খেয়ে কাটিয়ে দেওয়া গেল। ধর্ম্মশালায় রাঁধবার এবং পাইখানা ও স্নানের সুবিধা নয় (বিশেষতঃ বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের) ব'লে, পরদিন সকালেই খালসা হোটেলে যাবার মনস্থ ক'রে, লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়া গেল। (উপরে আমাদের ঘরের পাশে একটা পাইখানা ছিল, কিন্তু অতি জঘন্য)

শ্রীনগর সমুদ্র-পৃষ্ঠ হ'তে ৫২৫০ ফিট উচ্চ। জম্বু, লাডাক, বাল্‌টিস্থান এবং গিলগিট্ এই ক'টি প্রদেশই কাশ্মীরের অন্তঃর্গত। এ গুলি লইয়াই বর্ত্তমান কাশ্মীর রাজ্য। ভারতের সমস্ত রাজ্যের মধ্যে ইহার আয়তন বৃহৎ। ইহার পরিমাণ প্রায় ৮৪০০০ হাজার বর্গ মাইল। বঙ্গদেশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ। ইহার লোক সংখ্যা প্রায় ৩৩০০০০০ লক্ষ, তন্মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। কাশ্মীর রাজ্যের উত্তরে চীন, তুরকীস্থান, দক্ষিণে পাঞ্জাব, পূর্ব্বে তিব্বত ও পশ্চিমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। চতুর্দ্দিকে বিশাল হিমানী-শোভিত পর্ব্বতমালার মধ্যে চুরাশি মাইল দৈর্ঘ্য ও চব্বিশ মাইল পরিসর উপত্যকা ভূমিকে ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর বলে,—শ্রীনগর এরই মধ্যস্থলে অবস্থিত। সাধারণতঃ এর উত্তরে নাঙ্গা পর্ব্বত ও উত্তর-পূর্ব্ব কোণে হরমুখ শৃঙ্গ বা কৈলাশ পিক্, পূর্ব্বে কোলহাই বা কারাকোরম পর্ব্বতশ্রেণী, দক্ষিণে মহাদেও পর্ব্বত, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পীরপঞ্জাল পর্ব্বতশ্রেণী, এবং পশ্চিম দিকে সিন্ধু উপত্যকার গিরিশ্রেণী ইহাকে ঘিরে রেখেছে। পীরপঞ্জাল পর্ব্বত কাশ্মীর ও জম্বুর মধ্যে অবস্থিত।

বর্ত্তমানে সহরের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। ইহার মধ্যে ছ'আনা রকম হিন্দু, কিন্তু তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ। এখানকার আদিম

অধিকাংশ ব্রাহ্মণদের উপাধি পণ্ডিত। মুষ্টিমেয় শিখ, ডোগরা ও অন্য জাতি। তদ্ব্যতীত বাকি সমস্তই মুসলমান। কাশ্মীরবাসী ব্রাহ্মণদের আচার অন্যরূপ। তাঁহারা মাংস ভক্ষণ করেন, মুসলমানের আনীত পানীয় জল গ্রহণ করেন এবং বস্ত্র পরিবর্ত্তন না ক'রে আহার করেন। এখানে অনেকগুলি ভাষার প্রচলন আছে, যথা—ডোগ্রী, চিবালী, পাঞ্জাবী, উর্দ্দু ও কাশ্মিরী। কাশ্মিরী ভাষা অনেকটা সংস্কৃত ভাষার ন্যায়।

কাশ্মীর সৌন্দর্য্যের লীলা নিকেতন। ইহা আয়তনে ক্ষুদ্র হ'লেও শুধু ভারতের কেন, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশ ব'লে পরিগণিত; এমন কি সুইজারল্যাণ্ড ও গ্রীস দেশের সহিত তুলনা ক'রে, ঐ দুই দেশ অপেক্ষা কাশ্মীরকে অধিকতর সুন্দর ব'লে অনেকেই মত প্রকাশ ক'রেছেন। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পত্র-পল্লব ও নানাবিধ বিচিত্র বর্ণের পুষ্পরাজিতে, ইহাকে নন্দন কানন সদৃশ এক অপরূপ মনোহর উদ্যান সৃষ্টি ক'রে রাখে। শীতের তুষারপাতে সমস্ত দেশ শ্বেতবর্ণ ও বৃক্ষসকল পল্লবহীন হয়, এবং বসন্তে, নব অঙ্কুরিত বিচিত্র বর্ণ তৃণগুল্মে, সমস্ত পর্ব্বতগাত্র ও উপত্যকা-ভূমি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে দুষ্প্রাপ্য বিবিধ বিচিত্র বর্ণের বহুবিধ পত্র-পুষ্পে সুশোভিত ও নানাবর্ণে রঞ্জিত হ'য়ে উঠে, এবং নানা রকম বিহঙ্গের কল-কুজনে সমগ্র দেশকে মুখরিত করে রাখে। পর্ব্বত-নিঃসৃতা রজত-ধারা বিতস্তা, সৌগন্ধে ও শোভায় চন্দন-তরু স্বরূপ মনোহর শ্রীনগরকে কাল ভুজঙ্গিনীর ন্যায় বেষ্টন ক'রে, বা সুন্দর শ্রীনগরের বরাঙ্গে ফুলমালার মত শোভা বিস্তার ক'রে, রূপের লহরী লীলা ছড়িয়ে দিয়ে আনন্দে কল কল স্বরে নিম্নাভিমুখে ছুটে চলেছে।

প্রাচীন ইতিহাস

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এই উপত্যকা এক সময়ে প্রাকৃতিক নিয়মে চতুর্দ্দিক পর্ব্বত-বেষ্টিত প্রকাণ্ড একটী হ্রদ ছিল। কাশ্মীর রাজ-তরঙ্গিণীতে উল্লেখ আছে—পূর্ব্বকালে ব্রহ্মার পৌত্র ও মরিচীর পুত্র কশ্যপ বরাহমূল (বর্ত্তমান বারমূলা) নামক স্থানে পর্ব্বতের একাংশ কেটে ঐ হ্রদের জল নিঃসারণ করে দেন। কিছুকাল পরে ঐ স্থান শুষ্ক হ'য়ে যায় ও ক্রমশঃ উচ্চ হ'য়ে উঠে। তখন উহা বাসোপযোগী বিবেচিত হওয়ায় কশ্যপমুনি কতকগুলি ব্রাহ্মণকে এনে ঐ স্থানে বসবাস করান। কশ্যপমুনির প্রতিষ্ঠিত নগর ব'লে ঐ প্রদেশের কশ্যপপুর নাম হয়। 'পৃথিবীর ইতিহাস'-লেখক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ীর মতে কশ্যপীর নামের অপভ্রংশ কাশ্মীর।

কেহ কেহ বলেন যে গান্ধারী ঘাস ও দরদী নামক জাতিগুলি নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস ক'রতো, সেই ঘাস জাতি হ'তে ঘাশ্মীর বা কাশ্মীর নামের উৎপত্তি। কাশ্মীরা ও দরদা জাতি উত্তর ভারতের ক্ষত্রিয় জাতি ব'লে মহাভারতে উল্লেখ আছে।

অতি প্রাচীন কালে কাশ্মীরে হিন্দু নরপতিগণ রাজত্ব ক'রতেন। পরে বৌদ্ধরাজগণ ইহার শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। মৌর্য্য সম্রাট অশোকের সময়ে খৃঃ পূঃ ২৪৫ সনে কাশ্মীর এবং গান্ধার প্রদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচারক প্রেরিত হয়। অশোকের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ ক'রলেও পরে কুশন নরপতি হবিস্ক, যাস্ক ও কণিষ্কের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত হ'য়ে কয়েক শতাব্দী ধ'রে এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম যুগপৎ প্রচলিত ছিল। দশম ও পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে কাশ্মীরের হিন্দুমন্দির প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

এতদ্ব্যতীত এ দেশে নাগ জাতির বসতি এবং নাগোপাসনা প্রচলিত থাকা দৃষ্ট হয়, কারণ আকবরের সময়ে তাঁহার সভাপণ্ডিত আবুল ফজল এখানে শিবোপাসনার ৪৫টী, বিষ্ণু পূজার ৬৪টী, ব্রহ্মা পূজার ৩টী এবং দুর্গা পূজার ২২টী স্থান ভিন্ন, প্রস্তর-ফলকে খোদিত নাগ-মূর্ত্তি-পূজার প্রায় ৭০০শ' স্থান ছিল ব'লে উল্লেখ ক'রে গিয়েছেন।

১২৯৬ খৃষ্টাব্দের শেষে হিন্দুরাজা উদিয়ান দেবকে তাঁহার মুসলমান উজির আমির সাহা নিধন ক'রে সামসুদ্দিন নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন হ'তে কাশ্মীরে মুসলমান রাজত্বের আরম্ভ।

কহ্লণ পণ্ডিত রচিত 'রাজতরঙ্গিণী' সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতের একমাত্র প্রাচীন ইতিহাস। ইহাতে পুরাকাল হ'তে আরম্ভ ক'রে সংগ্রাম দেবের রাজত্ব কাল (খৃঃ ১০০৬) পর্য্যন্ত সময়ের বহু ঘটনাবলী সবিস্তারে বর্ণিত আছে। রাজতরঙ্গিণীর পর হ'তে আরম্ভ করে জৈনুল আবদ্দিনের রাজত্ব কাল (১৪১২) পর্য্যন্ত সময়ের এক খানি ইতিহাস জনরাজা প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের শেষ ভাগ হ'তে আরম্ভ ক'রে ফাসার রাজত্ব কাল (১৪৮৬) পর্য্যন্ত অপর এক খানি ইতিহাস পণ্ডিত শ্রীবর কর্ত্তৃক রচিত হয়। শেষোক্ত কাল হ'তে আরম্ভ ক'রে আকবর কর্ত্তৃক কাশ্মীর দেশ মোগল-রাজ্যভুক্ত হওয়া (১৫৮৮) সন পর্য্যন্ত সময়ের আর এক খানি গ্রন্থ প্রজ্ঞাভট্ট রচনা করেন। এই গ্রন্থ খানির নাম 'রাজাবলীপটক'।

১৫৮৮ অব্দে মোগল বাদসাহ আকবর কাশ্মীর আক্রমণ ক'রে, এই প্রদেশ স্বীয় রাজ্যভুক্ত ক'রে নেন। পরে ১৭৫৬ সনে, আলমগীরের সময়ে, আমেদ সা ডুরাণী কাশ্মীর প্রদেশ অধিকার করেন ও ১৮১৯ সন পর্য্যন্ত তাহা আফগানদিগের অধীন থাকে। শেষোক্ত সনে পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ আফগানদিগকে পরাস্ত ক'রে তাঁহার বিখ্যাত খালসা সেনানী পাঠান-ত্রাস হরি সিং নলুয়ার সাহায্যে কাশ্মীর শিখরাজ্য

ভুক্ত কবেন। ইঁহাব অধীনে গুলাব সিংহ নামক জনৈক ডোগ্‌বা বাজপুত সামান্য কর্ম্ম ক'ব্‌তেন। কর্ম্মে প্রভুকে সন্তুষ্ট ক'বে তিনি পুবস্কাব স্বরূপ জম্মু সহবটী লাভ কবেন। বণজিৎ সিংহেব মৃত্যুব পব সোব্রাওন যুদ্ধে ইংবাজেব হস্তে শিখগণেব পবাজয় হ'লে, উহাদেব মধ্যে যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহাতে গুলাব সিংহ বিস্তব পবিশ্রম কবেছিলেন। ১৮৪৬ সনে লাহোবে স্বাক্ষবিত ঐ সন্ধি পত্রেব সর্ত্তানুসাবে ইংবাজ গভর্ণমেণ্ট শিখগণেব নিকট দেড কোটী টাকা দাবী কবেন। কিন্তু খালসা দববাব ঐ টাকা দিতে অক্ষম হন এবং এক কোটী টাকাব পবিবর্ত্তে সিন্ধু ও বিয়াস (বিপাসা) নদীব মধ্যস্থিত দেশগুলি ইংবেজ গভর্ণমেণ্টকে প্রদান কবেন। কাশ্মীব ও হাজাবা প্রদেশ ইহাব অন্তর্ভুক্ত ছিল। পবে গুলাব সিংহ সেই এক কোটী টাকা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে প্রদান ক'ব্‌লে, তৎকালীন গভর্ণব জেনাবেল স্যাব হেন্‌বি হার্ডিং গুলাব সিংহকে কাশ্মীব বাজ্য ছেডে দেন এবং কাশ্মীব স্বাধীন বাজ্য ব'লে ঘোষণা কবেন। তদবধি কাশ্মীব ও জম্মু যুক্তবাজ্য ও মহাবাজা গুলাব সিংহ তাহাব অধিপতি ছিলেন। শ্রীনগব গ্রীষ্মকালে ও জম্ব শীতকালে তাঁহাব অবস্থানেব বাজধানী ছিল। মহাবাজা গুলাব সিংহ ১৮৫৭ অব্দে দেহত্যাগ ক'ব্‌লে তাঁহাব পুত্র মহাবাজা বণবীব সিংহ বাজা হন এবং তিনি ১৮৮৫ সন পর্য্যন্ত বাজত্ব কবেন।

মহাবাজা বণবীব সিংহেব মৃত্যুব পব মহাবাজা প্রতাপ সিংহ বাজা হন। তিনি বাজা হ'যে কাশ্মীব বাজ্যেব বহুতব উন্নতি সাধন কবেন এবং অনেক প্রকাব কব উঠিয়ে দিয়ে প্রজাদিগেব প্রভুত উপকাব কবেন। কিন্তু ইংবাজ গভর্ণমেণ্ট গিল্‌গিট গ্রাস কব্‌বাব জন্য নানারূপ ষড়যন্ত্র কবাতে এবং তাঁহাব ভ্রাতা অমব সিংহ গোপনে তাঁহাব বিরুদ্ধাচবণ কবাতে, তাঁহাকে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হ'তে হয়। 'অমৃত বাজার'

এই সম্বন্ধে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এক খানি চিঠি প্রকাশ করাতে মহা হুলুস্থূল ব্যাপার হয়, এবং সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। ১৯২৫ সনে মহারাজা প্রতাপ সিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর মহারাজা হরিসিংহ এই ভূ-স্বর্গ রাজ্যের রাজেন্দ্র।

কাশ্মীর ভূ স্বর্গ,—স্বর্গের সুষমারাশির কত খানি সৌন্দর্য্য বিকশিত হ'য়ে ভূ-স্বর্গনাম ধারণ ক'রেছে,—তাহা দেখ্‌বার আগ্রহে সকলে এখানে এসে থাকেন।

খালসা হোটেল ও দুর্গানাগ বা সারদা পীঠ

পরদিন ২২শে বৈশাখ, মঙ্গলবার, সকালে উঠে কোনও রকমে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নিয়ে, আমরা দু জনে ধর্ম্মশালা থেকে বেরুলাম। একটা টাঙ্গা ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া ক'রে (প্রথম ঘণ্টা বার আনা পরে আট আনা হিসাবে) প্রথমে খালসা হোটেল হ'তে সমস্ত সহর ঘুরিয়ে আনতে বলা হ'ল। আমরা প্রথমে খালসা হোটেলে গেলাম। হোটেলটী সহরের প্রধান রাস্তার উপর তিনতালা বাড়ী। ঝিলাম নদী ও তারই উপরিস্থ ১নং পুলের (আমিরাকদল) নিকট। নীচের তলায় নানাবিধ ছোট বড় দোকান। দোতলা ও তিন তলায় থাকবার অনেকগুলি ঘর। আমরা হোটেলের সাম্নে উপস্থিত হ'তেই হোটেলের কর্ম্মচারী, ঈশ্বর সিং নামক একটা পাঞ্জাবী শিখ যুবক, অতি যত্ন ক'রে হোটেলের উপরে নিয়ে গিয়ে সমস্ত খালি ঘরগুলি আমাদের দেখিয়ে দিল। দেখ্লাম ঘরগুলি সব পছন্দ-সই। ম্যাটিং করা,—দু'খানা ক্যাম্পখাট, তিনখানা চেয়ার, একখানা ইজি চেয়ার, একটা ড্রেসিং টেবিল ও একটা সাদা কাপড়-ঢাকা খাবার টেবিল। ঘরে বিজলী বাতি। সব ঘরই এক রকমের সাজান। তার ভিতর কতকগুলি ঘরের সঙ্গে স্নান কর্বার ঘর ও পাইখানা (কমোট দেওয়া) আছে। এইরূপ প্রতি ঘরের দৈনিক ভাড়া দু'টাকা। আর কতকগুলি ঘরের সঙ্গে স্নান কর্বার ঘর বা পাইখানা নাই, এই রকম প্রত্যেক ঘরের দৈনিক ভাড়া এক টাকা। কিন্তু এই রেটের কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, সময় বিশেষে দু'টাকার ঘর তিন টাকা ও এক টাকার ঘর দু'টাকা কিম্বা তদূর্দ্ধও হয়। যাহা হোক, আমরা

স্নান করবার ঘর সমেত, তিন তলার উপর ধারের একটা ঘর পছন্দ ক'রে, আমাদের জন্য খাবার তৈয়ার ক'রতে ব'লে, (পিঁয়াজ না দিয়া) পুনরায় টঙ্গায় এসে ব'সলাম।
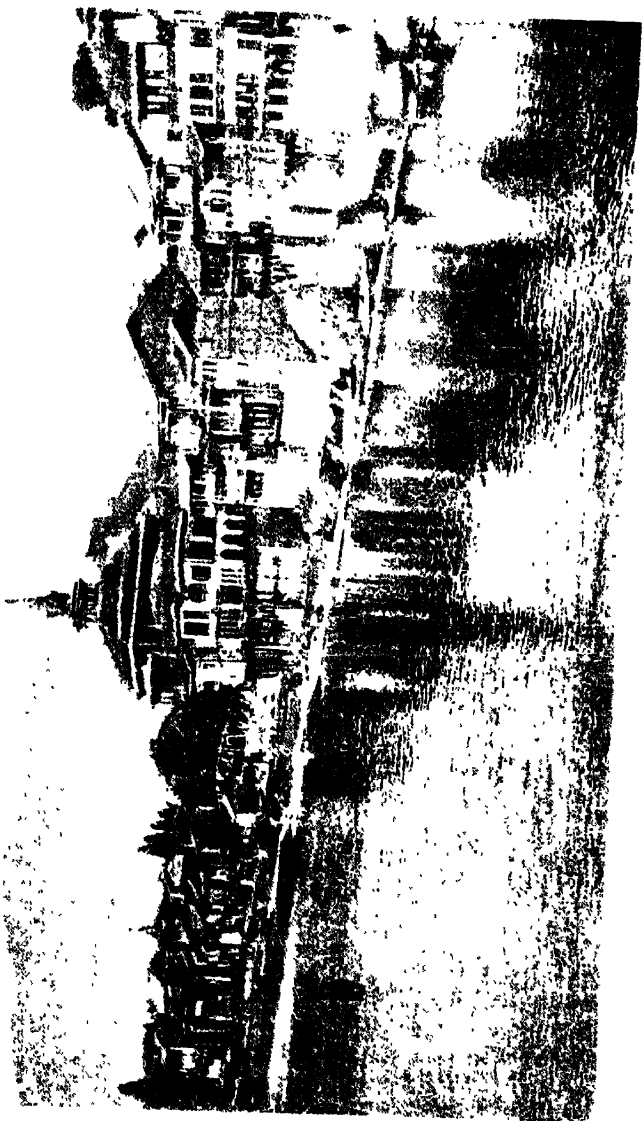
টঙ্গা সহরের নানাস্থান ঘুরে শঙ্কর পর্ব্বতের নীচে দুর্গানাগের নিকট এসে দাঁড়ালো। এখানে আমরা টঙ্গা হ'তে নেমে তীরের ফলার মত একটু ভূখণ্ডের পাশ দিয়ে মোড় ঘুরে দুর্গানাগে ৺শারদা দেবীর দর্শনে চ'ললাম। পথের বামে একজন গৈরিকধারী, মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসীর দর্শন হ'ল, ইনিই এখন এই বিদ্যাপীঠের একাদশ শঙ্কর। এখান থেকে দুর্গানাগের কাঠের ঘরগুলি দেখা যায়। এই সন্ন্যাসী বিনা বাক্যব্যয়ে আমাদের আগে আগে একটা ছোট গেটের মধ্য দিয়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রলেন। আমরা তাঁর অনুগামী হ'লেম। গেটের সম্মুখেই টানা বারাণ্ডাওয়ালা দু'চার খানি কাঠের ঘর। দক্ষিণে একটু বাগিচা, বামেও আর একটা ছোট ফুলের বাগিচা। বাগানের প্রবেশ-পথে একটা গেট। এখানে সাইনবোর্ডে লেখা আছে—"এই খানে জুতা খুলতে হ'বে।" আমরা জুতা মোজা খুলে ফেললাম। সম্মুখের বারাণ্ডায় চার পাঁচ জন সন্ন্যাসী পাঠ-নিরত র'য়েছেন দেখলাম। আমরা সেই দিকেই অগ্রসর হ'লাম, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী বাম দিকের বাগান টুকুর ওপারে একটা সুন্দর কাঠের কাশ্মিরী বারাণ্ডা হ'তে আমাদের ডাকলেন। বাগানটা ছোট্ট, কিন্তু নানাজাতীয় ফুটন্ত পুষ্পের সৌরভে আমোদিত ক'রে রেখেছে,—গোলাপই বেশী। মনোরম এবং পবিত্র স্থান। সমস্তই পর্ব্বতের গায়ে, অসমতল ভূমির উপর। কিন্তু এখানে দাঁড়ালে কিছুই বুঝা যায় না। বাগানের পরই পাহাড়। এই খানে এলে বুঝা যায় যে, আমরা অনেকটা উপরে উঠে এসেছি। আমরা এই বারাণ্ডায় উঠলাম। বারাণ্ডাটী গোল এবং প্রশস্ত। উহা একটী

পায়ের জোতা খোলা বাক্সের মধ্যে রেখে যাচ্ছে। সমস্ত বারাণ্ডা ঝাঁৎলা-বিছান ম্যাটিং করা। সন্ন্যাসী আমাদের ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। ঘরের অর্দ্ধেকটা একটা গুহার মধ্যে স্থিত। এই অর্দ্ধেক অংশে দেবী সারদা মন্দির। কি সুন্দর মনোহর প্রতিমা—দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার মত, রূপার জ্যোতির্ম্ময়ী বাকবাদিনী সারদা প্রতিমা। অষ্টালঙ্কারে ভূষিতা, শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, পুষ্পভূষণা মুক্তধারিণী মূর্ত্তি। ভিতর অন্ধকার। দেবীর মাথার উপর ও দুই পার্শ্বে বিজলী বাতি জ্বলছে। বাতি দেখা যায় না,—শেডে ঢাকা। জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি গুহা আলোকিত ক'রে সিংহাসনে উপবিষ্টা। মায়ের মূর্ত্তি কাচের কপাট দিয়ে ঘেরা। অন্ধকার গুহা পবিত্র ধূপ-গন্ধে এবং পুষ্পসারে সুরভিত। মূর্ত্তির সম্মুখে বেদী—বেদীর উপর রূপার পুষ্পপাত্র প্রভৃতি সযত্নে সজ্জিত। মায়ের চরণতলে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের আলোকচিত্র, এবং নবম শঙ্করের মধ্যে কাহারও কাহারও আলেখ্য সযত্নে রক্ষিত। এই সিংহাসনাধিষ্ঠিত দেবী-মূর্ত্তির সম্মুখে জোড় ক'রে নত জানু হ'য়ে প্রাণের বেদনা জানালেম। এই জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রতিমালোক সুদূর দাক্ষিণাত্যে পতিত হ'য়ে, সেই বৌদ্ধ যুগের শঙ্করাবতার সন্ন্যাসী শঙ্করকে কর্ম্মক্ষেত্রে এই স্থানে টেনে এনেছিল। এই স্থানে কত মহা মহা পণ্ডিতগণ বাকবাদিনীর সেবায় জীবন উৎসর্গ ক'রেছিলেন। এই সারদাপীঠ, জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়ে জয়ী হ'য়ে আপনাকে এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত ক'রে গিয়েছেন।

খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে এই স্থানে সারদা পীঠ অর্থাৎ যে কোন অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা সারদা দেবীর গৃহে সর্ব্বজ্ঞ পীঠ বিদ্যমান ছিল। সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত সেই গৃহে কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। শঙ্কর বিজয় বা শঙ্করাচার্য্য-চরিত পাঠে জানা যায় যে,—যে সময় শঙ্কর ঐ পীঠ জয় করবার মানসে এ স্থানে আগমন ক'রেছিলেন, ঐ সময় কাশ্মীর ভাষা-শিক্ষার প্রধানতম

স্থান ছিল। সর্ব্বদেশীয় সুধীগণ বিদ্যাশিক্ষার্থে কাশ্মীরে আগমন ক'রতেন। প্রাচ্য, প্রতীচ্য ও উদীচ্য প্রভৃতি বহু পণ্ডিতগণ সারদা পীঠে দেবার মন্দিররক্ষা ক'রতেন। তাঁহারা সকলেই দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে দিগ্বিজয়ী শঙ্করের নিকট বিচারে পরাভব স্বীকার ক'রেছিলেন। কণাদ, গৌতম, সাংখ্য, বৌদ্ধ, জৈন, দিগম্বর, নৈয়ায়িক, দার্শনিক, নাস্তিক ও বৈদান্তিক প্রভৃতি বহু মতাবলম্বী সর্ব্বজ্ঞ মহাপণ্ডিতগণকে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য দেব, পরাভূত ক'রে দেবী সারদা মাতার দৈববাণীর কথায়, সর্ব্ব সমক্ষে 'সর্ব্বজ্ঞ' প্রমাণিত হ'য়ে বিদ্যাপীঠে উপবেশনের অধিকার লাভ ক'রেছিলেন।

মা জ্যোতির্ম্ময়ি! তোমার দর্শনে হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় মা! জ্ঞানময়ী জননি আমার কি কিছুই লভ্য নয়? আকুল প্রাণে একবার মাকে ডাকবার চেষ্টা ক'রলাম, কিন্তু কৈ? প্রাণ শুষ্ক—সে ভাব কোথা কই? যে ভাব—মাকে আমার হৃদয়ে এনে দেবে। সে নির্ঝরিণী শুকিয়ে গেছে—অথবা এই একেশ্বরবাদী শৈব-মন্দিরে, সে ভাব বুঝি কাহারও থাকে না। মা আনন্দময়ি, আমার হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে গেছে মা! মা, আমার হৃদয় জুড়ে বাস করো। পরে মাকে প্রণাম ক'রে যথাশক্তি প্রণামী দিয়ে, মায়ের প্রসাদী ফুল কিস্‌মিস্ ও মিছরি গ্রহণ ক'রে বাহির হ'লাম। নীচে অঙ্গনে দুর্গানাগ কুণ্ড—একটী ঘরের মত চত্বর গাঁথা রেলিং দিয়া ঘেরা। আমরা সোপান দিয়ে অবতরণ ক'রলাম। ইহার তলে ছোট বড় দু'টী কুণ্ড, তলা পর্য্যন্ত গাঁথা রয়েছে,—পাশে একটী ছোট ঘর। প্রথম কুণ্ডে তলা হ'তে জল আপনি উঠ্‌ছে। ৺দুর্গার অংশ রূপিণী মহাসর্প ইহাতে বাস ক'রতো, এখন নাই, চ'লে গেছে। মাঝে কাটা পথ দিয়ে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত কুণ্ডে জল আস্‌ছে। এই কুণ্ডটী পাঁচ ছ'হাত গভীর। জল অতি স্বচ্ছ,—চেয়ে দেখ্‌লাম—তলা

পর্য্যন্ত লক্ষ্য হ'চ্ছে। তিন দিকে থাকে থাকে গাঁথা ধাপ। এখানে ৺ সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য স্নান ক'র্‌তেন। এই জল স্পর্শ ক'র্‌লাম। এখান থেকে জল বার হ'য়ে ছোট ঘরের মধ্য দিয়ে নিম্নে চ'লে যাচ্ছে। এরই নাম দুর্গানাগ। স্থানটী অতিশয় পবিত্র ও পুণ্যময়।

সন্ন্যাসী আমাদের ব'ল্‌লেন, পর্ব্বতের উপরে গিয়েছিলেন? পর্ব্বতের চূড়ায় আদি পীঠ। সেখানে ৺ শিবজীর ভারি মন্দির আছে। আমরা তা জানতাম না, তাঁর কাছে সব জেনে নিলাম। তিনি ব'ল্‌লেন, 'আজ বেলা হ'য়েছে, উপরে উঠ্‌তে রৌদ্রে কষ্ট হবে। আর একদিন সকালে দর্শন ক'রে আস্‌বেন।' বলা বাহুল্য যে, এ সকল ভাষা বাঙ্গলা নহে। আমরা সন্ন্যাসীর আদেশ গ্রহণ ক'রে—তাঁকে প্রণাম ক'রে বিদায় হ'লেম।

এখান হ'তে ধর্ম্মশালায় গিয়ে আমাদের জিনিষপত্র গুলি নিয়ে, সাড়ে এগারটার সময় হোটেলে উপস্থিত হ'লাম, পরে স্নান ও আহারাদি ক'রে বিশ্রাম করা গেল। হিন্দুর মেয়ে হোটেলে আহার,—কেমন বিঘ্ন হ'তে লাগ্‌ল। এখানে হোটেলে খাওয়ার একটু পরিচয় দিই,—বাসমতী (খুব সরু লম্বা লম্বা সীতাভোগ মিঠাইয়ের দানার মত ভাত হয়, গন্ধ অতিশয় সুন্দর এবং বহুদূর ব্যাপী) আতপ চাউলের ভাত, ডাল ও দু'টা নিরামিষ তরকারী, প্রতি জনের আট আনা। রাত্রে ফুল্‌কা অর্থাৎ রুটী ও সকালের মত তরকারী, মূল্য প্রতি জনের ছ'আনা। মাছ, মাংস, ডিম কিম্বা অন্য কোনও জিনিষের পৃথক পৃথক দাম—চার আনা ও ছ' আনা প্রতি ডিস্‌ (চায়ের ডিস্‌)। চা, দুধ, পাঁউরুটী, মাখম প্রভৃতিরও এইরূপ,—চা প্রতি কাপ ছ'পয়সা, এক সেট্‌ ছ' আনা। টোষ্ট এক খানা দু'পয়সা, মাখম এক ডেলা (এক ছটাক) তিন আনা, দুধ এক কাপ এক আনা, মামলেট দু'আনা ও কাশ্মীরী পোলাও বার

আনা ডিস্। এই হ'ল খালসা হোটেলের মোটামুটি দর। এই হোটেলের ম্যানেজার জাতিতে পাঞ্জাবী খালসা। ইনি অতিশয় ভদ্রলোক ও বিনয়ী। প্রত্যেক লোকের সুবিধা অসুবিধার উপর লক্ষ্য রাখেন। কাহারও কোনও বিষয়ে অসুবিধা হ'লে, তৎক্ষণাৎ তাহা দূর করবার চেষ্টা করেন। কর্মচারীগুলিও অতি ভদ্র ও সৎ, অতিথির সকল হুকুমই তামিল করে। এই খালসা হোটেল ভিন্ন এখানে আরও দু'টী হোটেল আছে। তাদের দরও কম, কিন্তু থাকবার বা খাবার ব্যবস্থা তত সুবিধাজনক নয়। একটীর নাম 'পঞ্জাব হিন্দু-হোটেল', অপরটির নাম 'কাশ্মীর হিন্দু হোটেল'। শেষোক্ত হোটেলটী ঘাটের উপর।

সিকারা

বিকালের দিকে শরীরটা ভাল বোধ হ'ল না, তবু বেড়াতে বেরুলাম। হোটেলের নিকটেই ১ নং পুল আমিরাকদলের কাছে যেতেই সিকারা ওয়ালা (নৌকাওয়ালা) প্রস্তাব ক'রলে। ঝিলম্ বক্ষে নৌ-বিহার,—কান্ত সঙ্গেই আছেন,—কল্পনা মন্দ নয়, কিন্তু—এ কিন্তুর উত্তর কে দেবে? সিকারায় উঠলাম। নৌকায় ব'সে হৃদয়ের কূল ছাপিয়ে চোখে জল এলো। পাশেই ব'সেছিলেন, এ জল রোধ ক'রে ফেল্লেম। শুনে ছিলাম,—রমণী পতির কোলে পুত্রশোক ভুলে যায়। এত দিন তা অনুভব করি নাই। আজ এই আত্মীয়-পরিশূন্য সুদূর পর্ব্বতের উপর নদীবক্ষে, তাঁর আদরে যেন এই বাক্যের সার্থকতা অনুভব হ'ল। কিছু শান্তি হ'ল—কিন্তু আনন্দ অনুভব ক'রতে পারলাম না। হায় আমাদের আনন্দ!—আমাদের শান্তি কোথাও নাই।

এই সিকারা অর্থাৎ নৌকা—লম্বা ১৩।১৪ হাত, চওড়া ২ হাত ২॥০ হাত। তলার গঠন গোল নয় চ্যাপ্টা—শীতকালে জলের উপর বরফ পতিত হ'লে, বরফের উপর দিয়ে চালনা করবার জন্যই গঠনের এমন তাৎপর্য্য। ইহার মধ্যস্থলে সরু সরু চারটা খুঁটির উপর সুন্দর ছাউনি। এই ছাউনির ভিতর বসবার জায়গা। তার উপর হাতের সুন্দর নক্সা-তোলা কুশন দিয়ে সাজান এবং উপরে ছাউনির গায়ে রকমারী কাপড়ের ঝিলমিলি ঝালরের মত ক'রে সাজান। দু' পাশে হাতের কাজ তোলা চার খানা পরদা। এই কুশন ও পরদাগুলি সিল্কেরও হয়, তবে সাধারণতঃ সূতির উহা খুব পরিষ্কার—দেখতে বড় সুন্দর। ছোট ছোট হরতনের টেক্কার মত। দাঁড় বেয়ে, এই নৌকা চালনা করা হয়।

ঝিলমের পুল

ঝিলম নদীতে সাতটী সেতু বিখ্যাত। সেতুগুলির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম; যথা,—১ নং সেতু—আমিরা কদল, ২ নং—হাবা কদল, ৩ নং—ফতে কদল, ৪ নং—যানা কদল, ৫ নং—আলি কদল, ৬ নং—নওয়া কদল এবং ৭ নং—সাফা কদল। বলা বাহুল্য কাশ্মীরী ভাষায় সেতুকে কদল বলে। এই পুলগুলির মধ্যে আমিরা কদল অর্থাৎ প্রথম পুলই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ও দেখ্‌তে সুন্দর। এই পুল বেশ প্রশস্ত, এর উপর, দু'ধারে লোক চলাচলের এবং মাঝখান দিয়ে মোটর, টঙ্গা প্রভৃতি গাড়ী যাতায়াতের জন্য পথ নির্দ্দিষ্ট আছে এবং নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়ে যাতে লোক চলাচল করে, সেজন্য পুলের ধারে সর্ব্বদা পুলিস প্রহরী মোতায়েন আছে। কলকাতার হাওড়ার পুলের মত,—তবে অত বড় না। অপর ছ'টী পুলের উপর দিয়াও গাড়ী যাতায়াত করে, তবে সেগুলি এত প্রশস্ত নয়।

এই সেতুগুলি ছাড়া ঝিলম নদীর অনেক শাখা ও প্রশাখার উপর আরও অনেক সেতু আছে, তা'দের বিশেষ কোনও নাম নাই। সেতুগুলি লৌহ-সংস্পর্শ শূন্য; কাঠ ও পাথরের খিলানের উপর—কাঠের সেতু। শ্রীনগরের প্রায় সর্ব্বত্রই লোহার পরিবর্ত্তে কাঠ ব্যবহৃত হ'য়েছে—মায় বাড়ী থেকে—আলোর স্তম্ভ ও টেলিগ্রাফের স্তম্ভ পর্য্যন্ত।

মহারাজার প্যালেস্

আমিরা কদলের অনতিদূরে উত্তরদিকে মহারাজার প্যালেস্ ঝিলমের গর্ভ হ'তে উঠেছে। বহু দূর থেকে ঝিলমের কিনারা পাথর দিয়ে গেঁথে রেলিং দিয়ে ঘেরা হ'য়েছে। তার উপর ক্রমানুক্রমিক ক্রমে রাজ-পুরুষগণের সাত আটটী প্রাসাদ আছে। নদীর দিকে গোল গোল থাম ওয়ালা প্রশস্ত দীর্ঘ বারাণ্ডা, নানা রকম কারুকার্য্যময় খিলান এবং বিচিত্র পেন্টিং শোভিত সিলিং দেখ্‌তে পাওয়া যায়। নৌকা থেকে রাজবাড়ীর দৃশ্য অতি মনোরম—ঠিক একখানি ছবির মত। বর্ত্তমান মহারাজা এখানে থাকেন না, শঙ্করাচার্য্য পর্ব্বতের নিকট গুপকার পর্ব্বতের উপর নূতন প্রাসাদে অবস্থান করেন। রাজ-পরিবারস্থ অন্যান্য সকলে এই পুরাতন প্রাসাদে বাস করেন। নদীর কিনারায় রাজবাড়ীর সংলগ্ন স্বর্ণমণ্ডিত রঘুনাথজীর মন্দির দেখা যাচ্চে। এ কূলে ওকূলে আরও কতকগুলি দেব-মন্দির,—এর মধ্যে রৌপ্যমণ্ডিতও আছে। আমিরা কদলের দক্ষিণে কিছু দূরে ঝিলমের পশ্চিম তীরে মহারাজা প্রতাপসিংহের স্থাপিত মিউজিয়ম, অপর তীরে ঝিলমের সুন্দর রেলিং দেওয়া বাঁধ দেখা যাচ্ছে।

আমরা প্রায় তিন ঘণ্টা সিকারায় বেড়িয়ে, সন্ধ্যার সময় হোটেলে ফিরে এলেম। শরীর বড় খারাপ বোধ হ'তে লাগ্‌ল। সে রাত্রে আর কিছুই আহার ক'র্‌লাম না। দু' বার ভেদ হ'ল, সঙ্গের হোমিও-প্যাথিক ঔষধগুলি পথে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। আগ্নেয় ভস্ম ছিল, তাই দু'বার খেয়ে ঘুমালাম্। কখন্ যে উনি আহারাদি ক'রেছিলেন, কিছুই জান্‌তে পারি নাই।
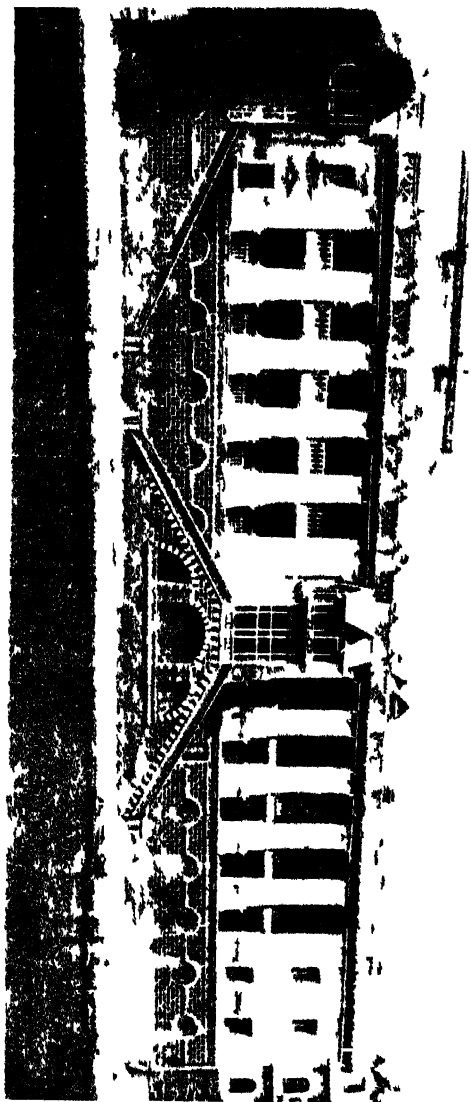
কাশ্মীরী চিকিৎসা

পরদিন ২৩শে বৈশাখ, বুধবার ভোর থেকে খুব ভেদ হ'তে আরম্ভ হ'ল। পাঁচ ছ' বার ভেদ হ'ল। অতিশয় দুর্ব্বল বোধ ক'রতে লাগ্‌লাম। উনি আর নিশ্চিন্ত থাকতে না পেরে হোটেলের ম্যানেজারকে ডাক্তারের কথা ব'ল্‌লেন। ম্যানেজার ডাক্তার আনিয়ে দিলেন। নাম এস. কে. আত্রী, এম. বি, বি, এস্। ডাক্তার ভাল, ফি তিন টাকা। আমাকে ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে প্রেসক্রিপ্‌সন্ লিখ্‌লেন। পথ্যের ব্যবস্থা ক'রলেন—দুগ্ধ সংযোগে কড়া চা অথবা গরম দুধ ও আতপ চালের খিঁচুড়ী। উত্তম ব্যবস্থা, উনি পথ্যের সম্বন্ধে একটু কিন্তু করাতে ডাক্তার ব'ললেন,—'এ সব এখানে না খেলে বাঙ্গালা দেশের রক্ত আমাশয় হবে এবং তখন রোগ কঠিন হ'য়ে দাঁড়াবে।' শুনেই তো আমার চক্ষু স্থির। ডাক্তার চ'লে গেলেন। এই পথ্য দেওয়া যায় কিনা, উনি ভাব্‌তে লাগলেন। শেষে বিদেশে ডাক্তারের মতে চলা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা ক'রে, ভয়ে ভয়ে চা ও দুধ পান ক'রলাম্। বিকাল চারটার সময় খিঁচুড়ী এল। উত্তপ্ত খিঁচুড়ী—কাঁচা মুগের ডাল, বাসমতী চাল, লবণ ও উপযুক্ত পরিমাণ ঘৃত সংযোগে সুসিদ্ধ—ইহাই খিঁচুড়ী; ভয়ে ভয়ে সাত আট চাম্‌চে গলাধঃকরণ ক'রলাম। আমি আর সে দিন উঠ্‌তে পারলাম না, উনি একাই সহর ঘুরে এলেন। এই ভাবে সেদিন কেটে গেল। বলা বাহুল্য, আমার অসুখ কিন্তু সেরে গেল। রাত্রে আর কিছুই খেলেম না। পরদিন সকাল পর্য্যন্ত ঔষধ খেতে হ'য়েছিল।

বন্ধু লাভ

পরদিন ২৪শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার, সকালে শরীর বড় দুর্ব্বল বোধ হ'তে লাগল। কিন্তু পেটের কোনও গোলমাল ছিল না, যাহা হোক, যথারীতি আহারাদি ক'রে বিশ্রাম করা গেল। পরে শরীর একটু সুস্থ হ'লে দু'জনে বেরুলাম। নিকটে শ্রীনগরের বিখ্যাত রেশমের কারখানা,—তা দেখ্‌তে যাবার ইচ্ছা হ'ল। একটা টঙ্গা ভাড়া ক'রে দু'জনে সেখানে গেলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেখা হ'ল না, কারণ রেশমের কারখানা সপ্তাহে তিন দিন সাধারণের দেখ্‌বার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। সে তিন দিন—সোমবার, বুধবার ও শনিবার; এবং দেখ্‌তে হ'লে তিন দিন পূর্ব্বে রাজ-সরকারে দরখাস্ত ক'রে পাস নিতে হয়। আমরা নূতন—এ নিয়মের কিছুই জানতেম না, সুতরাং ভগ্ন-মনোরথ হ'য়ে ফিরে আস্‌তে হল। কিন্তু অন্য দিকে লাভ হ'ল যথেষ্ট। রেশমের কারখানার গেটে যে সরকারি আফিস আছে, সেখানে দু'তিন জন রাজ-কর্ম্মচারী কাজ করেন, তাঁদের মধ্যে এক জনের সঙ্গে ওঁর কথায় কথায় আলাপ হওয়ায়, তিনি আমাদের নূতন দেখে দয়াপরবশ হ'য়ে কাশ্মীরের মোটামুটি সেখানে যা দেখ্‌বার আছে তা' দেখাতে প্রতিশ্রুত হলেন এবং আমাদের হোটেলের নাম ও রুম নম্বর লিখে নিলেন। লোকটী অতিশয় ভদ্র ও বড় সজ্জন। নাম পণ্ডিত শিবজি সারাফ, জাতিতে ব্রাহ্মণ। ইনি রেশমের কারখানার সাব্‌ইনেস্‌পেক্‌টার।

ফের্‌বার সময় পথে খুব বৃষ্টি এল। জামা কাপড় কতক কতক ভিজে গেল। আমরা হোটেলে ফিরে এলেম। হোটেল থেকে রেশমের কারখানা যাওয়া-আসার টঙ্গা ভাড়া আট আনা। বৃষ্টির জন্য সে দিন

আর কোথাও বেরুলাম না। বিকালে পণ্ডিত শিবজি—হোটেলে আমাদের ঘরে এলেন। তাঁর সঙ্গে ওঁর অনেক কথা হ'ল। শেষে স্থির হ'ল, পরদিন বেলা এগারটার সময় পণ্ডিতজী এসে আমাদের সঙ্গে ক'রে চশমা সাহী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও অন্যান্য জায়গায় নিয়ে যাবেন। সেই দিন মহারাজার, তাঁর রাজধানী শ্রীনগরে আসবার কথা ছিল। বিকালের দিকে পণ্ডিতজী মহারাজার আগমন-উৎসব দেখাতে আমাদের নিয়ে যাবেন, এইরূপ স্থির ক'রে তিনি চ'লে গেলেন।

রাত্রে যথাসময়ে আমরা আহারাদি সেরে নিলাম এবং স্থির ক'রলাম যে, পরদিন সকালে প্রথমে শঙ্কর পর্ব্বতের উপরে উঠে, দেবদর্শন ক'রে আসব, পরে এগারটার পূর্ব্বে আহারাদি ক'রে পণ্ডিতজীর সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হওয়া যাবে। পরে সে দিনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ ক'রে শয়ন করা গেল।

শঙ্করাচার্য্য পর্ব্বত

২৫শে বৈশাখ, শুক্রবার সকাল সাতটার সময় ৺শঙ্করজীর দর্শনে বাহির হওয়া গেল। শঙ্করজীর মন্দির শঙ্করাচার্য্য পর্ব্বতের উপর। ঐ পর্ব্বত হোটেল থেকে দেড় মাইল দূরে পূর্ব্বদিকে। পথে—প্রতাপ বাগ, মহারাজার পোলো গ্রাউণ্ড, কাশ্মীরজাত শিল্পের শাল, কম্বল, কুশন, চামড়ার ও বেতের নানারকম চেয়ার, টেবিল, বাক্স, সাজি ও অন্যান্য বহুবিধ দ্রব্যের বহু দোকান দেখ্‌তে দেখ্‌তে অগ্রসর হ'লেম। বলা বাহুল্য আমরা টঙ্গায় গিয়েছিলাম। পথের ধারে আখরোট গাছ, চেনার গাছ, কাশ্মীর জাত নিমফুলের গাছ, এবং তুঁত ফলের গাছ,—আমাদের দেশের বট, লিচু ও পেয়ারা গাছের মত শোভা পাচ্ছে। তুঁত ফলগুলি পিপুলের মত দেখ্‌তে, কিন্তু বর্ণ সবুজ এবং অতিশয় নরম—মধুর মত মিষ্ট। শ্রীনগরের প্রধান রাস্তাগুলি পিচের, এবং প্রশস্ত ও পরিষ্কার। ফুটপাথগুলি সরু। বাজারের ভিতরের রাস্তাগুলি প্রশস্ত কিন্তু পিচের নয়। দোকানগুলি দেড় হাত দু'হাত উচ্চে অবস্থিত, অধিকাংশ দোকানে কাঠের ধাপ লাগান আছে। এখানে পৃথক হাট বাজার নাই, দোকানেই সব পাওয়া যায়। এখানকার মামুলি বাড়ীগুলি প্রায় সবই কাঠের দোতলা। ছাদগুলি গড়ানে দো-চালার মত, উপরে মাটী পুরু ক'রে জমাট করা, তার উপর ঘাস এবং ফুলের গাছ দেওয়া। ফুল ফুট্‌লে অতি সুন্দর দেখায়। ঠিক ছবির মত।

ক্রমে আমরা শঙ্কর পর্ব্বতে উপস্থিত হ'লাম। পর্ব্বতের গা বাহিয়া ঘুরে ঘুরে রাস্তা উপরে উঠে গেছে। রাস্তা ভাল। পর্ব্বতের এই দিকে বহু মুসলমানের বাস। এই স্থান হ'তে অনেকদুর পর্য্যন্ত জায়গা নিয়ে
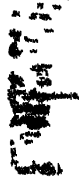
মুসলমানের কবর স্থান। ইহা পর্ব্বতের পাদদেশে। এই স্থানেই আমাদের গাড়ী থেকে নেমে পদব্রজে উপরে উঠ্‌তে হ'ল। কবরের মধ্য দিয়া পথ। উপরে ওঠ্‌বার অন্যদিকে অন্য পথও আছে। দেখ্‌লাম অনেক লোক উপরে উঠ্‌ছে, আমরাও তা'দের অনুসরণ করলাম। এই স্থান হ'তে কতকগুলি মুসলমান পাহাড়ী বালক-বালিকা আমাদের সঙ্গ নিলে। তারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গানের মত সুর ক'রে "বুয়া মুসা পুঁয়াসা" ও "আরেয়াঁই বুয়া মুসা পুঁয়াসা" ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে চ'ল্‌লো। অর্থ—আমাদের একটি পয়সা দাও। এরা উপরে ওঠে না,—মনে হ'ল এদের ওঠ্‌বার একটা নির্দ্দিষ্ট সীমানা আছে, কারণ এক স্থান পার হ'তেই ওরা নিবৃত্ত হ'ল, এবং ফের্‌বার মুখে ঐ স্থানে আস্‌তেই ওরা পুনরায় সঙ্গ নিয়েছিল। এই স্থান হ'তে উপরে ওঠ্‌বার রাস্তা বেশ ভাল,—কিন্তু খুব চড়াই; রাস্তার একদিকে উচ্চ পর্ব্বত অন্যদিকে গভীর খাদ। এ শৃঙ্গ হ'তে ও শৃঙ্গে পথ ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে। দাঁড়িয়ে নীচের দিকে দেখ্‌লে মাথা ঘুরে যায়। সাবধানে আমরা উপরে উঠ্‌তে লাগলাম। জায়গা জায়গা খুব খারাপ; একটু অসাবধান হ'লে প'ড়ে যাবার সম্ভাবনা। মেঘ যেন আমাদের সঙ্গে ছুটাছুটি খেলা ক'র্‌তে ক'র্‌তে চ'লেছে; অর্থাৎ ঐ সম্মুখের শৃঙ্গে মেঘ উঠ্‌ছে, আমরা এই টুকু ঘুর্‌লেই ঐ মেঘের রাজ্যে গিয়ে প'ড়ব, কিন্তু আমরা যেই গেলাম,—মেঘও সেখান থেকে স'রে অপর শৃঙ্গে খেলা ক'রতে লাগ্‌ল। আর তাহার পরিবর্ত্তে প্রভাত-রৌদ্র সেখানে এসে শৃঙ্গে শৃঙ্গে লাফালাফি আরম্ভ ক'রে দিলে। মেঘ ও রৌদ্রের এমন সমাবেশ, এই পর্ব্বত-রাজ্যে বড়ই সুন্দর। রৌদ্র যখন পর্ব্বত লঙ্ঘন ক'রে শ্রীনগরে এসে প'ড়ল, তখন উপর হ'তে শ্রীনগর একখানি প্রকাণ্ড পুষ্প-বাটিকার ন্যায় অঙ্কিত চিত্রের মত দেখাচ্ছিল। তার আগে, সমস্ত শ্রীনগর যেন রোরুদ্যমানা পরমা সুন্দরী তরুণীর ন্যায় বোধ হ'য়েছিল,—

রৌদ্রের সমাবেশে তার সেই অশ্রুসিক্ত মুখ খানায় যেন হাসি ফুটে উঠ্‌লো। কাশ্মীর রাজ্য সুন্দরী নর্ত্তকীর ন্যায় অপরূপ। যে অঙ্গ নিরীক্ষণ কর, নয়ন-মন যেন মুগ্ধ ক'রে দেয়। তার উপর আকাশ পরিষ্কার থাক্‌লে, সূর্য্য-কিরণে কাশ্মীরের জ্যোতিম্ময় অঙ্গ, বাস্তবিকই চোখ ঝ'ল্‌সে দেয়। রাশিকৃত হীরক, পান্না, মুকুতারাশির উপর সূর্য্যের কিরণ প'ড়লে, সে দিকে যেমন চেয়ে থাকা যায় না,—অথচ দৃষ্টিও ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা হয় না, তেমনই, এই কাশ্মীরের প্রাকৃতিক শোভার উপর বালারুণ কিরণ পতিত হ'লে, সে সৌন্দর্য্য থেকে নয়ন ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা হয় না,—অথচ চক্ষু যেন ঝলসে দেয়।

ক্রমে আমরা শিখরে উঠ্‌লাম। এই স্থান সমুদ্র-পৃষ্ঠ হ'তে ছ'হাজার দু'শত পঞ্চাশ ফিট উচ্চ এবং শ্রীনগর হ'তে এক হাজার ফিট উচ্চ। এই স্থানের কতকটা অংশ সমতল। নানাজাতীয় পার্ব্বত্য কুসুম ফুটে, স্থানটীকে শোভাময় ক'রে রেখেছে। উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত মন্দিরের সীমানা। ছোট একটী দরজা, এই দরজা পার হ'য়ে, সোপান অতিক্রম ক'রে আর একটী চত্বরে এসে প'ড়তে হয়। পরে সরাসর ঊর্দ্ধদিকে সোপান বাহিয়া মন্দিরের চত্বরে উপস্থিত হ'তে হয়। উপরে ওঠ্‌বার জন্য দুই পার্শ্বে সোপান। সম্মুখ-ভাগ মন্দিরের চত্বরের সহিত সমভাবে গাঁথা। এই স্থানটী মন্দিরের বারাণ্ডার মতই দেখ্‌তে—কেবল রেলিং নাই এবং তাহা দু'হাতের বেশী প্রশস্ত নয়। ৺দেবাদিদেবের সেবক সন্ন্যাসী এইখানে উপবিষ্ট হ'য়ে পাঠ-রত থাকেন। ইহার পর মন্দিরের ছোট দরজা। এখান হ'তেও চার পাঁচটী সোপান অতিক্রম ক'রে ঊর্দ্ধে উঠে দেবাদিদেবের পূজা ক'রতে হয়।

প্রায় তিন হাত উচ্চ মসৃণ রক্তবর্ণ প্রস্তরের সুগঠিত বৃহৎ লিঙ্গ-মূর্ত্তি জ্যেষ্ঠবর নামক মহাদেব, প্রায়শঃ অন্ধকারের ভিতর সম চতুষ্কোণ স্থানে
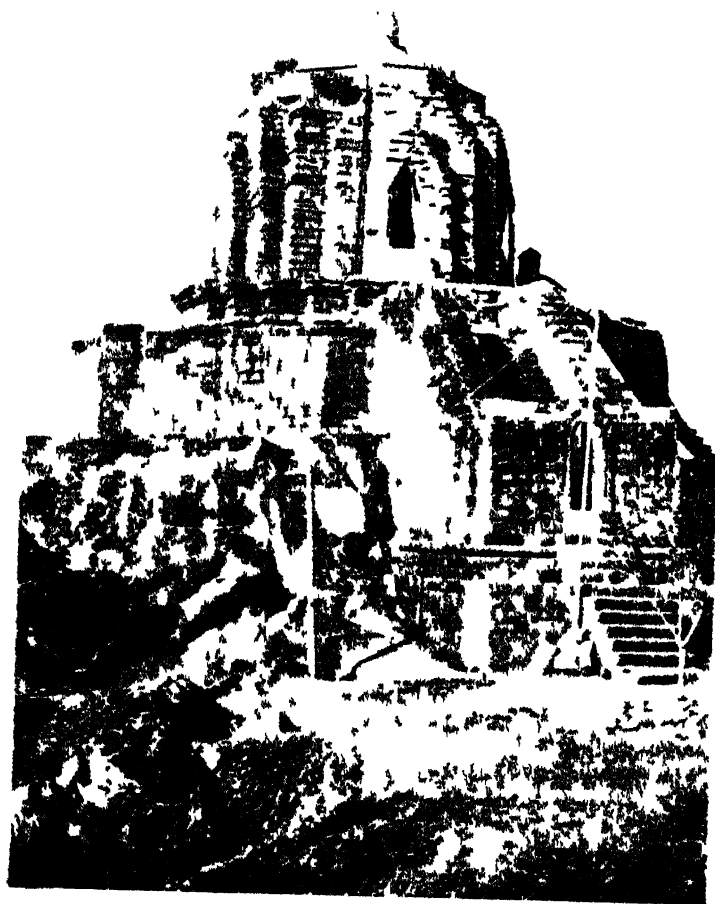
স্থাপিত। তিন দিক ঘেরা, সম্মুখের দিকে তিনটি খিলানের আকারে কাঠের ফ্রেম,—তাহাতে পর্দ্দা ঝুলান আছে। এই সোপানের শেষে দু' পাশে দু'টী কুঠুরী। এই পর্ব্বতের তলদেশে দুর্গানাগ বিদ্যাপীঠে যে সকল শঙ্কর-পন্থী সন্ন্যাসীরা বাস করেন, তাঁহারাই এই জ্যেষ্ঠবর শিবলিঙ্গের সেবা ক'রে থাকেন। প্রত্যহ সকালে একজন সন্ন্যাসী দুর্গানাগ কুণ্ডের জল এনে দেবাদিদেবের সেবা করেন, এবং সমস্ত দিন এখানে অবস্থান ক'রে সন্ধ্যায় নেমে যান।

মহারাজ অশোকের বহুপূর্ব্বে খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দে এই পর্ব্বত-চূড়ায় বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী জালকের নির্ম্মিত বৌদ্ধ মঠ ছিল। প্রায় চারি শত বৎসর এই স্থানে বৌদ্ধ পতাকা উড্ডীন ছিল। এখন তাহার চিহ্ন মাত্র নাই। খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা গোপাদিত্য এই পর্ব্বত-শিখরে একটী শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কাল-প্রভাবে তাহাও প্রায় বিনষ্ট হ'য়ে এসেছিল। ঐ সময় বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিকৃতি ভাবাপন্ন হ'য়ে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রবল ভাবে বিস্তৃতি লাভ ক'রেছিল। খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে তৎকালীন লুপ্তপ্রায় হিন্দু-ধর্ম্মের রক্ষক শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য দেবের এই স্থানে পদার্পণের পর পুনরায় মন্দিরের সংস্কার সাধন হয় এবং তাঁহারই নামে পাহাড়টী শঙ্কর-পর্ব্বত আখ্যা লাভ করে। পরে সোলেমান বাদসার দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে ঐ পর্ব্বতের উপর একটী মসজিদ বা তক্ত নির্ম্মিত হয় এবং এই সোলেমানের নামে মসজিদের নাম করণ হয়। উপস্থিত মন্দিরের পাদদেশে একটী কারুকার্য্যময় প্রস্তর-নির্ম্মিত বেদী,—রাশিকৃত মাটী ও কাঁটা ঘাস বুকে ক'রে পরিত্যক্ত অবস্থায় প'ড়ে আছে। ঐ বেদীকে সোলেমান তক্ত বা তক্ত-ই-সুলেমান ব'লে থাকে। অত্রত্য মুসলমানেরা সোলেমানের নামানুসারে এই পর্ব্বতটীকে সোলেমান-পর্ব্বত ব'লে অভিহিত করে।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব-কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ মুসলমান দিগকে বিতাড়িত ক'রে কাশ্মীর প্রদেশ জয় করবার পর, হিন্দু শিখ নরপতির দ্বারা মন্দিরের পুনঃ সংস্কার সাধিত হয়।

প্রথম স্তরে দেবাদিদেব বিরাজমান। দ্বিতীয় স্তরে দু'টী কুঠুরী, তৃতীয় স্তরে প্রায় দু'হাত প্রশস্ত চত্বর মন্দির প্রদক্ষিণ ক'রেছে। চতুর্থ স্তরে আর একটী প্রশস্ত চত্বর দুই পাশে ফুট পাতের মত উঁচু ক'রে গাঁথা। এই চত্বরটী আট দশ হাত প্রশস্ত ব'লে অনুমান হয়।

এই স্থান হ'তে দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়ে আর একটী সোপান, এক গুহা-গৃহের ছাদের উপর সংলগ্ন হ'য়েছে। এই গুহা পঞ্চম স্তরে। এই গুহাটী সেবকের অবস্থিতির জন্য। এই গুহার ছাদ হ'তে আর একটী সোপান, পঞ্চম স্তরে নেমে এসেছে। চতুর্থ স্তর হ'তে সমস্ত শ্রীনগরটী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। দূরে নীল কায়া শৈলমালা ও তাহার পশ্চাতে শ্বেত তুষারমণ্ডিত গগন-স্পর্শী-শৈল-শৃঙ্গ দৃঢ় প্রাকার স্বরূপ শ্রীনগরকে সুরক্ষিত ক'রে রেখেছে। এখান হ'তে হরি পর্ব্বত ও তদুপরিস্থিত কেল্লা সুস্পষ্ট দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কেল্লায় সাধারণের গমন নিষেধ। রাজবাটীর ভিতরেও প্রবেশের হুকুম নাই। এখান হ'তে ডাল-লেক ও তদুপরিস্থিত শিকারা গুলি, হংসকুলের ন্যায় দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কাশ্মীরের সুবিখ্যাত ভাসমান বাগানগুলি মধ্যে মধ্যে দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় এবং তীরস্থ ক্ষেত্র ও বৃক্ষগুলি এবং কাঠের বাড়ীগুলি যেন সাজান ছোট ছোট তাসের ঘর বাড়ী ও বাগান ব'লে ভ্রম হয়।

এ অঞ্চলে প্রায় সমস্ত পতিত জমি, ফুলের গাছ দিয়ে ভর্ত্তি ক'রে রাখা হয়,—দেখ্‌লে মনে হয়, ফুলের চাষ করা হ'য়েছে। এ সকল ফুলে কোনও কাজ হয় না,—শুধু জমির শোভা বর্দ্ধন ক'রে রেখেছে। বাঙ্গলা দেশে যেমন জঙ্গলের ধারে ঘেঁটু, আকন্দ প্রভৃতি ফুল দেখ্‌তে

পাওয়া যায়—এও প্রায় সেই প্রকার। তবে এ ক্ষেত্রে বিশেষত্ব এই যে, প্রাচীর দিয়ে অথবা আলি দিয়ে ঘেরা জায়গায় এই সব ফুলের চাষ হ'য়েছে। জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লেম যে, এই সকল ফুল কেহ স্পর্শও করে না। এখানে রাজপথের ধারের গাছের ফুলও কেহ স্পর্শ করে না। একদিন বেড়াবার সময় উনি পথের ধারের একটী গাছ থেকে ফুল তোল্‌বার জন্য যেমন হাত বাড়িয়েছেন, অমনি পিছন হ'তে একজন পথিক গম্ভীর স্বরে ব'লে উঠলো, "হাত পিছে করো!" মনে হ'ল, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান ফুল, কাশ্মীরকে সেই ফুলসাজে সজ্জিত রাখ্‌বার জন্য সকলেই সমভাবে যত্নবান্‌। কোনও কোনও ফুলের গন্ধ অতিশয় মন্দ,—শুধু দেখ্‌তে ভাল ব'লে, যত্ন ক'রে ঘিরে রাখা হ'য়েছে। এক এক স্থানে এক একটী রংয়ের খেলা। এই কারণেই কাশ্মীরের সর্ব্বত্রই লাল, নীল, পীত, হরিদ্রা, সাদা, সবুজ প্রভৃতি নানা রংয়ের হিল্লোল ব'য়ে যায়। আর ভূমিও সমতল নহে, এ কারণ সোপানশ্রেণীর ন্যায় বহুদূর ব্যেপে এই রূপের তরঙ্গ দৃষ্টি-গোচর হয়। এই দৃশ্য শঙ্কর পর্ব্বতের উপর হ'তে অতি চমৎকার দেখায়। এখান হ'তে ঝিলমের অপূর্ব্ব গতি ভঙ্গী, বহু দ্বীপপুঞ্জের সৃষ্টি ক'রে,—দক্ষ হস্তের আলিপনার মত বেঁকে বেঁকে চ'লে যাওয়ায়,—শ্রীনগরের অঙ্গে যেন উহা অলঙ্কার সদৃশ শোভা ধারণ ক'রেছে। এক পাশে পর্ব্বতের কোলে সারি সারি রেজিমেণ্টের ঘরগুলি এবং তাহার সম্মুখস্থিত বাদামবাগ, এই স্থানটীকে যেন বন-নগরী ক'রে তুলেছে। অন্যদিকে গুপকয়ার পর্ব্বতের উপর মহারাজার প্যালেস্‌টীকে একখানি সুন্দর ছবি ব'লে মনে হ'চ্ছিল।

মন্দির প্রদক্ষিণ ক'রে আমরা পঞ্চম চত্বরে নেমে এলাম। এই স্থানটী মন্দিরের বাহিরে—খানিকটা সমতল ভূমি। এই ভূমির এক

পার্শ্বে মন্দিরের সীমানার প্রাচীর, অপর পার্শ্বে সোলেমান বাদসাহের তক্ত রয়েছে। মন্দিরের চারি কোণে চারিটা বড় বড় ইলেক্‌ট্রিক্ আলো,—নগরের দিকে কালো সেডে ঢাকা। রাত্রে এই আলো প্রজ্বলিত হ'লে, নগরের চারিদিক থেকে অন্ধকারেও নভোগাত্রে, চিত্রের মত মন্দির দর্শন হয়। আমরা পর্ব্বত হ'তে নেমে এলাম। চড়াই অপেক্ষা উৎরাইএ কম সময় লাগে। আমাদের চড়াই ও উৎরাইএ দু'ঘণ্টা লাগ্‌ল। নীচে আসতেই পূর্ব্বোক্ত বালক-বালিকারা আবার আমাদিগকে আনন্দ দান ক'র্‌লে। তাহাদিগকে কিছু কিছু দিয়ে, তাহাদের সেই ছড়াটী মুখস্থ ক'র্‌তে ক'র্‌তে আমরা টঙ্গায় এসে উঠ্‌লাম এবং তাড়াতাড়ি হোটেল অভিমুখে রওনা হ'লাম। কারণ এগারটার সময়, গাইড্ শিবজী পণ্ডিতের সঙ্গে বেড়াতে যাবার কথা আছে। হোটেলে ফিরে এসে সত্বর আহারাদি সেরে নেওয়া গেল।

চশমা-সাহী

যথা সময়ে পণ্ডিতজী উপস্থিত হ'লেন। যথা সম্ভব সত্বর বাহির হওয়া গেল। একটা প্রথম শ্রেণীর টঙ্গা ভাড়া ক'রে প্রথমেই চশমা-সাহী গেলাম। ইহা একটী পর্ব্বতের উপর প্রাকৃতিক ফোয়ারা। ইহা আর একটী পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত,—সমতল ভূমি হ'তে অনেক উঁচে। বরাবর টঙ্গায় ক'রে গিয়ে তার পর সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে হয়। শুনলাম, এই রাস্তা মহারাজা হরি সিংহের বিবাহের সময় প্রস্তুত হ'য়েছিল, এবং এই নূতন পথ দিয়ে মহারাণীকে রাজধানীতে আনা হ'য়েছিল; সহরের শেষ সীমানায় কয়েক জায়গায় পর্ব্বতের গায়ে মহারাজার প্যালেস্ প্রস্তুত হ'চ্চে। পথ ক্রমশঃই চড়াই। পথের পাশে আখরোট, বাদাম, তুঁত, কাশ্মীরজাত নিমফল প্রভৃতি নানা রকম গাছ শোভা পাচ্ছে! এ সকল গাছ বিশেষ ছায়া দান করে না, বট বৃক্ষের মত চেনার গাছই ছায়া দান করে।

অনেক জায়গায় বেতের ক্ষেত্র দেখ্‌লাম; বেত গাছগুলি, মোটা মোটা কালো কালো, গা ফাটা ফাটা, দশ বার হাত উচ্চ। ইহার অগ্রভাগ নিয়েই চাষ। প্রত্যেক গাছের মাথায় নব মুঞ্জরিত কঞ্চির মত লম্বা লম্বা শাখা নির্গত হ'য়ে, খেজুর গাছের মত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হ'য়ে আছে। ঐ গুলি কেটে নিয়ে তার দ্বারা নানারূপ ফার্ণিচার ও অন্যান্য সুন্দর সুন্দর দ্রব্যাদি প্রস্তুত হ'য়ে থাকে। এই রকম বেতের ক্ষেত্র কাশ্মীরের নানা স্থানে আছে।

টঙ্গা ক্রমে সমতল ভূমি হ'তে অনেক উচ্চে পর্ব্বত-গাত্রে গিয়ে দাঁড়ালো। আমরা টঙ্গা হ'তে নামলাম্। বাম পার্শ্বে পর্ব্বত। সম্মুখে

কাঠের সোপান,—সোপান অতিক্রম ক'রে উপরে উঠে দেখ্‌লাম—সম্মুখেই একটা বড় বোর্ড, ইহাতে প্রবেশ-মূল্য লেখা আছে। ইহার পরেই দুই পার্শ্বে দু'টী চক্র লাগান র'য়েছে। একটী প্রবেশ-চক্র, অপরটী বহির্গমনের চক্র। একজন ঐ দেশীয় রাজপুরুষ ঐ চক্রের কাছে ব'সে আছেন। তাঁহার কাছে প্রবেশ-মূল্য লোক প্রতি দু'আনা হিসাবে দিয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ ক'র্‌লাম। সম্মুখেই চত্বর—তৎপরে উদ্যান। বাগানটী ফল ও ফুলের গাছে সুশোভিত, মধ্যে কতকগুলি ফোয়ারা। এই ফোয়ারাগুলি রবিবারে খুলে দেওয়া হয়। তখন অতি সুন্দর দেখায়। সে দিন প্রবেশ-মূল্য দ্বিগুণ। উদ্যানের চতুর্দ্দিকে নানাবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হ'য়ে উহার চমৎকার শোভা সম্পাদন ক'রেছে। ক্রমে ক্রমে পর পর দু'টী চত্বর অতিক্রম ক'রে, একটি বারাণ্ডার ভিতর গেলাম। বারাণ্ডার মধ্যস্থলে কালো পাথরের এক হাত উচ্চ একটি চশমা—ইহারই নাম চশমা-সাহী। ইহা একটি উৎস। কলিকাতার রাস্তায় জল দিবার জন্য রাস্তার ধারে জলের যে পাইপ আছে,—ঐ পাইপ খুলে দিলে, তাহা হ'তে যে ভাবে অনর্গল জল উঠ্‌তে থাকে, ইহাও ঠিক সেই প্রকার। তবে কলিকাতার সে জল কর্দ্দমাক্ত ময়লা জল, আর ইহা পর্ব্বত-নিঃসৃত ভোগবতীর ন্যায় সুনির্ম্মল, সুশীতল হজ্‌মি জলরাশি। ইহাকে চশমা বলে। এই ভাবের জল যেখানে যেখানে উত্থিত হ'য়েছে, সর্ব্বত্রই উহা 'চশমা' নামে অভিহিত। এই স্তরের নিম্নস্তরে এই জল পতিত হ'য়ে কৃত্রিম ফোয়ারার সৃষ্টি ক'রে জাহাঙ্গীর বাদসাহের সুরুচির পরিচয় দিতেছে। বলা বাহুল্য, এই চশমা জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময়ে নির্ম্মিত হ'য়েছিল। কাশ্মীরে দর্শন-যোগ্য অধিকাংশ স্থানই মোগল-সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ে প্রস্তুত। ইহার তিন পার্শ্বেই দোতলা বারাণ্ডা—সম্মুখে শ্যামল

চত্বর। ইহার সম্মুখেই ঠিক এইরূপ আর একটি বারাণ্ডা। এই বারাণ্ডার মধ্য দিয়ে প্রবেশ ক'রতে হয়। মধ্যস্থল শ্যামল প্রাঙ্গণ পত্র-পুষ্পে সুশোভিত হ'য়ে আছে। এই জল স্তরে স্তরে নামিয়া ফোয়ারা সমূহের শোভা সম্পাদন ক'র্‌ছে। এই স্থানে জাহাঙ্গীর বাদসাহ বন্ধু-বান্ধবদের ভোজ দিতেন, এবং এই জল পান ক'রে তৃপ্ত হ'তেন। কাশ্মীরের মধ্যে এই জল উৎকৃষ্ট ব'লে বিখ্যাত। আমরা সকলে উদর পূর্ণ ক'রে এই জল পান ক'রে তৃপ্ত হ'লাম। 'হারুয়ান', 'সালামার', 'নিষাত' ও 'চশমা-সাহী' প্রভৃতি সব গুলিই এক প্ল্যানে প্রস্তুত বাগিচা। এই প্ল্যান 'চন্দন বাড়ীর' অনুকরণে প্রস্তুত ব'লে বোধ হ'ল। আহা, সেই মহান্ দৃশ্যের কথা ভোল্‌বার নয়। সে স্থানে তাপিতের তাপ নাশ হয়, দুঃখিতের দুঃখ থাকে না, তপস্বীর ইষ্ট লাভ হয়। যা' হোক, এই চশমা-সাহী পূর্ব্বোক্ত বাগানগুলির অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু সৌন্দর্য্যে কম নয়।

জ্যেষ্ঠ ভবানী বা ক্ষীঠের

আমরা চশমা-সাহীতে একটু বিশ্রাম ক'রে 'জ্যেষ্ঠ ভবানী' অভিমুখে যাত্রা ক'রলাম। এই পথের উভয় পার্শ্বে বারুইপুর (২৪ পরগণা) অঞ্চলের সযত্নে রক্ষিত পেয়ারা বাগানের মত, বাদাম বাগ, আখরোট বাগ, ন্যাসপাতি ও আপেল বাগ, চেরির বাগান এবং বেতের ক্ষেত্র শোভা পাচ্ছে। আমরা এই সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে চ'ললাম। প্রায় দু'মাইল পথ ঘুরে টঙ্গা একটি উপবন স্বরূপ পাহাড়ী পথে প্রবেশ ক'রলে। কিছু দূর উঠে ভয়ানক চড়াই। চাকার টায়ার কেটে গেল। আমরা নেমে পায়দলেই উপরে উঠ্‌তে লাগলাম। এত চড়াই, যে হাঁফ্‌ ধ'রছিল, কিন্তু রাস্তা ভাল। রাস্তার দক্ষিণে খাদ, খাদের পরই উচ্চ পর্ব্বত। এই পর্ব্বত ভয়ানক জঙ্গলে, এখানে হরিণ, বাঘ শিকার করবার জন্য লাইন দেওয়া র'য়েছে। বলা বাহুল্য, মহারাজা ভিন্ন অন্য কাহারও শিকার করবার হুকুম নাই। প্রাণে একটু ভয়ও যে হ'ল না, এমন নয়। এই ভাবে পথ হেঁটে চেরির বাগান দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা বনের মধ্যে একটা পুরাতন কাঠের বাড়ীর প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হ'লাম। এই বাড়ীতে অনেক গুলি স্ত্রী-পুরুষ দেখ্‌লাম। চশমা-সাহীর দিকেও অনেক চেরির বাগান। আমি গোটা কয়েক চেরি ফল দেশে নে যাবার জন্য নিয়েছিলাম,—উদ্দেশ্য—দানা ক'রে গাছ ক'রব, কিন্তু পরে শুন্‌লাম—চেরির কলম না বাঁধ্‌লে গাছ হয় না, এবং বাঙ্গালা দেশের মাটিতেও ইহা জন্মায় না। কাজেই আশা নিষ্ফল হ'ল।

উপরোক্ত কাঠের বাড়ীর একটু দক্ষিণে ঘুরলেই ৺জ্যেষ্ঠ ভবানীর

ভাঙ্গা পুরাতন স্থান দেখ্‌তে পাওয়া যায়। দক্ষিণে ঘুরে একটু উপরে উঠে যেন বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত একটা জীর্ণ কাঠের ছাউনি করা ভগ্ন বহু পুরাতন চাঁদনির মত দেখ্‌তে পেলাম। এই চাঁদনির ঠিক মধ্যস্থলে তলা পর্য্যন্ত গাঁথা একটি কুণ্ড। ইহাও একটি চশমা। এই জল পূর্ব্বে বহুল পরিমাণে নির্ঝরের আকারে নীচে নামতো, কিন্তু এখন প্রায় শুকিয়ে এসেছে। কুণ্ডে জল পরিপূর্ণ হ'য়ে ভূ-গর্ভস্থ পথ দিয়ে একটু নীচে আর একটা কুণ্ডে গিয়ে প'ড়্‌ছে। প্রথমোক্ত কুণ্ডের গর্ভ হ'তে একটি লতা গাছ ছাদের উপর তুলে দেওয়া হ'য়েছে। কুণ্ডটি সম চতুষ্কোণ। জীর্ণ কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা। এক কোণে চত্বরের উপর, কালো পাথরের বহু পুরাতন দু'টী লিঙ্গ মূর্ত্তি! এই মূর্ত্তিই শিব-দুর্গা এবং ইঁহারই নাম ৺জ্যেষ্ঠ ভবানী বা জীঠের। এই দেব দেবী পাণ্ডব-জননী কুন্তিদেবীর স্থাপিত। বহু বহু কামনাবতী রমণী এখানে এসে, ঐ নীচের কুণ্ডে স্নান ক'রে এবং ৺শিব-দুর্গার পূজা ক'রে, ঐ লতা গাছের গায়ে একটা কামনা-সূত্রে বেঁধে দিয়ে যান। কামনা পূর্ণ হ'লে ঐ গ্রন্থি একটু আল্‌গা হ'য়ে যায়, তৎদৃষ্টে পুরোহিত বুঝ্‌তে পারেন যে, ঐ ব্যক্তির কামনা পূর্ণ হ'য়েছে। কামনার সঙ্গে কিছু মানত ক'রতে হয়, এবং কামনা পূর্ণ হ'লে মানত-অনুযায়ী পূজা দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা-ষ্টমীতে এখানে বহু নর-নারীর আগমন হ'য়ে থাকে। শুন্‌লাম পূর্ব্বে ঐ সময় এখানে বড় মেলা ব'সতো। এই বহু পুরাতন দেবালয়ের এইরূপ ভগ্নাবস্থা দেখে কাশ্মীরের হিন্দুরাজগণের প্রশংসা ক'রতে পারলাম না। মনে মনে একটি কামনা ক'রে, একটি সূত্র বেঁধে দিলাম। স্থানটী বনের মধ্যে নির্জ্জন ও শান্তিময়। দেখ্‌লে সেকালের ঋষি-গণের কথা মনে হয়। হয়তো তপোবালাগণ এখনও উপর হ'তে এখানে এই হর-পার্ব্বতীর পূজা ক'রতে এসে থাকেন। তাঁদের সেই

গৈরিক বসনা পুষ্প-ভূষণা তপোনিরতা মূর্ত্তি ও সঙ্গে সঙ্গে শ্বেত শ্মশ্রু, শ্বেত যজ্ঞোপবীত, গৈরিক উত্তরীয়, পূজানিরত মানব-মূর্ত্তি, মানস-নয়নে ভেসে উঠ্‌ল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ঋষি-শ্রেষ্ঠের চরণে শির অবনত হ'য়ে প'ড়ল। ইহা একটি পরম রমণীয় পবিত্র তীর্থস্থান। জন-মানব-শূন্য পর্ব্বতের উপর—বাহ্যিক আড়ম্বর শূন্য বহু পুরাতন দেবালয়। এখানে এলে মনে তৃপ্তি ও প্রাণে শান্তি হয়। দেবারাধনার যোগ্য স্থান। আমরা কিছুক্ষণ এখানে ব'সে রইলাম। পরে মায়ের প্রসাদ ও ফুল নিয়ে এবং যথাসাধ্য কিছু প্রণামী দিয়ে এখান হ'তে বেরুলাম।

রাজদর্শন

আমরা দেবদর্শন ও কুণ্ড প্রদক্ষিণ ক'রে ৺জ্যেষ্ঠ ভবানী হ'তে ফিরলাম এবং সত্বর শ্রীনগর অভিমুখে যাত্রা ক'রলাম। মহারাজা হরি সিংহ (বর্ত্তমান কাশ্মীরের অধিপতি) আজ জম্মু হ'তে শ্রীনগরে আস্‌বেন, তিনি সুদীর্ঘ আট মাস প্যারিসে ছিলেন। সেখানে মহারাণী একটি পুত্র সন্তান প্রসব ক'রেছিলেন। অতঃপর সেই নবজাত শিশুটীকে নিয়ে তাঁরা রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন ক'র্‌ছেন। জম্মুতে কয়েক দিন বিশ্রাম ক'রে, মোটরে শ্রীনগরের সীমায় এসে ঝিলম নদীতে নৌকায় উঠ্‌বেন, এবং সাত নম্বর পুল 'সাফা কদল' পর্য্যন্ত গিয়ে পুনশ্চ মোটর যোগে, পুরাতন রাজবাড়ী ও রাজধানীর প্রধান প্রধান রাস্তা ঘুরে, খালসা হোটেলের সম্মুখ দিয়ে শঙ্করাচার্য্য পর্ব্বতের পাশে গুপকার পর্ব্বতোপরিস্থিত নূতন রাজপ্রাসাদে যাবেন। সুতরাং রাজ-দম্পতি ও নবজাত রাজকুমারের কল্যাণ-কামনায় রাজপথ, নদীবক্ষ সুসজ্জিত ও সুশোভিত করা হ'য়েছিল। আমরা রাজদর্শন ও নগরদর্শন অভিলাষে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। দেখ্‌লাম, পথের মাঝে মাঝে রক্তবস্ত্রে তোরণ-দ্বার নির্ম্মিত হ'য়েছে। প্রস্ফুটিত পুষ্প-পল্লব দিয়ে সেগুলি ভূষিত করা হ'য়েছে। তার উপর বিবিধ ভাষায় স্বাগত সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বচন প্রভৃতি লেখা। পথের দুই পাশ পুষ্প-পল্লব এবং কাগজের লতা-পুষ্প দ্বারা সুশোভিত এবং সমস্ত বড় বড় বাড়ীগুলি রঙ্গিন বিজলী-বাতি দ্বারা সাজান হ'য়েছে। স্থানে স্থানে লতা গুল্ম বৃক্ষের মধ্যেও বিজলীবাতি দেওয়া হ'য়েছে। এই সকল বাতি সন্ধ্যার পর জ্বালা হবে।

স্থানে স্থানে মহারাজা, মহারাণী ও নবজাত রাজকুমারের ছবিও সজ্জিত অবস্থায় বিলম্বিত র'য়েছে। খালসা হোটেলের সম্মুখে লোকে লোকারণ্য। চমৎকার বাহার, শুধুই পাগড়ি—নানারঙের নানারকমের পাগড়ি। কাশ্মীরে যেমন নানাবিধ ফুলের বাহার, আজ রাজপথে তেমনি পাগড়ির বাহার ফুটে উঠেছে,—যেন কাশ্মীরী ফুল রাস্তাময় ছড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছে।

আমরা হোটেলে গিয়ে, হাত-মুখ ধুয়ে জলযোগ ক'রে তাড়াতাড়ি বাহির হ'লাম। নদীর ধারে যেতেই বহু শিকারাওয়ালা এসে পাকড়াও ক'রলে। পণ্ডিতজী একখানা শিকারা ভাড়া ক'রলেন। এ দিন পাঁচ ছ'টাকা ক'রে শিকারার ভাড়া হ'য়েছিল, পণ্ডিতজী সে দেশী লোক সঙ্গে ছিলেন ব'লে আমাদের কিছু সুবিধা হ'য়েছিল। নদী-বক্ষে শিকারায় ভেসে চ'ললেম। বরাবর সাত নম্বর পুল পর্য্যন্ত গিয়ে পুনরায় ফের্‌বার মুখে বিপদ মন্দ নয়—পরে ব'লছি, আগে নদীর একটু পরিচয় দিই :—

শ্রীনগরের সীমানা পর্য্যন্ত, ঝিলমের উভয় তীরস্থিত সমস্ত কাঠ ও পাথরের নূতন বা পুরাতন বাড়ীর বারাণ্ডা ও প্রাচীরে, এবং নদীর কিনারার সমস্ত উঁচু ও নীচু জমিতে কাশ্মীরজাত এবং ইরাণ,তুরাণ ও পারস্ত-জাত উৎকৃষ্ট শিল্পকলা ও কারুকার্য্যবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রেশমী পশমী গালিচা, সতরঞ্চ, কম্বল, কার্পেট, চাঁদোয়া, আসন, কুশন, শাল, জামিয়ার, দোজা, রুমাল, শাড়ী ও চাদর ঝুলান বিছান এবং নানাভাবে সাজান র'য়েছে। ইহাও এক চমৎকার দৃশ্য। তার উপর অসংখ্য ঘাটে অসংখ্য মানুষ,—পূর্ব্বেই ব'লেছি—এগুলির বিশেষত্ব হ'চ্ছে পাগড়ির। এক এক স্থানে এক এক বর্ণের বাহার। কোথাও লাল, কোথাও নীল, সাদা, হলুদে, গোলাপী, চম্পকবর্ণ, রক্তবর্ণ, গৈরিকবর্ণ প্রভৃতি নানা

রঙ্গের বিচিত্র ফুলের মত এক এক স্থলে এক এক শোভার সৃষ্টি ক'রেছে। বিচিত্র বর্ণের আলখাল্লার মত কাশ্মীরী পোষাক পরা, পদ্মফুলের মত সুন্দর মুখগুলি বাহির ক'রে জায়গায় জায়গায় কাশ্মীরী নারীরা দল বেঁধে ব'সে আছে। স্কুলের ছেলেরা দলে দলে বিভক্ত হ'য়ে, এক এক রকম পাগড়ী এঁটে ব'সে আছে। কোথাও ব্যাণ্ড, কোথাও বীণ, কোথাও ডুগি-তবলা প্রভৃতি যে যাহার বাদ্য-যন্ত্র নিয়ে বাজাচ্চে। উদ্দেশ্য— মহারাজ বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনা করা। রাজ-সরকার থেকে নদীর ধারে ব্যাণ্ড বাজানও হ'চ্চে। নদীর প্রত্যেক পুলের খিলানের তলায়, বিশেষতঃ মাঝের খিলানে, চাঁদোয়া লাগান হ'য়েছে। বলা বাহুল্য যে, সে সব চাঁদোয়া বিচিত্র কারু-কার্য্যমণ্ডিত অতি মূল্যবান সিল্কের অথবা শালের তৈয়ারী। প্রত্যেক খিলানের থামে রঙ্গিন রেশমী বস্ত্র সিনের মত ক'রে এঁটে দেওয়া হ'য়েছে। প্রত্যেক স্তম্ভের সম্মুখ দিকে জলের উপর সূচ্যগ্র মুখ পর্য্যন্ত ফুটন্ত ফুলের বাগিচা প্রস্তুত করা হ'য়েছে। বড় বড় নূতন রং করা ছিপের উপর স্কুলের কিশোর ছাত্রগণ এক এক ব্যাজে এক এক রকম পোষাক ও পাগড়ী প'রে হরতনের টেক্কার মত সুদৃশ্য দাঁড় ঝপ্ ঝপ্ শব্দে বাহিয়া ঘুরে বেড়াচ্চে। এক রকম পোষাক ও পাগড়ী পরা ভলেন্টিয়ারের ছিপ ঐ ভাবে ঘুরে বেড়াচ্চে। সুন্দর সাজান শিকারাগুলি মহারাজার নৌকার পিছনে প্রসেশনে যাবে ব'লে প্রস্তুত হ'য়ে র'য়েছে। নদীর উপর চক্ষুর অগোচরে তার খাটিয়ে মহারাজার অভ্যর্থনা-গীতি টাঙ্গান হ'য়েছে। (মহারাজার নৌকা চ'লে যাবার পরই, এইটা চক্ষের নিমিষে উল্‌টে অন্য রকম হ'য়ে গিয়েছিল দেখেছিলাম) নদীর ঘাটে অনেক জায়গায় গেট ক'রে, মহারাজার স্বাগত এবং আশীর্ব্বচন নানা ভাষায় এবং নানা ভাবে লেখা হ'য়েছে। দু'তিন তলা বাড়ীর ছাদে এক গলা ঘাসের বা ফুল গাছের মধ্যে কাশ্মীরী রমণীগণ

নির্ভীক-চিত্তে ব'সে আছে। অপরূপ দৃশ্য—এ দৃশ্য পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। গত কল্য সমস্ত রাত দিন বৃষ্টি হওয়ায়, নদীও পূর্ণবেগে ফুলে ফুলে নেচে নেচে ছুটে চ'লেছে। সে বেগের সাম্‌নে আমাদের ক্ষুদ্র তরণী বুঝি বান চাল হ'য়ে যায়। এই সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে আসছি, এমন সময় সাঙ্কেতিক তোপ হরি পর্ব্বতের উপরিস্থিত কেল্লা হ'তে ক্রম ক'রে আওয়াজ ক'রলে। আমরা চমকিত হ'য়ে সেই দিকে চাহিলাম। পণ্ডিতজী ব'ললেন, 'মহারাজ এসেছেন, নৌকায় উঠেছেন, তারই তোপধ্বনি।' সঙ্গে সঙ্গে পরে পরে অনেক গুলি তোপ প'ড়লো। আমাদের শিকারা কিনারায় চ'ললো। এই সময় হঠাৎ এমন খরতর বেগে তর্ তর্ ক'রে জল এসে প'ড়লো যে, আমাদের শিকারা পোলের কাছে প্রবল স্রোতে কাত হ'য়ে এক ঝলক জল উঠিয়ে নিলে। আমি সেই ধারে ছিলাম, আমার ভূষণ, কাপড়, জামা ভিজিয়ে কোলের উপর দিয়ে জল চ'লে গেল। তরণী কাৎ হ'য়ে সকলকেই নদীর গর্ভে অনন্ত শয্যার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছিল, শ্রীগুরুর দয়ায় সে যাত্রা রক্ষা হ'য়ে গেল, সকলে বেঁচে গেলাম। আমার কিন্তু বুক থেকে পায়ের জুতা পর্য্যন্ত সব ভিজে গেল। সেই শীতে বিকালে সাড়ে পাঁচটার সময় অর্দ্ধ-স্নাত অবস্থায় আর্দ্র বস্ত্রে রাজ-দর্শন ক'রে বোধ হয় অন্য সকলের চেয়ে আমার কিছু বেশী পুণ্য সঞ্চয় হ'য়েছিল।

তোপ পড়্‌বার প্রায় পচিশ মিনিট পরে, দূরে বহুদূরে সোণার ছাউনি দেওয়া, বকশুভ্র মস্ত ছিপ দেখা গেল। আমাদের শিকারা কিনারায় কিনারায় গিয়ে রাজবাড়ীর সংলগ্ন একটি ডকের মত জায়গার কাছে ভিড়লো, আমরা নেমে উপরে উঠ্‌লাম। রাজার ছিপ সন্ সন্ বেগে এগিয়ে এলো। দেখ্‌লাম—মহারাজার ছিপের উপর প্রথমেই এক সিপাহি সাদা পোষাক পরা মিলিটারী কায়দায় তরবারী খুলে দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে চেয়ারের মত সোণার সিংহাসনে রাজারাণী উজ্জ্বল

সুবর্ণ বর্ণের সাঁচ্চা জরিব পোষাকে সজ্জিত হ'য়ে ব'সে আছেন। সম্মুখে সাদা পোষাক-পরা শ্বেত আসনে বৃদ্ধ মন্ত্রী বুকের কাছে দু'টী হাত জোড় ক'রে ব'সে আছেন। উপরে সোণার ছাউনি মহাপায়ার আকারে দেখা যাচ্চে। পিছনে মুক্তার ঝালর দেওয়া স্বর্ণছত্র ধ'রে ছত্রধারী দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে চারজন শরীব-রক্ষী প্রস্তর-মূর্ত্তির মত তরবারী খুলে দাঁড়িয়ে আছে। ষোল জন দাঁড়ী সুন্দর এক বকম পোষাক ও পাগড়ী প'রে ঝপ্ ঝপ্ ক'রে দাঁড় ফেলে স্রোতের মুখে তীরের মত ছুটে যাচ্চে। পিছনে দু'পাশে চার খানা ছিপ, শ্বেত বস্ত্র পবা হল্‌দে পাগড়ী মাথায়, চব্বিশ জন ক'রে রাজরক্ষী দ্বারা বাহিত হ'য়ে যাচ্চে। এর পিছনে দু'খানা মোটর লঞ্চ জল-পুলিস দ্বারা বাহিত হ'য়ে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্চে, যেন অন্য কোনও নৌকা ঐ সকল ছিপের উপর গিয়ে না পড়ে। পশ্চাতে অসংখ্য বোট, ছিপ, শিকারা ও বজরা নদীর এ কূল হ'তে ও কূল পর্য্যন্ত জুড়ে ভেসে যাচ্চে। চমৎকার শোভা-যাত্রা—অপরূপ দৃশ্য। বলা নিষ্প্রয়োজন, ঐ সমস্ত শিকারা বোট ও ছিপ প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে সাজান হ'য়েছিল।

মহারাজার ছিপ দূর হ'তে দেখ্‌বামাত্র তীরস্থিত রমণীরা উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে সুরলয় সংযোগে মহারাজার অভ্যর্থনা-গীতি গাহিতে লাগিল। বালকেরা মহারাজার জয়ধ্বনি করিল। মৃদঙ্গ, বীণ, এস্‌রাজ, ব্যাণ্ড প্রভৃতি বাজনা সকল বেজে উঠ্‌লো। কিন্তু এর একটি বিচিত্রতা দেখ্‌লাম। মহারাজার ছিপ যেখানে উপস্থিত হ'চ্চে, সেখানে সকলেই জেগে উঠে মহারাজার অভ্যর্থনা ক'রুছে, এবং ছিপ এগিয়ে গেলে সব নীরব হ'য়ে যাচ্চে—মায় সকল রকম বাজনা পর্য্যন্ত। এটি একটা দেখ্‌বার জিনিষ।

মহারাজার ছিপও চ'লে গেল, আর আমাদের শিকারাও অতি কষ্টে

তুফান ঠেলে আমিরা কদলের কাছে এসে আমাদের নামিয়ে দিলে। আমরা একেবারে হোটেলের উপর গিয়ে উঠ্‌লাম। পণ্ডিত শিবজী রাজদর্শন করবার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলেন। আমরা দু'জনে উপরের বারাণ্ডা হ'তে দেখ্‌তে লাগলাম। লোক রাস্তায় ধরে না। মহারাজা পুরাতন প্যালেসে জননীর নিকট দেড় ঘণ্টা বিশ্রাম ক'রে পুনর্বার মোটর-যোগে বা'র হবেন। এই সময়টা রাজভক্ত প্রজাগণ মহারাজার দর্শনাভিলাষে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা ক'রছে। পুলিশ এই সব লোকগুলোকে সংযত ক'রে রাখ্‌তে পারছে না। ভিড় যত সরিয়ে দিচ্চে, তত তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত লোকের স্রোত এসে প'ড়ছে। দেখ্‌তে বেশ আনন্দ হ'তে লাগ্‌লো। এখানে পুলিসের ব্যবহার দেখ্‌লাম অতিশয় ভদ্র, নেহাত প্রয়োজন না হ'লে কাউকে কিছু বলে না। পুলিস যাকে ধ'রছে, সে ব্যক্তি দু'চারটে ঘুসাঘুসি না ক'রে আর ধরা দিচ্চে না। কিন্তু একবার উভয়ে মুষ্টি-যুদ্ধের অভিনয় ক'রে পুলিসের নিকট বেশ শান্ত ভাবেই ধরা দিচ্চে। পুলিস তাকে সঙ্গে ক'রে আর এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিচ্চে। ভলেন্টিয়ারের মত ভদ্র ব্যবহার। গাড়ী, ঘোড়া, মোটর, লরী—কারও পথ আটক নাই, সকলেই ইচ্ছামত যাতায়াত ক'রছে। এমন সময় হঠাৎ হুস ক'রে রাজার মোটর এসে প'ড়লো। পিছনে আর একখানি মোটর। সঙ্গে আর কেউ নাই। কিছু পূর্ব্বে রাজপুরুষগণের এক এক খানা মোটর দেখা দিয়েছিল, এখন কিন্তু সঙ্গে কেহ নাই। সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত, ঝক্ ঝক্ ক'রছে ফ্যান্সি মোটর। পিছনের গদিতে রাজা রাণী, ঠিক সম্মুখে জোড় হস্তে বৃদ্ধ মন্ত্রী। পিছনের মোটরে চারজন রাজপুরুষ, ব্যস্। সোণার মোটর দেখ্‌তে পাওয়া মাত্র মহারাজার জয়ধ্বনি উত্থিত হ'লো এবং চতুর্দ্দিক হ'তে মহারাজার মোটরের উপরে

ও ভিতরে পুষ্পবৃষ্টি হ'য়ে গেল। মুহূর্ত্ত মাত্র মহারাজার মোটর সেখানে অচল হ'য়ে দাঁড়ালো, অমনি পিছনের মোটর হ'তে তাম্রখণ্ড এবং রজতখণ্ড বর্ষণ হ'য়ে গেল। ঐ গুলি কুড়াবার জন্যে লোকে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিলে, এই অবসরে মোটর দু'খানি ভোঁ ক'রে বেরিয়ে চ'লে গেল। আমার একটু হাসি এলো। কি আশ্চর্য্য, এই লোকগুলি মহারাজাকে দেখ্‌বে বলে কত কষ্টে—কখন হ'তে পথের উপর দাঁড়িয়ে র'য়েছে, মহারাজা এলেন, আর চক্ষে একটা ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিয়ে চ'লে গেলেন! লোকগুলি কি পেলে?—পয়সা—কে—কতগুলি পেলে? কেবল হুড়াহুড়ি ক'রে কে কার ঘাড়ে প'ড়ে মারা যায়,—আর পুলিসের পিটুনি—এই লাভ! শ্যামা মা আমাদের এমনি ক'রেই যে সব কাঁদুনে ছেলে 'মা—মা' ক'রে চেঁচাচ্চে, তাদের মাঝখানে এসে কোথাও সংসার-রূপ রাঙা ফল, কোথাও বা সিদ্ধাই-রূপ রাঙা ফল চারটি ছড়িয়ে দিয়ে ছেলেদের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্চেন। আর হতভাগ্য ছেলেগুলা তাই কুড়াবার জন্য হুটোপুটি লাগিয়ে দিচ্চে, আর পিছন হ'তে কালের পিটুনির জ্বলুনিতে, কে কোথায় ছিট্‌কে প'ড়ছে—তার ঠিকানা নাই, আর এই হুটোপুটি ও জ্বলুনির মধ্যে মায়ের কথা একেবারেই ভুলে যাচ্চে, তাজ্জব ব্যাপার! যাহা হোক, সে দিনের মত আমাদের দিনের কাজের অবসান ক'রে ঘরে এসে বসা গেল। পরে সন্ধ্যার সময় ঘর হ'তে দেখা গেল—নগরে ও নদীতে আলোকমালা জ্বলে উঠেছে। পুনরায় মহারাজা সন্ধ্যার পর নগরে আলো দেখ্‌তে বহির্গত হবেন। পুনরায় রাজপথে লোক জড় হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে এবং পুলিসের কার্য্যও আরম্ভ হ'য়েছে। আমরা কিন্তু পরিশ্রান্ত শরীরে আর উঠ্‌তে পারলেম না, আহারাদি ক'রে শয়ন ক'র্‌লেম। সে রাত্রে নগর এত আলোকিত হ'য়েছিল যে, ঘরের মধ্যেও আলোর জ্যোতিতে আমাদের ভাল ঘুম হয়নি।

ক্ষীর ভবাণীর পথে

২৬ শে বৈশাখ, শনিবার। আজ মহামায়ার দর্শনে ক্ষীর ভবাণী নামক স্থানে যাবার কথা স্থির ছিল। পণ্ডিতজী বেলা এগারটার সময় এসে আমাদেব ক্ষীব ভবাণী নিয়ে যাবেন। গত রাত্রে শুয়ে শুয়ে আমার মনে হ'ল যে, ৺ক্ষীরভবাণীর দর্শন অনাহারেই করা উচিত। তখনই মালিকের কাছে প্রার্থনা জানালেম,—প্রার্থনা মঞ্জুর হ'লো। সুতরাং সকালে উঠেই যাত্রার আয়োজন করা হ'লো এবং হোটেলে ব'লে দেওয়া গেল যে, আমবা এবেলা আহার ক'রবো না। সঙ্গে চিঁড়া ছিল, কিছু পুরি, দধি ও মিষ্টান্ন সঙ্গে ল'য়ে ক্ষীরভবাণী যাত্রা করা গেল। যাত্রার সময় পণ্ডিতজী এলেন। বেলা এগারটার সময় ক্ষীরভবাণী যাওয়া হবে কিনা,তিনি জান্‌তে এসেছিলেন। আমরা তখনই যাত্রা ক'রছি দেখে একটু ক্ষুণ্ণ হ'লেন। কিন্তু অনাহারে অত বেলায় যাওয়া অসম্ভব জানিয়ে আমরা যাত্রা করবার সঙ্কল্প ক'রলাম। তিনি রেশমের কারখানার কর্ম্মচারী. সেখানে হাজিরা না দিয়ে তখনই আমাদের সঙ্গে যেতে পারবেন না ব'লে একটু ক্ষুণ্ণ ম'নে একখানি ভাল প্রথম শ্রেণীর টঙ্গা ভাড়া ক'রে দিলেন। যাওয়া-আসা চাব টাকা, খুব সস্তা হ'লো। আমরা যাচাই ক'রে দেখেছি—পাচ টাকার কম হয় না। যাহা হোক আমরা ক্ষীবভবাণী যাত্রা ক'রলাম। শ্রীনগর হ'তে ক্ষীরভবাণী ষোল মাইল, বাস্তা আদৌ ভাল নহে, কিছুদুর ভাল পাকা রাস্তা, পরে কাঁচা—অত্যন্ত খারাপ। বৃষ্টির সময় যাওয়া উচিত নয়, বড় কষ্ট হয়। রাস্তা হরি পর্ব্বতের পাশ দিয়া। সহবেব বাহিরে পর্ব্বতেব গায়ে ও পর্ব্বতের কোলে কোলে অনেক আঙ্গুরের বাগান ও আপেলের বাগান দেখা গেল। আমরা এই সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক্ষীরভবাণীর দিকে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লাম।

গান্ধার বল

শ্রীনগর হ'তে ক্ষীরভবাণীর রাস্তা গান্ধার বলের ভিতর দিয়ে। গান্ধার বল শ্রীনগর হ'তে তেরো মাইল, আমরা গান্ধার বলে এসে উপস্থিত হ'লাম। এখানে পৌঁছিবা মাত্র জল-সিক্ত স্নিগ্ধ শীতল বাতাস গায়ে এসে লাগ্‌লো, শরীর স্নিগ্ধ হ'য়ে গেলো। এই স্থানটী বহু বৃক্ষ-শোভিত ছায়া-শীতল প্রান্তর। পর্ব্বত-নিঃসৃতা বহু স্রোতস্বতী এখানে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হ'যেছে। জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা। বরফের পর্ব্বত খুব নিকটেই। প্রায় চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশ্রেণী প্রাচীরের মত শোভা পাচ্ছে। স্থানটীর নাম গান্ধার বল। বড় সুন্দর ও শীতল জায়গা। জনমানব পরিশূন্য।

শীতল তুষাররাশি উচ্চ শৃঙ্গে ধরি—
শোভিছে পর্ব্বতকুল মহিমা বিস্তারি!
নিম্নে শোভে নির্ঝরিণী রজতের প্রায়—
গান্ধারের বুক বাহি খরবেগে ধায়;
স্বভাবে সুন্দর, হেন মনোরম দেশে—
ক্রমে প্রবেশিনু মোরা পর্য্যটক-বেশে।
সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ বয়—
পরশি জুড়ায় কায়, ক্লান্তি দূর হয়।
বিজনী করিয়া সিক্ত তুষারের জলে,
কে যেন ব্যজন করে থাকি অন্তরালে!
শরীর শীতল স্নিগ্ধ প্রফুল্লিত বেশ—
মুগ্ধ নেত্রে হেরি শোভা গান্ধার প্রদেশ।
যে দিকে ফিরাই আঁখি তুষার প্রাচীর—
গগন চুম্বিতে যেন তুলিয়াছে শির!

প’ড়েছে তপন-প্রভা তুহিনের গায়,
উজ্জ্বলিত রূপরাশি বিগলিয়া যায়।
গলিত তুষার কত পর্ব্বতের গায়—
কল্ কল্ শব্দে কিবা খেলিয়া বেড়ায়!
ঝরণার বারিরূপে কলরব করি—
কত রূপে পড়ে, আহা কত ভঙ্গি ধরি!
শতধা তটিনী-রূপে নামিয়া ধরায়—
বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কিবা ছুটিয়া বেড়ায়!
নব দূর্ব্বাদল শোভা প্রান্তর ব্যাপিয়া,—
তারি বুকে শত মুখে যেতেছে ছুটিয়া!
ফণির উদ্ধত ফণা ভঙ্গি আঁকা বাঁকা,
রূপের মাধুরী কিবা কত ভাব-মাখা!
এ যেন বসুধা-বুকে শতনরি হার—
মখমল বস্ত্র ’পরি তুলেছে বাহার!
চুম্বিয়া ধরণীতল যেতেছে ছুটিয়া,
পথি-পার্শ্বে স্রোতস্বতী, আনন্দে মাতিয়া!
উছলিত শতস্থানে শতমুখি-ধারা—
শতরূপা দ্রবময়ী তিতে বসুন্ধরা!
কল্ কল্ ছল্ ছল্ কিনি কিনি গান,
মোহঘোরে জাগে যেন স্বপনের তান!
কিবা সচঞ্চল গতি উদ্দীপনা মাখা,
সাধ যায় উড়ি সাথে যদি পাই পাখা!
নিম্নপথে কৃষি-ক্ষেত্রে যায় লুকাইয়া,
ইচ্ছা হয় ছুটে গিয়া ধরি আগুলিয়া।

যেমন বালিকা-কালে ছুটাছুটি করি,
খেলিতাম আঙ্গিনায় পিতৃদেবে ঘিরি।
ইহারা তেমনি যেন চেনারের তলে,
সুখময় পিতৃ-অঙ্কে ছুটাছুটি খেলে।
জাগে আজি সেই স্মৃতি বাল্য খেলা মম,
আনন্দে ভরিল প্রাণ কিবা মনোরম!
দীর্ঘতর তরুবর সুন্দর চেনার,
প্রান্তরের শোভা কত করিয়া বিস্তার!
তুহিন শীতল বায়ু দিগন্তে ছড়ায়,
স্বন্ স্বন্ গীতি-গানে শ্রবণ জুড়ায়।
বামে শোভে মনোহর কৃষি-ক্ষেত্রগুলি,
ফুলে গন্ধে পরিপূর্ণ গুঞ্জরয়ে অলি।
বুল বুল চন্দনা শ্যামা দোয়েল পাপিয়া,
কেহ করে গান, কেহ উঠে শিশ দিয়া!
কোথায় ভরাট ক্ষেত্রে কুসুমের রাশি,
অপূর্ব্ব হিন্দোল খায় ছড়াইয়া হাসি।
বর্ণের বিচিত্র বিভা বিভাসি চৌদিকে,
আলোকিত করিয়াছে অন্তর পুলকে।
ভূমিচর জীব হেথা অতি সুদুর্লভ,
ক্বচিৎ পথিক মিলে, ক্বচিৎ কৃষক।
বস্ত্রহীন, টুপি শিরে কৃষকের জাতি—
অভিনব দেশে হেরি অপূর্ব্ব মূরতি।
তুহিন গান্ধার বলে হেন মূর্ত্তি দেখি,
সরমে মরমে মরি মুদে এল আঁখি!

শীহরণ আসে কায়ে হেরি জলা-ভূমি,
অশরীরী করে বাস হেন অনুমানি।
রমণীয় দেশ—অতি রমণীয় শোভা,
শান্তিময় সুশীতল অতি মনোলোভা।
এত সুখে সুখ নাই, কল্পনা সুন্দরী—
মনেরে আঁকড়ি ধরি ছুটে জলাপরি।
কখন গমের শিরে নাচায় তাহারে,
পরম সন্তোষ হই হেরিলে যাহারে।
কখন ফুলের মাঝে হাসিয়া আকুল,
অধরে নয়নে তার রাশি রাশি ফুল;
কখন স্রোতের মুখে চ'লেছে ভাসিয়া,
কখন বা হেরি আসে প্রান্তর বাহিয়া,—
কখন পর্ব্বত-শিরে মেঘের উপরি.
বসিয়া আপন মনে বাজায় বাঁশরী,—
কখন বীণাটি ল'য়ে তটিনীর তীরে,
মধুর ঝঙ্কার তোলে কাঁপায়ে অম্বরে,—
কল্পনে, কল্পনে—তোমা করি নমস্কার—
জ্বালার সংসারে তুমি প্রলেপ আমার!

আমরা গান্ধার বলে অবতরণ ক'রে এক চেনার বৃক্ষতলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে পুনরায় ক্ষীর ভবাণীর উদ্দেশ্যে রওনা হ'লাম। এখান হ'তে ক্ষীর ভবানী তিন মাইল। রাস্তা কাঁচা এবং অত্যন্ত খারাপ।

ক্ষীর ভবাণী

প্রায় তিন ঘণ্টা পরে আমরা ক্ষীর ভবাণীতে উপস্থিত হ'লাম। একটি ছোট বাজারের মত জায়গায় গিয়ে টঙ্গার গতি সংযত হ'লো। জায়গাটী নির্জ্জন পাড়া গাঁয়ের মত। একটি বড নদী ব'হে যাচ্চে, নদীর উপর একটি সেতু। আমরা সেই খানে অবতরণ ক'রলাম। টঙ্গা-ওয়ালা ব'লে দিলে, এই সেতুর ওপারে গেলেই ক্ষীর ভবাণীর দেবালয়ে পৌছে যাবেন। কতদূরে, কোন্ পথে, কার সঙ্গে যাব—ভাব্তে ভাব্তে টিফিন বক্সগুলি নিয়ে দেবালয়েব উদ্দেশ্যে চ'ল্লাম। সেতুর পর-পারে তিন চার খানি নৌকা বা ভড় দাঁড়িয়ে আছে, এই সকল নৌকায় নানা রকম শুষ্ক শক্সী সাজান রয়েছে। দেখ্লে মনে হয়, এটি গ্রামের ছোট খাট একটি বাজার। আঁটা টুপি পরা গুটি কতক মুসলমান পুরুষ এবং কাশ্মীরী পোষাক-পরা দু'চারটী স্ত্রীলোক র'য়েছে। জন দুই লোক আমাদের সঙ্গ নিলে। আমাদের সুবিধা হ'লো। সেই লোক দু'টী বারংবার জিজ্ঞাসা ক'রছিল—'দুধ কত চাই?' কিন্তু আমাদের অজ্ঞতা বশতঃ 'দুধ চাই না' জানালেম। কিন্তু এর জন্য পরে আমাদের পস্তাতে হ'য়েছিল। দু'পাশে একটু একটু ঝোপ ঝোপ জঙ্গল ফেলে চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে মন্দিরের গেটে এসে উপস্থিত হ'লেম।

পূর্ব্বোক্ত নদীটি মন্দিরের সীমানার চতুর্দ্দিক দিয়ে ঘুরে গিয়েছে। এখানেও আর একটী সেতু পার হ'য়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রলাম। স্থানটী বড় বড় চেনার বৃক্ষের ছায়ায় সমাচ্ছন্ন একটী ছোট দ্বীপ। নদী নিতান্ত

ছোট নয়, গভীর জল একটু ঘোলা। ইহাতে ছোট বড় বিস্তর মাছ বেড়াচ্চে, বোট শিকারা এবং ছোট ছোট ডঙ প্রভৃতিও দু'চার খানা রয়েছে। দেখ্‌লাম নদীর পর-পারে বনের মধ্যে থেকে দু'চার খানা ঘর উঁকি মারছে। মনে হ'লো—পিছনে গ্রাম আছে। মেয়েরা ছোট ছোট নৌকা ক'রে ময়লা জঞ্জাল প্রভৃতি নিয়ে যাচ্চে, বোধ হয় দূরে স্রোতের মুখে ফেলবে—অথবা ক্ষেত্রে সার রূপে ব্যবহার ক'রবে। ৺দেবী দর্শনের জন্য কেহ কেহ শ্রীনগর হ'তে এই জল-পথে শিকারায় এসে থাকেন, কিন্তু তাহাতে দু'দিন সময় লাগে এবং ব্যয়ও ১৮।২০৲টাকা হয়!

সেতুর পরেই দক্ষিণে তিন চার খানা চালা ঘর, বামে নদীর ঘাট, সোপানাবলী পাথরের দ্বারা নির্ম্মিত। ঘাটের উপরেই প্রকাণ্ড একটী চেনার গাছ, বেদীর আকারে বাঁধান। এই স্থানে আমরা জুতা মোজা খুলে টিফিন বক্সগুলি রেখে নদীতে হাত-মুখ ধুয়ে দেবী-দর্শন ক'র্‌তে গেলাম। একজন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ যুবক এসে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, 'মিঠাই পুরি কিছু প্রস্তুত ক'র্‌তে হবে কি না?' অজ্ঞতা বশতঃ এখানেও 'কিছু চাইনা' ব'লে দিলাম। বলা বাহুল্য, নিজেদের খাবারের জন্য ম'নে ক'রে-ছিলাম। পূজার কোনও কিছু চাই কি না,—দুধ চাই কি না?—প্রশ্নের উত্তরে ব'ললাম—'পূজার জন্য যাহা কিছু দরকার—ষোল আনা অর্থাৎ এক টাকার মধ্যে গুছাইয়া দাও। কিন্তু পরে এর জন্যও আমাদের আপ্‌-শোষ হ'য়েছিল। আমরা জিজ্ঞাসা ক'রলাম, দেবীর মন্দির কোথায়? এবং পূজারী কে? একজনকে দেখিয়ে দিলে, আমরা বুঝতে পারলাম না, একটু এগিয়ে গেলাম,—দেখলাম একটী চেনার গাছের তলায় দু' খানি ঘর, সেখানে একজন কাশ্মীরী পণ্ডিত ব'সে আছেন। ম'নে ক'র্‌লেম ইনিই পূজারী। কিন্তু এখানেও যথেষ্ট দোকানদারী আছে—এই ব্যক্তি দোকানী। আমরা পূজারী জ্ঞানে তাঁকে ব'ললেম যে, এর

টাকার মধ্যে পূজার যাবতীয় দ্রব্য গুছিয়ে দিন। এই ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত যুবককে হুকুম দিলেন। ঐ স্থানে একটী মুসলমান ব'সে ছিল, সে আমাদের ব'ল্লে,'আপনাদের দ্রব্যগুলি এই স্থানে ল'য়ে আসুন। এখানে চোরের ভয় আছে, আমি এখানকার চৌকিদার।' তখন আমরা জিনিষ গুলি এই দোকানে এনে রাখ্‌লেম।

এই স্থান হ'তে আর একটী কাশ্মীরী পণ্ডিত আমাদের আহ্বান ক'রে নিয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে একটু অগ্রসর হ'য়ে দেখ্‌লেম—রেলিং-ঘেরা একটী বৃহৎ প্রাঙ্গন। তারই মধ্যস্থলে আর একটী রেলিং-ঘেরা বাঁধান প্রকাণ্ড চৌবাচ্ছা—ঘৃত, দুগ্ধ, ফুল পরিপূর্ণ পঙ্কিল জল। এই জলের ঠিক মধ্যস্থলে একটী ছোট শ্বেত পাথরের বেদীর উপর শ্বেত পাথরের একটী ছোট মন্দির। এই মন্দিরের মধ্যে মায়ের ঘাঘরা পরা অষ্টভুজা কালী-মূর্ত্তি স্থাপিত। শিবের উপর নয়, পাশে একটী মুকুট। এই জলই ক্ষীরভবানী বা ক্ষীরোদ সাগর নামে কথিত। ইহা একটী উৎস। এই জলের বর্ণ মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন হ'য়ে যায়। এখানকার লোকেরা বলে, মায়ের যত রকম মূর্ত্তি, এই জল তত রকম বর্ণ পরিবর্ত্তন ক'রে থাকে। জ্যৈষ্ঠ শুক্লাষ্টমীতে এখানে বৃহৎ মেলা বসে এবং বহু সাধু সন্ন্যাসী, গৃহী, ধনী ও দরিদ্র প্রভৃতি নানা রকম লোকের সমাগম হয়। কথিত আছে, এই দেবী রাবণ-বধের পর লঙ্কায় গুপ্ত হ'য়ে এখানে এসে প্রকট হ'য়েছিলেন, ইনিই রাবণের ইষ্টদেবী।

এক সময়ে কাশ্মীরে 'ইউ সুপ সাহিচক্' নামে এক মুসলমান বাদসা ছিলেন। তিনি একবার এখানে এসে এখানকার পুজারীকে বলেন, 'আমাকে তোমাদের দেবীর প্রসাদ দাও।' পূজারী বাদসাকে অপেক্ষা ক'রতে বলেন এবং আপনি গিয়া জপে উপবিষ্ট হন। জপ ক'রতে ক'রতে নিদ্রামগ্ন হন। পরে স্বপ্ন পান—যেন দেবী দর্শন দিয়ে ব'লচেন,

'পণ্ডিত, বাদসাকে উত্তরীয় বিছাইয়া ধ'রতে বল।' স্বপ্নোত্থিত ব্রাহ্মণ তটস্থ হ'য়ে বাদসাকে গিয়ে বলেন, 'বাদসা, উত্তরীয় বিছিয়ে ধরুন,—প্রসাদ পাবেন।' বাদসা উত্তরীয় ধ'রলে, ঐ উৎসের জল ফুলে উঠে বাদসার চাদরে গিয়ে পতিত হ'লো এবং দেখা গেল যে মেওয়া ফল এবং মিষ্টান্নাদি ঐ চাদরে পতিত র'য়েছে।

এই ক্ষীরভবাণীর নিকটে মুসলমানের এক মসজিদ আছে। বাদসা ঐ মসজিদে গিয়ে মোল্লাকে বলেন, 'এই দেখ হিন্দুর দেবতা প্রসাদ দিয়েছেন,—তোমার দেবতার প্রসাদ আমায় এনে দাও।' মোল্লা প্রসাদ দিতে না পারায়, বাদসা ঐ মসজিদের সেবা বন্ধ ক'রে দেন। তদবধি ঐ মসজিদ পতিত অবস্থায় আছে। ঐ মসজিদের কাছেই আমরা টঙ্গা হ'তে অবতরণ ক'রেছিলাম।

আর একবার ১৯১৬ খৃঃঅব্দে কাশ্মীরের মহারাজা প্রতাপসিংহ ঐ উৎসের তলায় কি আছে দেখ্‌বার জন্য ব্রাহ্মণগণের দ্বারা ঐ জল সমস্ত তুলে ফেলে দেবার ব্যবস্থা করেন। এক মাস যাবৎ ক্রমান্বয়ে জল তুলে ফেলে দেবার পর তার ভিতর একটী মন্দির দেখ্‌তে পান। ঐ মন্দিরের অভ্যন্তরে বহু সংখ্যক পাথরের দেব-দেবীর মূর্ত্তি অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেদীর উপর বসান এবং রন্ধনোপযোগী কতক গুলি পাথরের বাসন রয়েছে। ঐ সকল মূর্ত্তির ভিতর থেকে দু'টী দেবী-মূর্ত্তি উপরে উঠান হয় এবং ঐ মূর্ত্তির ফটোও লওয়া হয়। মূর্ত্তি দু'টী মন্দিরের উপরে রাখা হ'য়েছিল। পরে ঐ দিন রাত্রে মূর্ত্তি দু'টী অন্তর্দ্ধান হ'য়ে যান এবং পূজারী স্বপ্নাদেশ পান। দেবী ব'লছেন, 'আমি এখানে থাকবো না, ভিতরে চ'ললেম।' ঐ দিন দেখা গেল, যে উৎস এক মাসে শুকিয়ে ছিল, এক দিনে তাহা পরিপূর্ণ হ'য়ে গিয়েছে। এর পর জয়পুর হ'তে মন্দির এবং দেবী মূর্ত্তি প্রস্তুত ক'রে এনে ঐ কুণ্ডের মধ্যে স্থাপনা করা

হ'য়েছে। এই স্থানে বলা আবশ্যক, শঙ্করাচার্য্য পর্ব্বতের শিবমন্দির হ'তে সমস্ত কাশ্মীরের মধ্যে যত মন্দির, দেবালয় ও তীর্থ স্থানাদি আছে, তৎসমুদায়ের পূজার এবং সেবার সমস্ত ব্যয়ভার রাজ-সরকার হ'তে ব্যয়িত হয়। ঐ কুণ্ডের এক পার্শ্বে একটী চেনার গাছের নীচে একটী ছোট মন্দির,—মধ্যে শিবলিঙ্গ। এই দ্বীপের উপর আরও দু'চার খানা ঘর র'য়েছে। বহু চেনার বৃক্ষে স্থানটী পরিপূর্ণ।

আমরা পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতের সঙ্গে রেলিং-ঘেরা কুণ্ডের ধারে গেলাম। এখানে স্থূলকায় আর একজন পণ্ডিত ব'সে আছেন। এখন বুঝ্‌লেম—ইনিই পূজারি। পূর্ব্বে আমাদের ভুল হ'য়েছিল। ইনি আমাদের আসন দেখিয়ে দিয়ে ব'সতে ব'ললেন। পূজার দ্রব্যাদিও এসে উপস্থিত। দেখ্‌লাম, একটী থালার উপর চারটী চিনির রোলা, চারটী শুক্‌নো গাঁদা ফুলের পাপড়ি, একটু গন্ধ, দু'টী ধুপ এবং একটী ঘৃতের প্রদীপ। বস্ত্রের পরিবর্ত্তে, রাঙ্গা সাদা মিশান উপবীতের আকারে সুতা এক ছড়ি। ইহাই ষোল আনার পূজা। পুরোহিত বল্লেন, 'এই ক্ষীরোদ সাগর—দুধ, ক্ষীর ঢেলে দিতে হয়, সঙ্গে আছে কি না?' তখন আমরা বুঝ্‌তে পারলেম, কেন সে ব্যক্তি কত দুধের প্রয়োজন জান্‌বার জন্য আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল, এবং পুরি মিঠাই চাই কি না, কেন জিজ্ঞাসা ক'রেছিল? আমরাত তাহাদের সকল কথা ভাল বুঝ্‌তে পারি নাই। (বলা বাহুল্য এখানে বাঙ্গালা ভাষা বা সাধারণ হিন্দি চলে না) উনি বল'লেন, পূজার জন্য যা কিছু দরকার, সকল দ্রব্যই তো আন্‌তে বলা হ'য়েছে। কিন্তু ব'ললে কি হয়, আমরা সকল দ্রব্য পেলাম না, কেবল দুধ পেলাম। পণ্ডিত শিবজী সঙ্গে থাক্‌লে কোন বিশৃঙ্খলই হ'ত না। যাহা হোক যথাসম্ভব পূজার কার্য্য সম্পন্ন করা গেল। এখানে ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হয়, তজ্জন্য ভোজনের দরুণ পুরোহিতের হাতে কিছু

দিয়ে নদীব ধারে বাঁধান চেনার গাছেব তলায় এসে ব'সে জল যোগাদি সেরে নিলাম। এই নদীতে স্নান ক'বে মায়ের পূজা দিতে হয়। এই জলে কেহই কুলি করে না, উচ্ছিষ্ট জল উপরেই ফেলে দেয়। কিন্তু উচ্ছিষ্ট বাসন ঐ জলেই ধোয়া হ'চ্ছে,—তবে দেখ্‌লাম, প্রথম বারের ধোয়া জল উপরেই ফেলে দেয়।

মানস বল

আমরা দেবীকে প্রণাম ক'রে, চৌকিদার প্রভৃতি দু'এক জনকে কিছু কিছু বকসিস্ দিয়ে এখান হ'তে বেরুলাম এবং টঙ্গার কাছে এসে উপস্থিত হ'লাম। এখান হ'তে মানসবল দেখিয়ে নে যাবার জন্য টঙ্গাওয়ালার সঙ্গে অতিরিক্ত দু'টাকায় চুক্তি ক'রে টঙ্গায় উঠে ব'স্‌লাম। টঙ্গা মানসবল অভিমুখে রওনা হ'লো। এখান হ'তে মানস বল আট মাইল। একই ধরণের পথ পর্ব্বতের গা দিয়ে চলে গেছে। মধ্যে মধ্যে রাস্তা খুব চড়াই উৎরাই এবং খারাপ। মাঝে মাঝে পর্ব্বতের গায়ে পাহাড়ী কৃষক কুলের দু' এক খানা বাড়ী দেখা যাচ্ছে। এই দিকে অনেক আঙ্গুর ও আপেলের গাছ দেখ্‌লাম। এই ভাবে শ্রীনগর হ'তে প্রায় তেইশ চব্বিশ মাইল দূরে গিয়ে দেখ্‌লাম—সম্মুখেই অনতিউচ্চ পর্ব্বতের উপর দিয়ে এই পথ পার হ'য়ে চ'লে গেছে। বুঝ্‌লেম, আমরা পর্ব্বতের কোলে কোলে এসে অনেক চড়াইএ উঠেছি। গাড়ী এই পথ দিয়ে পর্ব্বতের ওপারে গিয়ে হাজির হ'লো। হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হ'য়ে নৈসর্গিক দৃশ্য দর্শনে আমরা চমৎকৃত হ'য়ে গেলেম। যাহা স্বপ্নেও দেখি নাই, এমন একটা দৃশ্য নয়নের উপর ভেসে উঠ্‌ল। ক্রমবিবর্দ্ধিত পর্ব্বতের অন্তরালে পৃথিবীর বুকের উপর যে এমন একটা জিনিষ থাকতে পারে—সে কথা আমরা বাঙ্গলার লোক—অথবা আমি নারী, একেবারেই ভাব্‌তে পারি নাই। এ—কি—এ! একি দৃশ্য?—না এক খানি মনোরম বিলাতি প্রাকৃতিক ছবি? অথবা ছবিতেও এত সুন্দর মনোরম দৃশ্য অঙ্কিত হ'তে পারে না। যাহা দেখ্‌লাম, তাহা লেখনীতে অথবা কল্পনাতে আনা যায় না! মনে

হ'লো—যদি এ জিনিষ না দেখ্‌তাম, তা' হ'লে কাশ্মীরের একটী রমণীয় দৃশ্য আমাদের চক্ষুর অন্তরালে থেকে যেত। নয়ন সার্থক হ'লো, মন মুগ্ধ হ'য়ে গেলো। অপনা আপনি মুখ হ'তে বাহির হ'লো—'কি সুন্দর।'

দেখ্‌লাম—প্রায় আধ মাইল দূরে নিম্নদিকে হেলান পর্ব্বত-বেষ্টিত নীল কাচ। দিগন্ত-প্রসারিত স্বচ্ছ জলরাশি। প্রকৃতির অতি সঙ্গোপন স্থানে সঙ্গোপনে ব'সে ব'সে নিপুণ শিল্পী সযতনে এই চিত্র অঙ্কিত ক'রে যেন পর্ব্বতে বেষ্টিত ক'রে রেখে দিয়েছেন। কুমুদ, কহ্লার, সরোজ প্রভৃতি এই জলরাশির উপর ছায়া ফেলে, কোথ ও কালো, কোথাও সাদা এবং কোথাও বা সবুজের বর্ণ নীলের সঙ্গে মিশে গিয়ে গাঢ় বর্ণের সৃষ্টি ক'রেছে। এই জলরাশির উপর শ্বেত রাজ হংসকুল দলে দলে যথেচ্ছা বিহার ক'রে বেড়াচ্চে। সবুজ মখ্‌মলের মত তৃণাচ্ছন্ন তীরে বলাকাকুল ঘাড় বেঁকিয়ে পায়ে পায়ে ধীরে ধীরে চ'রে বেড়াচ্চে। এত বড় কূল কিনারা হারা জলাশয়ের এক প্রান্তে অসংকীর্ণ একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম অতিশয় অভিনব দেখাচ্ছিল। এই স্থানে এই বক ও হংসকুল ব্যতীত আর কোনও প্রাণীর দেখা নাই। এই জনহীন স্থানে কোনও রকম ভয়ের সঞ্চার হয় না—বরং প্রাণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়। দূরে—বহুদূরে পর্ব্বতের পর পর্ব্বতশ্রেণীর পশ্চাতে গগনস্পর্শী মস্তক সমুন্নত ক'রে বরফের পর্ব্বত দাঁড়িয়ে আছে। সূর্য্য-কিরণ জলাশয়ে ও দূরস্থিত বরফের উপর প'ড়ে স্থানে স্থানে নানা বর্ণের সৃষ্টি ক'রে এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ ক'রেছে। একটী জঙ্গল পর্য্যন্ত দেখা যায় না, কেবল মাঝে মাঝে চেনার বৃক্ষ যেন যোগী-ঋষিদের আশ্রয় দান কর্‌বার জন্য বহুদূর পর্য্যন্ত ছায়া বিস্তার ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয়, এই স্থানে বুঝি গন্ধর্ব্বকুল বিহার ক'রতে এসে থাকেন। সিন্ধুনদের এক শাখা এই মানসবল হ'তে বাহির হ'য়ে সাম্বল গ্রামের ধারে ঝিলম নদীতে এসে মিলিত হ'য়েছে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কখনও কখনও এখানে তাঁবু ফেলে বাস করেন। আমরা মুগ্ধ হ'য়ে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম।

টঙ্গাওয়ালা আমাদের পায়দলে পর্ব্বতের ও-পারে আস্‌তে ব'লে, টঙ্গার অশ্বের মুখ ধ'রে অত্যন্ত চড়াইয়ের পথ অতিক্রম ক'রে পর্ব্বতের ও-পারে টঙ্গা ল'য়ে চ'লে গেল। এখন এখানে আমরা দু'জন ব্যতীত আর একটীও প্রাণী নাই। ইচ্ছা হ'লো—যুগ যুগান্তর এই স্থানে তাঁহার সহিত একত্রে বাস করি—আর দেশে ফিরে কাজ নাই। কিন্তু মায়ার এমনই মহিমা—কার সাধ্য সে হাত এড়াইয়া চলে। এক খানি কচি মুখ মনের কোণে উঁকি দিয়ে যেন 'দাদু মা' ব'লে ডেকে উঠ্‌লো; সঙ্গে সঙ্গে আর এক খানি মায়া-কাতর যুবতীর মুখ যেন মুখ পানে চেয়ে দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের সঙ্গে চোখের জল মিশিয়ে দেখা দিয়ে গেল। আর এক যুবক বালকের মুখ, চোখের জলের সঙ্গে অতি আদরের সুরে এখানে বাস-সঙ্কল্পের মূলে বাধা দিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এ কখানি স্নেহময়ী কল্যাণী জগদ্ধাত্রী প্রতিমা অতি কাতর দৃষ্টি নিয়ে দেখা দিয়ে নিষেধের ইঙ্গিত ক'রে গেলেন; অতএব আমিও অস্থির হ'লেম। তখন আমরা উভয়ে (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ের হাত অবলম্বন স্বরূপ ধারণ ক'রে সর্ট কার্টের পথে চড়ায়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লেম। পর্ব্বত পার হ'য়ে ও-পারে গিয়ে টঙ্গায় উঠ্‌ব। তখন সূর্য্য পশ্চিম গগনে ঢ'লে প'ড়েছে। সন্ধ্যা হ'লে এখানে কি রকম আনন্দ হবে, একবার উভয়ে দাঁড়িয়ে—একবার পর্ব্বত ও একবার জলাশয়ের দিকে চেয়ে সেটা অনুভব করবার চেষ্টা ক'রলেম,—প্রাণ কেঁপে উঠ্‌লো। মহাদেও পর্ব্বত-শিখরে ভেড়া ও ফেরুপালের বিকট কাতর চীৎকারে কর্ণ বধির হ'য়ে আস্‌ছিল, এবং প্রাণে দারুণ আতঙ্কের সঞ্চার হ'চ্ছিল। তথাপি প্রকৃতির এই স্তব্ধ গম্ভীর মনোমুগ্ধকর মূর্ত্তি একবার প্রাণ ভ'রে দেখে নিলাম, এবং এ দৃশ্য আর যে দেখ্‌তে পাব না,

এ জন্য মনে আক্ষেপের সঞ্চার হ'চ্ছিল। দু'বার পা পিছিয়ে পড়ে,একবার এগিয়ে যায়। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির এই লাবণ্যময়ী রূপ দর্শনের পিপাসা মিটিয়ে নিতে লাগ্‌লেম। যদি প্রিয়তমা কন্যা বহুদূর দেশে, পতির কর্ম্মস্থলে পতির সহিত যাত্রা করে,—আর বহুদিবস তার দর্শন-আশা না থাকে, তবে প্রিয়-বিরহে মনের যে অবস্থা হয়, এই স্থানটীর অদর্শন-জনিত কল্পিত বিরহের তাড়নায় আমাদের মনের ঠিক সেইরূপ অবস্থা হ'য়ে এলো। ধন্য মায়ার খেলা! যাহা হোক, আমরা দু'জনে দু'জনের কর অবলম্বনে নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে পিচ্ছিল পথে চড়াইয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লেম। যদি একজন পতিত হয়, তবে আর একজনের পতন-সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবী। আমারই পা বেশী পিছ্‌লে যাচ্ছিল। উনি দৃঢ় ভাবে আমার হাত ধ'রেছিলেন, পাছে আমি পড়ি—এই ভয়ে। পাঞ্চালী দ্রৌপদী পতির সঙ্গে এইভাবেই পার্ব্বত্য পথে স্বর্গ যাত্রা ক'রেছিলেন এবং এমনই নৈসর্গিক দৃশ্য—পতিগণের সহিত দর্শন এবং আলোচনার দ্বারা আস্বাদন ক'র্‌তে ক'র্‌তে অকস্মাৎ পতিত হ'য়ে প্রাণত্যাগ ক'রেছিলেন। আজ আমার যদি তাই হয়,—তা' হ'লে এই পতি-দেবতা আমার—এই খানে অজ-বিলাপের সৃষ্টি ক'র্‌বেন—অথবা জিতেন্দ্রিয় যুধিষ্ঠিরের মত পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাবেন?—সেই দৃশ্য দেখ্‌বার জন্য কৌতুহলে আমার চিত্ত একবার ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু মায়ার কি মোহিনী খেলা! সর্ব্বান্তঃকরণে মৃত্যুকেও তো চাইতে পার্‌লেম না,—বরঞ্চ এখানে আমার মৃত্যু হ'লে স্বামীর কি উপায় হবে, এই চিন্তাই যেন ম'নে জেগে উঠ্‌ছিল। স্বামীর ভালবাসার পরীক্ষা গ্রহণ করবার জন্য স্ত্রী-চিত্ত এতই অধীর যে, সে সুযোগ উপস্থিত হ'লে শত জ্বালাতেও রমণী কৌতুহলী হয়। অতঃপর এ চিন্তা মনের মধ্যে গোপন রেখে হর্ষোৎফুল্ল মুখে প্রীতিময় বাক্য

বিনিময় ক'র্‌তে ক'র্‌তে দু'জনে মিলিটাবি পাদক্ষেপে আস্তে-ব্যস্তে হাঁপাতে হাঁপাতে নূতন নাটকের সৃষ্টি ক'বে টঙ্গায় এসে উঠ্‌লাম।

এবার শীঘ্র ডেরায় পৌছাতে পার্‌লে হয়। কিন্তু প্রকৃতি দেবী তাঁর অনন্তরূপের নব নব আবরণ উন্মোচন ক'রে ধ'র্‌ছেন। মায়ের এই দিগ্বসনা রূপ কোন্ নিষ্ঠুর নাস্তিক আছে যে, তা দেখে চোখ মুদে থাক্‌তে পারে? মা এবার তাঁর অন্ধকার ঘরের এক প্রান্তে উজ্জল দীপ জ্বেলে দিয়েছেন। পূর্ব্বদিক অন্ধকার হ'য়ে এসেছে,—এবং পশ্চিমের অন্ধকার প্রদেশ জগৎগুরুর কৃপাকণায় লোহিতাভ ধারণ ক'রেছে। জ্ঞানময় সবিতৃ দেবের উজ্জ্বল কিরণে গিরি-গহ্বর প্রদেশ পর্য্যন্ত আলোকিত হ'য়েছে। শুভ্র জ্যোতিঃসম্পন্ন দুগ্ধ ফেননিভ নির্ম্মলান্তঃকরণ হিম-সমাচ্ছন্ন সাধক নগেন্দ্র, নভঃ ভেদ ক'রে পরমাত্মার উদ্দেশে ঊর্দ্ধশিরে অশ্রুজল রূপ শত শত নির্ঝরিণীর সৃষ্টি ক'রেছে, এবং তার সেই কমনীয় রূপরাশি, রাঙা রবির রক্ত আলোকের দীপ্ত ছটায় তিন দিক উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। কিসের সহিত ইহার তুলনা হ'তে পারে?—যেন রাবণ, তাঁর নীল জ্যোতিঃসম্পন্ন বিরাট নগ্ন দেহে দশ দিক শোভিত ক'রে, দশটি মস্তকে শুভ্র হীরক-দ্যুতি-জ্ঞানের মুকুট ধারণ ক'রে, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল শাসন এবং পালন ক'র্‌ছেন। আর ভক্ত রাবণের দশ বদনে ভক্তির উৎসাকার পুলকাশ্রু শত শত ধারায় নির্ঝরিণী স্বরূপ নীল অঙ্গ প্লাবিত করে নেমে আস্‌ছে, এবং সমস্ত বসুধাকে প্লাবিত ও উর্ব্বরা ক'রে প্রজা পালনে তৎপরা ক'রে রেখেছে।

আমরা মুগ্ধ চিত্তে এই সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে অগ্রসর হ'লেম। পথের আশে পাশে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত ঝরণার জলের কলতানে আর পাখীর গানে আমাদের বেশ আনন্দ হ'তে লাগ্‌লো। ক্রমে গান্ধারবল পার হ'য়ে এলাম, চারিদিকে ফুলের ছড়াছড়ি। পথের ধারে এক স্থানে

একটী চস্‌মা (স্প্রীং) একটী ঘরের মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় র'য়েছে। ঘরের দেওয়ালে দু'টী জানালা, তার মধ্য দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বেশ সুন্দর দেখা গেল, ঐ ঘরের মেঝের (অবশ্য মেঝে পাকা নয়) চার পাঁচ জায়গায় বস্‌ বস্‌ ক'রে নিয়ত জল উঠ্‌ছে। এই জল প্রায় চার হাত গভীর, কিন্তু এত স্বচ্ছ যে সেই আলো-আঁধারে ঘরের মধ্যেও তলার কুটিটা পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে; দেওয়াল-সংলগ্ন নল দিয়ে এই জল বাহিরে প'ড়ে ক্রমে ক্রমে প্রশস্ত হ'য়ে নদীর আকারে চ'লে গেছে। সুস্বাদু এবং হজমী ব'লে এই জল বিখ্যাত। আমরা অঞ্জলি অঞ্জলি ক'রে এই শীতল ও সুস্বাদু জল আকণ্ঠ পান ক'রলাম এবং সুরাই পূর্ণ ক'রে ভরে নিলাম। বলা বাহুল্য এই জল আন্‌বার জন্য শ্রীনগর হ'তে নূতন সুরাই নিয়ে গিয়েছিলাম। কাশ্মীর অঞ্চলে প্রায় সর্ব্বত্রই মাটীর নীচে জলস্তম্ভ, কিন্তু উপরে চস্‌মার আকারে দেখা যায়।

টঙ্গা শ্রীনগরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে হোটেলের দরজায় এসে উপস্থিত হ'লো। টঙ্গাওয়ালাকে, টঙ্গা ভাড়া ছ' টাকা এবং কিছু বক্‌সিস দিয়ে উপরে গেলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। একটু পরেই পণ্ডিতজী এলেন। ভদ্রলোক বহুক্ষণ আমাদের সহিত সদালাপে কাটিয়ে এবং পরদিন এগারটার সময় হারুয়ান, সালামারবাগ প্রভৃতি স্থানে যাবার বন্দোবস্ত ঠিক ক'রে ৺ ক্ষীর ভবাণীর প্রসাদ নিয়ে উঠে গেলেন। আমরাও হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম ক'রলাম। পরে যথাসময়ে আহারাদি সেরে ৺ ক্ষীর ভবাণী ও মানসবল সম্বন্ধে আলোচনা ও ঐ বিষয় লিপিবদ্ধ ক'রে যথাসময়ে নিদ্রিত হ'লেম।

হারুয়ান

পরদিন ২৭শে বৈশাখ, রবিবার আমরা হারুয়ান দেখ্‌তে চ'ল্‌লাম। বেলা এগারটার সময় পণ্ডিতজী এলেন। তাঁহার সঙ্গেই যাওয়া গেল। পথে পা দিয়েই দেখি পূর্ব্বদিনের টঙ্গাওয়ালা দাঁড়িয়ে। আমাদের দেখে আহ্বান ক'রলে, কিন্তু পণ্ডিতজী এ গাড়ী কিছুতেই মঞ্জুর ক'রলেন না, কারণ এই ঘোড়া পূর্ব্বদিনে অতিরিক্ত পরিশ্রম ক'রেছে, অন্যও অনেক পাল্লা দিতে হবে; সুতরাং আমরা আর এক খানি ভাল টঙ্গাতে উঠে রওনা হ'লাম। এ দিন পণ্ডিতজী তাঁহার বাড়ী হ'তে কিছু মাংস ও রুটী সঙ্গে নিয়েছিলেন এবং আমাদের দু'খানা কম্বল ও জলযোগের জন্য দু' একটা পাত্র লওয়া হ'য়েছিল—সালামারবাগে বিশ্রাম ও জলযোগ করবার জন্য।

হারুয়ান শ্রীনগর হ'তে তের মাইল। গুপকরার রোড দিয়ে ডাল-লেক ঘুরে আমরা চ'ললাম। ডাললেকের দু'টী গেট—ছোট ও বড়। ছোট গেট সম্বন্ধে কিংবদন্তী—এক ভক্ত চাষা প্রত্যহ ঐ গেটের উপর দিয়ে যাওয়া-আসা ক'র্‌তো। এক দিন শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুধাতুর চাষা সন্ধ্যা-কালে ঐ গেট পার হওয়ার সময় ৺ হর-পার্ব্বতীর দর্শন লাভ ক'রে কৃতার্থ হ'য়েছিল, এবং ঐ স্থানেই ধ্যান-যোগাবলম্বনে দেহ ত্যাগ ক'রে-ছিল। তদবধি ঐ গেট পবিত্র জ্ঞানে হিন্দুগণ দূর হ'তে দর্শন মাত্রে প্রণাম ক'রে থাকে। আমরা যেতে যেতে দেখ্‌লাম, সফেদা গাছ-শোভিত পথের ধারে স্বচ্ছ নীর বহু স্থান ব্যাপিয়া নদীর আকারে চ'লে যাচ্ছে। এই জল হারুয়ান হ'তে আস্‌ছে। সে দিন আকাশ পরিষ্কার ছিল, আমরা ক্রমে ক্রমে এই জলের কেন্দ্রস্থলে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। ইহাই হারু-য়ান বা হারবান হ্রদ। তিন দিকে উচ্চ পর্ব্বত-বেষ্টিত একটী অতি বিস্তৃত জলাশয়। এই জল অতি স্বচ্ছ ও সবুজ বর্ণ এবং অত্যন্ত গভীর। ইহার

দক্ষিণে ভীষণকায় মহাদেও পর্ব্বত, পূর্ব্বে ও উত্তরে অন্যান্য পর্ব্বতশ্রেণী এবং পশ্চিমে উচ্চ বাঁধ প্রাচীরের ন্যায় শোভা পাচ্চে। জল কূলে কূলে টল টল ক'রছে, এবং মহাদেও পর্ব্বতের গা দিয়ে পর্ব্বতের অভ্যন্তর প্রদেশে যেন চ'লে গেছে। মহাদেও পর্ব্বতের কোলে হারুয়ানের তীরে রেলিং দেওয়া রাস্তা চ'লে গিয়েছে। এই শৈলরাজি ভীষণ জঙ্গলবিশিষ্ট। বিষাক্ত সর্প, ব্যাঘ্র, ভল্লুক এবং নানা জাতীয় হরিণাদিতে পরিপূর্ণ। এই স্থানে মহারাজা স্বয়ং শিকার ক'রতে আসেন। স্থানটী অতি মনোরম। এখানে (হারুয়ানের তীরে উপরে পর্ব্বত-গাত্রে) মহারাজার ডাক বাঙ্গলা আছে। সুন্দর ছোট বাঙ্গলা—তিন ভাগে বিভক্ত। মহারাজার বাসের জন্য এক ভাগ, মধ্যে রন্ধনের জন্য এবং শেষের ভাগ লোক জনের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। সম্মুখে পর্ব্বতজাত পুষ্পের নানারূপ কেয়ারি করা বাগান। এ স্থানে বাগানের জন্য বিশেষ কষ্ট ক'রতে হয় না, সহজ জাত গোলাপ, করবী এবং বহুবিধ বন-কুসুমে স্থানটীকে আলো ক'রে রেখেছে। 'ডাকচিগাম্' উপত্যকা হ'তে জল এসে এই হারুয়ান হ্রদ পূর্ণ ক'রে রেখেছে এবং 'তানসেন মানসেন' ঝরণা হ'তে এই জল নেমেছে। এই ঝরণা খুব বড়। বাঁধের ধারে জলাশয়ের উপর জল পরিষ্কার করবার জন্য একটী ছোট ঘরের মধ্যে কল বসান হ'য়েছে। এখান হ'তে পাইপের সাহায্যে শ্রীনগরে জল সরবরাহ হয়।

বাঁধের পশ্চিম পারে দীর্ঘ প্রশস্ত একটী বাঁধান চত্বরে হারুয়ানের জল এসে পড়ছে। এই চত্বরে তিনটী গেট, তিন গেট দিয়ে তিন স্থানে এই জল পতিত হ'চ্ছে এবং এই চারি স্থানে ছোট ছোট জল-প্রপাতের সৃষ্টি ক'রেছে। তার স্নিগ্ধ গম্ভীর গর্জ্জন প্রায় দু'রশি দূর হ'তে শোনা যায়। এই স্থানে একলা থাকতে প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হয়।

ট্রাউট্ মাছ

আমরা এখান হ'তে ট্রাউট্ মাছ দেখ্‌তে গেলাম। হারুয়ান হ'তে ট্রাউট্ মাছ প্রায় তিন মাইল। বিস্তীর্ণ ময়দানের উপর বাঁধান নালা দিয়ে হারুয়ানের জল নিয়ে যাওয়া হ'য়েছে। দীর্ঘে প্রস্থে বহুদূরব্যাপী এইরূপ সরু সরু নালা চ'লে গিয়েছে। স্কট্‌ল্যাণ্ড হ'তে ট্রাউট্ মাছ এনে, এখানে তাহার চাষ করা হ'য়েছে। নালার উপর তারের জাল ঢাকা দিয়ে অতি যত্নে মাছগুলি রাখা হ'য়েছে, এবং নালার মধ্যে মধ্যে জালের বেড়া দিয়ে, মাছের অবাধ দূরগতি বন্ধ করা হ'য়েছে। অবশ্য রাজ-সরকার হ'তেই এই সব ব্যবস্থা। এখানে অসংখ্য মৎস্য র'য়েছে, এত মৎস্য পূর্ব্বে কখনও কোথাও দেখি নাই। অগভীর নালার মধ্যে স্বচ্ছ জলরাশির ভিতর মাছেদের যথেচ্ছা বিহার বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছিল। এই সব মৎস্য পালন কর্‌বার জন্য রাজ-সরকার হ'তে অনেক লোক নিযুক্ত আছে। দেখ্‌লাম, এক ব্যক্তি একটা নালার ধারে গাছতলায় ব'সে, মৎস্যদের খাদ্যের জন্য, বহু মৃত মৎস্য জড় ক'রে মাংসের মত টুকরা টুক্‌রা ক'রছিল। শিবজীর দ্বারায় উহাকে কিছু পয়সা দেওয়ায়, ঐ ব্যক্তি এক ভাঁড় মৎস্যের টুক্‌রা নিয়ে মুঠা মুঠা ক'রে স্থানে স্থানে ফেলে দিতে, ঐ গুলি খাবার জন্য মাছগুলি জল তোল-পাড় ক'রে লাফিয়ে উঠ্‌ল। দেখ্‌তে বেশ বাহার। হরিদ্বারের মহাসের মৎস্যের মত,—তবে এ সংখ্যায় অগণিত। মাছগুলি দেখ্‌তে বেশ সুশ্রী। বাঙ্গলা দেশের লেঠা মাছের মত অঙ্গ, কিন্তু রুই মাছের মত মাথা ও পাখ্‌নাবিশিষ্ট। ছোট বড় নানা রকম।

গুপ্তগঙ্গা

ট্রাউট্ মাছ দেখে গুপ্তগঙ্গা দর্শন ক'রতে গেলাম। ইহা একটা বহু পুরাতন তীর্থ। একটা চেনারবাগের মধ্যে, একটা জীর্ণ পুরাতন ঘরের ভিতর একটা ছোট চশমা। এই ঘরের মধ্যে জলের উপর শিবলিঙ্গ। এই লিঙ্গের পূজা ক'রতে হয়। এখানেও অনেক মাচ দেখ্‌লাম। ঘরের সাম্‌নেই একটা বাধা কুণ্ড, জল টল টল ক'রছে, এই জল ঘরের মধ্য দিয়ে এখানে প্রবাহিত হ'য়েছে। এই স্থানে পুরুষেরা স্নান করেন। ইহার একটু দূরে প্রাচীর ঘেরা আর একটা কুণ্ড—গুপ্তগঙ্গা এই স্থানেও প্রবাহিতা, কিন্তু উপরে কোনও চিহ্ন নাই। এখানে স্ত্রীলোকেরা স্নান করেন। সমস্ত স্থানটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এই জল স্পর্শ ক'রে আমরা এখান হ'তে বেরুলাম।

সালামার বাগ

গুপ্তগঙ্গার পর ছোট ছোট গ্রাম ও ধানের ক্ষেত ছাড়িয়ে, তিন মাইল দূরে, বিখ্যাত সালামারবাগে গিয়ে উপস্থিত হ'লেম। ইহা ডাল-লেকের ধারে। রাজ-পথের উপরেই সালামারের সুদৃশ্য বৃহৎ তোরণ-দ্বার। সালামার বাগে,—স্তরে স্তরে পাথরে নির্ম্মিত বাঁধাপথে, একটী প্রবাহমান নদী বা প্রশস্ত একটী সুন্দর নির্ঝর-বারি প্রবাহিতা। এই বারির মধ্যে মধ্যে রক্ত পাথরের বেদী। প্রবাহিতার দুই পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান—তারই ভিতর রক্তবর্ণ পথ ও পথ-পার্শ্বে মাঝে মাঝে বিশ্রাম-স্থান সজ্জিত। পুষ্পোদ্যানের পর সবুজ তৃণাচ্ছাদিত ময়দান। ময়দানের পর সুরসাল, সুন্দর তরুলতার ও ফলের বাগান। এইরূপ সাতটী চত্বর ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ দিকে উঠে গেছে। প্রবেশ-পথ হ'তে বহুদূরে পর্ব্বতের নিকটে সর্ব্বোচ্চ চত্বরের মাঝখানে, একটী সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট কালো পাথরের স্তম্ভযুক্ত চতুষ্কোণ দরবার ঘর। ঘরের দু'দিকে বারাণ্ডা; এই দরবার-গৃহের চারিদিক বেষ্টন ক'রে পাথরে নির্ম্মিত প্রায় তিন হাত গভীর ও চল্লিশ হাত প্রশস্ত সরোবর তুল্য জলাধার। পরে সবুজ তৃণাচ্ছাদিত ও চেনার প্রভৃতি অন্যান্য বৃক্ষ-শোভিত বহু বিস্তৃত ময়দান। পরে ভীষণ মহাদেও পর্ব্বত সুরক্ষিত প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান র'য়েছে। এই জলাধারের গর্ভে অসংখ্য ফোয়ারা চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে নির্ম্মিত। রবিবারে এই ফোয়ারা গুলি খুলে দেওয়া হয়, তখন ইহা হ'তে বিন্দু বিন্দু জলকণা ঊর্দ্ধমুখে উৎসারিত হ'য়ে চতুর্দ্দিকে বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হ'তে থাকে। সূর্য্য-কিরণ অথবা চন্দ্রালোক তাহাতে প'ড়লে অপরূপ সৌন্দর্য্য ধারণ করে।

সালামার বাগ ররিবারে দেখ্‌তে হয়—তা'হলে এই বাগের সমস্ত সৌন্দর্য্যই উপভোগ করা যায়। এই জন্য ররিবারের প্রবেশমূল্য চার আনা,—অন্য দিন দু'আনা। সালামার একটী অপূর্ব্ব সৃষ্টি! ইহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য বর্ণনা করবার শক্তি আমার নাই। যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রলাম—

কাশ্মীর শ্রীনগরে, নগরের শোভা ক'রে
চিত্রবৎ ডাল হ্রদ বহে বিথারি,—
নীলাভ নির্ম্মল জলে, পবন হিল্লোল তুলে
নেচে যায়—উঠে তায় রূপ-লহরী!

আঁধার গগনে যেন প্রভাত অরুণ হেন
বিকশিত শত শত কমল-হারে,—
গুন্ গুন্ গুঞ্জরণে মত্ত অলি মধুপানে,
ছায়া তলে মীন চলে শৈবাল 'পরে।

কমল-চয়না-রত সম কমলিনী শত
বনবালা করে খেলা কমল-বনে,—
নীল নীরে শোভাময় নীল নলিনীচয়,
নীল জলে ভেসে চলে ভাসা বাগানে।

তট-প্রান্তে শোভে তার মনোহর 'সালামার'
বিমোহিত, সুললিত মাধুরী যথা,—
নন্দন-কানন সম শোভা যার অনুপম,
আঁখি ভ'রে হেরিবারে পশিনু তথা।

বিচিত্র উদ্যান-শোভা
সমুজ্জ্বল অবিকল
সীমন্তিনী-সিঁথি সম
প্রবেশিতে বাধা দিতে

তাহে চারু চিত্র কিবা,
কুসুম-ছবি,—
জলনালী অনুপম,
লিখেছে কবি।

বারি-ধারা চ'লে যায়,
টল্ মল্ করে জল
ফরিণী-মকরী-মুখে
পড়ি জল অবিরল

মীনকুল ভাসে তায়,
প্রাকার-তলে,
বাহিরিয়া মনোসুখে—
চলেছে 'ডালে'।

উদ্যানে মলয়া তায়
স্রোতস্বিনী বিনোদিনী
শিহরণ তুলি কায়
ছলে করে রবি-কণে

পরশি চলিয়া যায়,
লহরী-মালা—
আনমনে ছুটে যায়,
চপলা খেলা!

লতিকায় ফুল-হারে
পরিমলে রেণুদলে
মধুর কাকলী-গানে
গাহে গান অবিরাম

হিন্দোলা তরুর শিরে—
ভাসে অনিলে,
বিহগী ললিত-তানে
আপনা ভুলে!

কণ্টকিত লতিকায়
শিশুতরু ফুলচারু
তরঙ্গিণী শোভা করি
মুক্তারাশি উঠে ভাসি

গোলাপের সুষমায়
অলি-গুঞ্জন,
ফোয়ারার ঝরা বারি
মনোরঞ্জন!

সীমান্তে সোপান-শ্রেণী উর্দ্ধে যথা নির্ঝ'রিণী—
আলোরথে ছায়াপথে পড়িছে-ঝরে,
ক্রম উচ্চ সপ্ত স্তরে ঝরে জল লীলা ভরে—
ফুলে ঢাকা শ্যামে আঁকা বসুধা 'পরে।

শোভার সম্ভার দিয়ে ধীরে ধীরে বিকশিয়ে
মুক্তচীর প্রকৃতির মাধুরী-মাখা,—
অনুপম রূপরাশি ধীরে উঠিয়াছে ভাসি
অনুমানি তনুখানি রয়েছে আঁকা !

যবনিকা সম শোভা, 'মহাদেও' নীল-আভা,
দূরদেশে রহে কি-সে প্রহরা তরে,—
নীলিমায় লীলায়িত দ্রবময়ী অলঙ্কৃত,
শতরূপা কম বিভা কি-বা ভূধরে !

মনে হয় আচম্বিতে, নীরদ অম্বর হ'তে
বিচরিতে পৃথিবীতে এসেছে নামি,—
মহান্ উদার চিত্র, মনোহর সুপবিত্র,
কুতূহলে পদ-তলে লুটে মেদিনী !

নির্ম্মল গগন কিবা, নীল চন্দ্রাতপ-শোভা,
সভা-শিরে আলো ক'রে বিরাজ করে,—
পেঁজা তুলা নীলাকাশে, থরে থরে যায় ভেসে,
আলো ক'রে ভানু-করে হাসে বাসরে।

আশ্‌মানী-সবুজে-নীলে, রূপের তরঙ্গ খেলে,
তাহা দেখে সাদা মেঘে পতাকা তুলি,—
অনিল-তরঙ্গে ভেসে ভেসে যায় দেশে দেশে,
হাসিমুখে চাহে সুখে কুসুম-কলি !

মণি সম ফুলকলি তাহে পত্রদলগুলি
বিচ্ছুরিত করে শত রতন বিভা,—
তুলিকায় লেখা সম কুসুমের আলিপন,
বসুমতী পুষ্পবতী মোহন শোভা !

দুর্ব্বাদল শ্যাম শোভা সমুজ্জ্বল নীল আভা—
নীলাম্বরে ধরণীরে দেছে সাজায়ে,
সুকোমল গালিচায় লাগি এই আঙ্গিনায়
বিমোহন আস্তরণ রাখি বিছায়ে।

তরুবর চেনারেরে দিল সেথা ছায়া তরে,
নিরন্তর সেবাপর বীজনী-দলে,—
পল্লবে পল্লবে তার খেলে ভানু অনিবার,
ঝিলি মিলি করে কেলি মলয়া এলে।

ছায়াময় তরুতলে কেবা ফুল ছড়াইলে—
পুষ্প দিয়ে বিনাইয়ে আসন-শোভা ?
হীরা, মণি, মরকত শত চিত্র সুশোভিত
এ আসনে ফুলবনে কুসুম-আভা !

থরে থরে দিয়ে সারি অভিনব শোভা করি,
'ভবধব কি মাধব কাহার তরে,—
সুসজ্জিত এ আসন কারে করে আবাহন
কোন্ গানে কারে ধ্যানে ডাকে আদরে ?

যতদূর দৃষ্টি যায় হেরি নীল সুষমায়,
রবি-ছবি লিখে কবি উজ্জ্বল করি,—
রবি-কর হেম-রেখা ঊর্ম্মিপরে নীল মাখা,
জলে স্থলে চলাচলে নীল লহরী।

অম্বর ভূধর জল নীলে আঁকা তরুদল,
নীল জল শতদল নীলমাখা সে,—
নীল তৃণে চরে পাখী নীল কায়া নীল আঁখি,
নীল অলি সম কলি কি-বা বিকাশে !

এ হেন নীলের দেশে নির্ঝরিণী নটী-বেশে
তীর বসে অবশেষে এসেছে নামি,—
রসময়ী মধুপানে ধ'রেছে ললিত তানে
ঊর্ম্মিমাখা মুক্তাঢাকা ওড়না খানি !

পাষাণ-নির্ম্মিত পথে চালনা করিয়া স্রোতে
আসিয়াছে নটী-সাজে মোহিনী বেশ,—
তট-প্রান্ত উছলিয়া, নাচে নটী থিয়া থিয়া,
পশে কাণে জয়-গানে গীতিকা-রেশ !

নাচিতে নাচিতে এসে
চালনা-কৌশল-বশে—
সরোবরে ঝরঝরে
পড়ে অঝোরে,
অরূপে রূপের রাশি
মধুরে উঠেছে ভাসি,
শত তান—উঠে গান
কিবা মধুরে !

শ্রবণ বধির প্রায়
গম্ভীরে কোমল গায়
সুমধুর উঠে স্বর
মন মোহিত,—
নানারূপ বাদ্য-রোলে
নেচে নেচে তালে তালে
পড়ে জল মুক্তাদল—
ফেন সহিত !

প্রতিধ্বনি তুলি তান
কি গম্ভীর গাহে গান,
কি মোহন বাজে ঘন
প্রণব-সুরে,—
ললিত মধুর গানে
মুরজ-মুরলী-তানে
মলয়ায় ভেসে যায়
ক্রমশ দূরে !

অহো এই স্রোত-ধারা
অপরূপ মনোহরা,
কিবা শুচি বররুচি
ভাতিল তায়,—
শত উৎস ধারাকারে
নব কলা নৃত্য করে
নীল সরে সরোবরে
রঙ্গিণী প্রায়,—

জলছবি মহাকাশে
মহীধর জলে ভাসে,
রাশে রাশে জল আসে
সুন্দর কায়,—
পদতলে জলরাশি
তরুতরে যায় ভাসি
অবিরল উড়ি জল
প্রাণ জুড়ায় !

কত রূপ আছে জলে দেখাইতে ধরাতলে—
ও-গো কবি, মহা ছবি অম্বু-রাজায়—
তব রূপ-কণা দিয়ে রাখিয়াছ বিকশিয়ে
হে সুন্দর, রূপধর, নমি তোমায়!

সালামার বাগ—ভারত-সম্রাট জাহাঙ্গীর বাদসাহ, দয়িতার মনোরঞ্জনার্থ প্রেমিকের হৃদয়-সুধা-সিঞ্চিত ক'রে এই অপরূপ প্রকৃতির দেহে প্রাণ দান ক'রেছিলেন। এ কল্পনা উক্ত মোগল-সম্রাটেই সম্ভবে। সমগ্র জগতে ইহার তুলনা কোথায়? ইহার পশ্চাতে ভীষণ মহাদেও পর্ব্বত, সম্মুখে প্রশান্ত ডাললেক। ইহার গর্ভে হরিৎ ক্ষেত্রে পুষ্পাস্তরণ বিবিধ বর্ণের পুষ্পগুটিকাকীর্ণ কিনারা, তাহার মধ্যে মধ্যে রক্তবর্ণ প্রশস্ত পথ। প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখ হ'তে মহাদেও পর্ব্বতের কোল পর্য্যন্ত বাঁধান পথে, প্রবাহমান নদী প্রবল বেগে থাকে থাকে ছ' সাত্‌টা স্থানে ভঙ্গ হ'য়ে, প্রায় এক তলার সমান উচ্চ হ'তে নিম্ন চত্বরে আছাড় খেতে খেতে পতিত হ'য়ে, প্রত্যেক চত্বরের মধ্যে মধ্যমণির ন্যায় বাদসাহের তক্তের মত চতুষ্কোণ বেদী প্রদক্ষিণ ক'রে, সমসীমান্তরাল পথে নিম্ন স্তরে নেমে গিয়ে, প্রাচীর মধ্যস্থ হাঙ্গর ও হস্তীমুখ বাহিয়ে প্রকাণ্ড রাজ-পথে চত্বরের উপর আছাড় খেয়ে প্রবল বেগে ডাললেকে গিয়ে মিলিত হ'য়েছে। এই জলাশয়ের গর্ভে অসংখ্য ফোয়ারা। এই সকল ফোয়ারা ও বারি রাশির মধ্যে রক্তবর্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত রাজতক্তে সম্রাট-সম্রাজ্ঞী অসংখ্য দীপমালা ও জল-তরঙ্গের মধ্যে, বোধ হয় কপোত-কপোতীর ন্যায় বিহার ক'রতেন,—অথবা বহু রাজহংসীর মধ্যে, এক মাত্র রাজহংস রূপে বিহার ক'রে গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব ক'রতেন,—অথবা জলতলে অসংখ্য জ্যোতিষ্মান রত্ন-প্রদীপের সমুজ্জল আভাকীর্ণ শোভার মধ্যে, অসংখ্য নক্ষত্র-শোভিত চন্দ্রমার পুলকোজ্জ্বল কিরণোদ্ভাসিত নীল গগন-তলে, বহু

বিস্তারী অসংখ্য ফোয়ারার বারিপাত ও বারি-বর্ষণজনিত গুরু গম্ভীর ধ্বনির মধ্যে, ডুব দিয়ে ভাব-রাজ্যে আত্মহারা হ'য়ে যেতেন।

আমরা এই জলরাজ্যে বহুক্ষণ আত্মহারা হ'য়ে ব'সেছিলাম। অনেকক্ষণ পরে উনি ও পণ্ডিতজী, পণ্ডিতজীর আনীত রুটী ও মাংস এক চেনার বৃক্ষতলে ব'সে আহার ক'রলেন, এবং আমি আর একটা চেনার বৃক্ষতলে তৃণাচ্ছাদিত ময়দানের উপর শয়ন ক'রে, তন্ময় চিত্তে এই অপরূপ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য উপভোগ ক'রতে লাগলেম। আহা, কি মনোমুগ্ধকর অপূর্ব্ব শোভা! মানব কল্পনা-রাজ্যের অপূর্ব্ব সৃষ্টি—এই সালামার বাগ। প্রকৃতির সকল সৌন্দর্য্যই ইহাতে বর্ত্তমান,—এ সৌন্দর্য্য জগতে বিরল!—

তৃণ ছন্ন ভূ-শয়নে, পুষ্পাকীর্ণ আস্তরণে—
শান্তিময় তরুতলে করিনু শয়ন,
ফোয়ারার বারিধারা সম বারিদের ধারা
কুসুমের বর্ণ-চিত্র অতি অনুপম।

মলয়া বহিয়া যায় পরশি তাপিত কায়,
ক্লান্তি হরি করে দেহে সুধার সঞ্চার,—
হৃদয়ের অবসাদ শোক-তাপ-পরমাদ
মুছাইয়া করে দান আনন্দ অপার!

বিশ্বেশ্বর, বিশ্বপতি, তব পদে করি নতি,
এমন রচনা-শক্তি তব করুণায়—
লাভ করি যেই কবি, বাস্তবে আঁকিল ছবি—
ধন্যবাদ শতবার তাঁর কল্পনায়!

প্রশংসা শতেক তাঁরে, মহামান্য জাহাঙ্গীরে,
যাঁহার বৈভবে প্রেমে উদ্ভব ইহার,—
প্রকৃতি যাঁহার তরে হৃদয় উন্মুক্ত ক'রে
খুলে দিয়েছিল তাঁর সৌন্দর্য্য-আধার!

অক্ষম দুর্ব্বল করে এই চিত্র আঁকিবারে
শক্তি-হীনা নারী আমি—কি শক্তি আমার,—
জগতে অতুলনীয় কি-বা দৃশ্য রমণীয়—
স্বর্গের সুষমা সম সৌন্দর্য্য যাহার!

বহুক্ষণ পরে আমরা আকুল নেত্রে ফিরে ফিরে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেখান হ'তে চলে এলাম, এবং নিসাতবাগ-অভিমুখে যাত্রা ক'রলেম।

নিসাত বাগ

অল্পক্ষণের মধ্যে আমরা নিসাতবাগে এসে উপস্থিত হ'লেম। নিসাতবাগ সালামার হ'তে দু'মাইল। গঠনে ও সৌন্দর্য্যে ইহা সালামারের এক গোষ্ঠী হ'লেও সম্বন্ধে কনিষ্ঠ। নিসাতও ডাললেকের ধারে। ইহা বিলাসীর বিলাস উদ্যান, আর সালামার—ভাবুকের ভাব সমাধিস্থান। সাহি চশমা বা চশমা-সাহি ইহাদেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ।

নিসাতবাগ মহাদেও পর্ব্বতের অঙ্গে বহু উচ্চে অবস্থিত একটী বাটী। এই বাটীর দু'দিকে দু'খানি প্রকোষ্ঠ এবং মধ্যে বারাণ্ডাযুক্ত একটী দালান। এই দালানে কষ্টি পাথরের প্রায় সাড়ে তিন হাত লম্বা ও দু'হাত চওড়া দুই খানি আসন দুই পার্শ্বে বিছানো। মধ্যে মহাদেও পর্ব্বতের অঙ্গ ভেদ ক'রে একটী চশমা, প্রায় তিন হাত প্রশস্ত প্রণালী মধ্যে কুলু কুলু তানে প্রবাহিত হ'য়ে প্রায় আট হাত নীচে দ্বিতীয় স্তরে পতিত হ'চ্চে, এবং এ স্থান হ'তেও ঐরূপ ভাবে পর পর একাদশ স্তরে প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে প্রাচীর-গাত্রে গোমুখীর আকার বিশিষ্ট পথ দিয়ে ঝর্ ঝর্ রবে বহু উচ্চ হ'তে রাজপথে সুন্দর বাধান চত্বরে পতিত হ'য়ে, ডাল লেকে গিয়ে মিলিত হ'য়েছে। যে স্থানে যে গৃহের মধ্যে এই স্রোতস্বতীর উদ্ভব হ'য়েছে, সেইটী দর্শনে মনে মনে এই হয় যে, এই স্থানে, কোন মহাচারণী দেবীর সেবার্থে, কোন ভক্ত কর্ত্তৃক এই মনোরম গৃহ নির্ম্মিত হ'য়েছিল। এই গৃহ-মধ্যে উদ্ভবা কুলু কুলু ধ্বনি-নিরতা স্রোতস্বতীর তীরে কৃষ্ণাসনে উপবিষ্টা পুষ্প-সম্ভার-সমন্বিতা যোগিনী মূর্ত্তি, সম্মুখে নিম্নস্তরে বিস্তৃত ময়দানে বহু চেনার বৃক্ষ-শোভিত সবুজ দুর্ব্বাক্ষেত্রে বিচিত্র বর্ণের আলিম্পনা লেখা পুষ্পবাটীকা—কল্পনায় মন মুগ্ধ হ'য়ে যায়। এমন সুন্দর

আরাধনা-স্থলে প্রাণের দেবতা না এসে থাকতে পারেন কিনা কে জানে? স্তরে স্তরে এই উদ্যান একাদশ স্তরে নির্ম্মিত। মধ্যে সীমন্তে সিন্দুর-শোভার ন্যায় ক্ষীণ কলেবরা এই জল-প্রণালী সিঁথির ন্যায়, ইহার গর্ভে কৃত্রিম উৎস-ধারা উত্তরোত্তর নেমে এসে শেষ চত্বরে সিঁথির সম্মুখ ভাগের ন্যায় দ্বিধা বিভক্ত হ'য়ে, প্রাচীর ভেদ করতঃ রাজ-পথে পতিত হ'য়ে ডাল লেকে মিলিত হ'য়েছে। প্রতি চত্বরে যে যে স্থানে নির্ঝরিণী পতিত হ'য়েছে, সেই সেই স্থানে সম চতুষ্কোণ বড় বড় জলাশয়ের আকারে গাঁথা চারি কোণে স্তম্ভের উপর বড় বড় চারিটী বিজলী বাতি র'য়েছে। দুই পার্শ্বে বিবিধ বর্ণের পুষ্প-স্তবক মধ্যে বিবিধ গঠনের অনেকগুলি ফোয়ারা, মধ্যে মধ্যে শ্বেত প্রস্তর, কোথাও রক্ত প্রস্তর কোথাও বা কৃষ্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত চতুষ্কোণ, অষ্টকোণ বা চক্রাকার আসন। পুষ্প-স্তবকের পরে দুই পার্শ্বে দু'টী রক্তবর্ণ রাস্তা। ইহার পরে পুনরায় পুষ্পলেখা সমসীমান্তরাল ভাবে চ'লে গিয়েছে। ইহাকে ফুলগাছ ব'ললে ঠিক্ হয় না; দেখা যায়—যেন বিবিধ বর্ণের ফুলের আলিম্পনা। এই আলিম্পনা প্রতি চত্বরে সম চতুষ্কোণ সবুজ বর্ণের বিবিধ পুষ্পাকীর্ণ এক এক খানি পারস্য গালিচার সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। এই মখমলের গালিচার উপর চেনারের তলায় বহু কাষ্ঠাসন পাতা আছে। এই স্থানে উপবিষ্ট হ'য়ে দর্শকগণ আনন্দ উপভোগ করেন। এই সীমানার পরেই উভয় পার্শ্বে সুন্দর ফলের বাগান। ন্যাসপাতি আপেল, আকরোট, চেরি, তুঁত এবংবিধ বহু বৃক্ষ ইহার সম্পদ। এই স্থানের বায়ু সাধারণতঃ গরম। এই স্থানের নির্ঝর-বায়ুও শীতল নহে। মোগল-সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রধান মন্ত্রী আসফ খাঁ প্রায় তিন শত কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে জাহাঙ্গীর বাদসাহের আদেশে এই নিসাতবাগ প্রস্তুত ক'রেছিলেন। বস্তুতঃ এই স্থানের প্রকৃতির এই সকল (পর্ব্বত, জঙ্গল ও জল) উপাদান ব্যতীত

এমন মনোহর উদ্যানের সৃষ্টি হ'তে পারে না, স্বভাবের শোভা-জাত বৃক্ষ ও পুষ্প ইহার শোভা শত গুণ বৃদ্ধি ক'রে রেখেছে।

আমরা এখানে একটু বিশ্রাম ক'রে বাড়ীর দিকে রওনা হ'লেম। শ্রীনগর পৌছে প্রথমে এক মোটর-আফিসে উপস্থিত হ'য়ে পরদিন সকালে ট্যানমার্গে যাবার জন্য মোটর ঠিক ক'রে ন' টাকায় তিনটে সিট্ (সামনে দু'টা ও পিছনে একটা) রিজার্ভ ক'রে অগ্রিম চার টাকা দিয়ে প্রায় ছ' টার সময় হোটেলে ফিরলাম। এদিন টুঙ্গা ভাড়া পাঁচ টাকা ও কিছু বকসিস্ দিতে হ'লো। পণ্ডিতজী পরদিন সকালে গুলমার্গ যাবার বন্দোবস্ত ক'রে আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন।

ট্যানমার্গ

পরদিন ২৮শে বৈশাখ, সোমবার সকালে উঠে চা ও টোষ্ট কিছু খেয়ে নেওয়া গেল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—বৃষ্টির সম্ভাবনা। অদ্য গুলমার্গে যাবার কথা। গুলমার্গ শ্রীনগর হতে আটাশ মাইল,—সমুদ্র-পৃষ্ঠ হ'তে ন' হাজার ফুট উচ্চে। শুনেছি সেখানে বরফ পড়ে। এই মেঘাচ্ছন্ন আকাশে—বৃষ্টির সম্ভাবনার দরুণ আমাদের বেরুতে আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কল্য মোটবের সিট রিজার্ভ ক'রে চার টাকা অগ্রিম দিয়ে আসা হ'য়েছে। এখন না গেলে ঐ কয়টী টাকা লোকসান হয়। এই সব অলোচনা ক'চ্চি, এমন সময় পণ্ডিতজী এসে উপস্থিত হ'লেন। তখন সকলে বিবেচনা ক'রে যাওয়াই স্থির হ'লো। হোটেলের লোকেরা ও পণ্ডিতজী ওঁকে ছাতা নিতে ব'ল্লে,—কিন্তু উনি ছাতা আনেন নাই, সুতরাং লওয়া হ'লো না। পণ্ডিতজী সঙ্গে ছাতা এনেছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক, গুলমার্গ গমনকালে সকলেরই ছাতা কিম্বা ওয়াটার-প্রুফ্ সঙ্গে নেওয়া উচিত; কারণ, অত উপরে বৃষ্টির কিছুই স্থিরতা নাই। আকাশ পরিষ্কার থাক্‌লেও সেখানে মেঘ বা বৃষ্টি যখন-তখন হওয়া সম্ভব, আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাক্‌লে তো কথাই নাই। যাহা হোক, আমরা প্রায় ন' টার সময় গুলমার্গের উদ্দেশে যাত্রা ক'রলাম।

মোটর শ্রীনগর ছেড়ে বারমূলার পথে কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে অন্য পথে গুলমার্গের দিকে চ'ল্‌লো। পথ ক্রমশঃ চড়াই ও উৎরাই। ক্রমশঃ মোটর বেশী চড়াইএ উঠ্‌তে লাগ্‌লো। এইরূপে শ্রীনগর হ'তে চব্বিশ মাইল দূরে সমতল ভূমি হ'তে অনেক উচ্চে, প্রায় সাড়ে এগারটার সময় নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে ট্যানমার্গ নামক স্থানে একটী ছোট বাজারে

এসে পৌঁছালাম। মোটরের গতি এখানে বন্ধ হ'লো। আর মোটর যাবার রাস্তা নাই, সম্মুখে ভীষণ পর্ব্বত,—পর্ব্বতের উপর দিয়ে পথ। এই পার্ব্বত্য পথ চার মাইল অতিক্রম ক'র্লে গুলমার্গে যাওয়া যাবে। অশ্বারোহণে কিম্বা ডাণ্ডিতে যেতে হয়—অন্য যান নাই।

ট্যানমার্গের শোভা মনোহর বটে, কিন্তু অপরূপ নহে। দুই পার্শ্বে পর্ব্বতশ্রেণীর অন্তরাল হ'তে শুভ্র তুসার-সমাচ্ছন্ন শির সমুন্নত ক'রে গিরিশ্রেণী শোভা পাচ্চে। দূরে পর্ব্বতের নীল অঙ্গ—সবুজ ঘন জঙ্গলে ঢাকা। জঙ্গলের উপর সাদা মেঘের আভা প'ড়ে সবুজ মাণিক্যের মত শোভা পাচ্ছে। কোথাও জঙ্গলের ছায়ায়, কোথাও মেঘের ছায়ায় কৃত্রিম কৃষ্ণবর্ণ গুহার মুখের মত দেখা যাচ্ছে। পর্ব্বতের সানুদেশে তৃণাচ্ছাদিত সবুজ উপত্যকার শ্যামল ক্ষেত্রে বিবিধ বিচিত্র বর্ণের সৃষ্টি ক'রে নানারূপ শস্য শোভা পাচ্ছে। ক্ষেত্রের আলিগুলি স্তরে স্তরে সবুজের রেখাপাত ক'রে মনোলোভা সোপানের আকার ধারণ ক'রেছে। আর পার্ব্বত্য নদী সকল কল্ কল্ ছল্ ছল্ নানারূপ কলতানে কোথাও ধীরে, কোথাও মহাবেগে ক্ষেত্র সকল প্লাবিত ক'রে ছুটে চ'লেছে। রাজ-পথের দুই-পার্শ্বে নির্ঝরিণীকুল একত্রিত হ'য়ে স্রোতস্বতীর আকারে জনগণকে চমকিত ও পুলকিত ক'রে স্বচ্ছকায় মাধুরীর লহর তুলে আপন মনে চ'লে যাচ্ছে।

আমাদের মোটর ট্যানমার্গে পৌঁছিবার পূর্ব্ব হ'তে বৃষ্টি আরম্ভ হ'য়েছে। এখানে পৌঁছাবার পর বৃষ্টির বেগ বৃদ্ধি হওয়ায় আমরা মোটরের ভিতর ব'সে রইলাম। অপর লোকগুলি নেমে কেহ কেহ কুড়ি পঁচিশ হাত দূরে একখানি আটচালার মত ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিলে; আর কেহ কেহ বা গন্তব্য স্থানে চ'লে গেল। রাস্তা কর্দ্দমাক্ত। এই সময় এই কর্দ্দমাক্ত পথে ময়লা ও ছিন্ন-বস্ত্রাচ্ছাদিত কতকগুলি অসভ্য

পাহাড়ী জাতির ছুটাছুটী ও হুটোপুটী অত্যন্ত বিসদৃশ লাগ্‌লো। ইহারা সকলেই কুলি। এখান হ'তে পার্ব্বতীয় পথে গুলমার্গের রাস্তা। পুলিস গুলমার্গ যাবার সুবন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছে। পুলিস আমাদের কাছে এসে সম্মান জানিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—আমাদের কি চাই? আমাদের কথা-মত দু'টী অশ্ব ও একটী ডাণ্ডি আনিয়ে দিলে। অবশ্য অশ্বপাল, অশ্ব ও ডাণ্ডির কুলিরা ডাণ্ডি নিয়ে নিকটেই অপেক্ষা ক'র্‌ছিল এবং আমাদের দেখে তাহারাও মোটরের নিকটে এসেছিল। গুলমার্গ যাওয়া-আসা ডাণ্ডি-ভাড়া সাড়ে পাঁচ টাকা ও দু'টী অশ্ব বারো আনা হিসাবে দেড় টাকা।

গুলমার্গ

তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। আমি ডাণ্ডিতে, উনি ও পণ্ডিতজী অশ্বারোহণে, গুলমার্গ-অভিমুখে যাত্রা ক'রলেম। বেলা প্রায় বারটা। আমরা ক্রমশঃই পর্ব্বতের উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লেম। একটু পরে আবার বৃষ্টি আরম্ভ হ'লো। পণ্ডিতজী ছাতা খুললেন। আমার তো কাপড়, জামা, জুতা একেবারেই ভিজে গেল। উনি অলষ্টার গায়ে ঘোড়ার উপর ভিজ্‌তে লাগ্‌লেন। অশ্বপাল নিজের গায়ের মোটা লুই খানা ওর আপাদমস্তক জড়িয়ে দিলে। দুর্দ্দশা আমারই বেশী। একে অত্যন্ত শীত, তার উপর ভিজে সমস্ত শরীর হিম হ'যে আস্‌তে লাগ্‌লো। গায়ের কাপড় ঢাকা দিয়ে পরণের কাপড় বাঁচাবার চেষ্টা ক'রলেম—বৃথা চেষ্টা। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে মধ্যে তুষারপাত আরম্ভ হ'লো। বরফ প'ড়ে অঞ্চল ভর্ত্তি হ'যে গেলো। ঝেড়ে ফেল্‌লাম—একটু পরেই দেখি—আবার ভর্ত্তি। এই ভাবে আমার কাপড়, জামা যায় ট্রাউজার পর্য্যন্ত ভিজে গেল। ঠাণ্ডায় হাত-পা টাস ধ'রতে লাগ্‌লো। ওঁরও দুর্দ্দশা কম হ'লো না। মোটা লুই গায়ে থাকে না—তার উপর অশ্বারোহণে সমস্ত শরীর দুল্‌ছে এবং লুই খানা কেবলই খুলে খুলে যাচ্ছে। জামা, পায়ের মোজা, জুতা, কাপড়—সমস্ত ভিজে গেছে। অশ্বের বল্গা ধরবার জন্য হাত বাহিরে থাকায় হাত অসাড় হ'যে গেছে। বুঝ্‌লেম—ওয়াটার-প্রুফই এ পথের উপযুক্ত। যাহা হোক, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি থাম্‌ছিল এবং তুষারপাতও বন্ধ হ'চ্ছিল, তাই রক্ষে, নচেৎ আগাগোড়া সমস্ত পথ যদি বৃষ্টি ও তুষারপাত হ'ত, তা'হলে আমরা সেখান হ'তে ফির্‌তাম কি না সন্দেহ।

এইরূপ বৃষ্টি ও তুষারপাতের মধ্য দিয়ে আমাদের অশ্ব ও ডাণ্ডি চ'ল্‌ছে। পথ এক এক স্থানে এত বেশী চড়াই যে, প্রতি মূহূর্ত্তে অশ্বপৃষ্ঠ হ'তে আরোহী উল্টাইয়া পড়বার সম্ভাবনা হ'তে লাগ্‌লো। ডাণ্ডিও এত উঁচু নীচু হ'তে লাগলো যে, আমাকেও অতি সাবধানে ধ'রে ব'সে থাক্‌তে হ'লো,—নচেৎ গড়িয়ে যেতে হ'ত। এ পথ কেবলই চড়াই। আমরা কেবলই উচ্চ পর্ব্বতের উপর উঠ্‌চি। এইরূপ বৃষ্টি ও তুষার পাতের মধ্য দিয়ে ডাণ্ডি এবং অশ্বযুগল ধীরে ধীরে পর্ব্বতের উপর উঠ্‌তে লাগ্‌লো। ভাল ক'রে দুই পার্শ্বের দৃশ্যে মনোযোগ দিতে পারছি না,—কারণ ঠাণ্ডায় এবং শীতে শরীর হিম হ'য়ে আস্‌ছে। পার্ব্বতীয় পথ একই ভাবের,—এক দিকে খাদ অন্য দিকে উচ্চ পর্ব্বত। তবে এখানকার পথ বেশ প্রশস্ত। আমাদের যান-বাহন ক্রমশই মেঘ ভেদ ক'রে চ'ল্‌তে লাগ্‌লো। সম্মুখে কিছু দূরে ধোঁয়ার মত অন্ধকার দেখাচ্ছে,—যেন ওখানে কিছুই দৃষ্টিগোচর হ'বার নয়, কিন্তু যখন ধূসর বর্ণ মেঘের ভিতর দিয়ে আমরা সেখানে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেম, তখন সেখানকার সমস্তই দৃষ্টি-পথে আস্‌তে লাগলো। অনেকটা কুয়াসার মত। এখানকার নৈসর্গিক দৃশ্য অতি গম্ভীর ও মনোরম। স্থানে স্থানে মেঘ, পর্ব্বতের গায়ে পুঞ্জীভূত হ'য়ে ভীষণ আকার ধারণ ক'রেছে। কেবল স্তরের পর স্তর উচ্চ শির পাইনশ্রেণী, যেন সেই মেঘাবৃত স্থান আলোকিত কর্‌বার জন্য সহস্র সহস্র দীপাবলীতে সজ্জিত হ'যে দাঁড়িয়ে আছে, আর দেয়ার বৃক্ষগুলি সেই ঘন মেঘাবৃত পার্ব্বতীয় জন-বিরল উচ্চ চড়াইএর কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে, পথিকের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার ক'রে হাত ছানি দিয়ে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে এবং চেনার বৃক্ষগুলি পথিকের ক্লান্তি দূর কর্‌বার জন্য মধ্যে মধ্যে বহুদূর ব্যাপিয়া ছায়া দান ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। পথের এইরূপ নানা রকম দৃশ্যাবলীতে মন সাতিশয় প্রফুল্ল হ'য়ে উঠে

এবং শরীরে নব বলের সঞ্চার হয়। তাই অত কষ্টেও আমরা কষ্ট অনুভব করি নাই বা নিরাশ হই নাই। ধন্য ভগবান, তুমি বনের মধ্যেও এত রমণীয় দৃশ্য সৃষ্টি ক'রে রেখেছ.—যাহা দর্শন ক'রে পথিকের পরিশ্রান্ত হৃদয়েও নব বলের ও উৎসাহের সঞ্চার হয়! তাই তুমি জগৎ-জীবন—তাই তুমি দয়াময়!

এখন গুলমার্গে ফুলের সময় নয়, তাই গুল্মগুলি ফুলশূন্য।—তা' না হ'লে এ গুলিতে যখন ফুল ফুটবে এবং সূর্য্য-কিরণ প'ড়বে, তখন এর শোভা যে কি চমৎকার হ'বে, তা বল্‌তে পারি না। সে শোভা দেখ্‌তে না পেয়ে মনে খানিকটা আপশোষও হ'লো! আবার এই বরফ পড়ার ও মেঘবৃষ্টির শোভাতেও মন মোহিত হ'য়ে গেল।

এমনি ক'রে প্রায় দেড় ঘণ্টা পথ চলার পর হঠাৎ এক পার্ব্বত্য শিখরে এসে উপস্থিত হ'লেম। চমৎকার কৌশলে দৃশ্য অপসারিত হ'য়ে গেলো। চক্ষে কেমন ধাঁধাঁ লেগে গেলো। এ—কি—এ! এ যে অপরূপ দৃশ্য, এমনটি তো আশা করি নাই!—ঘন সবুজ রঙের পরিবর্ত্তে নব দুর্ব্বাদল শ্যাম রামরূপের অপরূপ খেলা! পর্ব্বতের চূড়া হ'তে সানুদেশ পর্য্যন্ত পুরু ফিকে সবুজ রঙের গালিচা পাতা—খোলা ময়দান, কিন্তু সমতল নয়। এখানে জঙ্গলের অন্ধকার নাই,—মেঘ, কুয়াসা, বৃষ্টি, বরফ—কিছুই নাই। ভগবান, এই অধীনদের—তাঁর রচনার নব সুষমা দেখাবার জন্যই বোধ হয় এ সকল ক্ষণকালের জন্য সরিয়ে নিয়েছিলেন, এবং মরীচিমালী তাঁর প্রচণ্ড কিরণ সংযত ক'রে পাতলা মেঘাবৃত কিরণে,—কখন বা মেঘ ক্ষণ অপসারিত ক'রে রৌদ্রের বাতি জ্বেলে দিয়েছিলেন। আমি ডাণ্ডিতে ব'সে ব'সে এই সব নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। দেখ্‌লাম—বিশাল উপত্যকা—কোথাও সমতল নহে, অতি সুকোমল শ্যামল

তৃণাচ্ছন্ন। স্থানে স্থানে এক এক খানি ছবির মত সুদৃশ্য কাঠের বাড়ী। এই বাড়ীগুলি সমস্তই কাঠের—ইহাতে ইট বা পাথরের সম্পর্ক নাই। বাড়ীগুলির বর্ণ বাদামী রঙের। দূরে বহুদূরে নিম্ন হ'তে নিম্নস্তরে থাকে থাকে তোড় ভঙ্গ হ'য়ে ছোট ছোট গ্রামের মত দশ বার খানা ঘর। আরও দূরে নিম্নস্তরে রজত-প্রবাহিতা নদী। দূরে দূরে সীমান্তরেখা স্বরূপ ধূসর বর্ণের পর্ব্বতশ্রেণী চক্রাকারে বিরাজ ক'চ্ছে। এই সকল পর্ব্বতের শিরোভাগ তুষারমণ্ডিত হ'য়ে, শুভ্র কেশরাশির উপর শুভ্র মুকুটের শোভা ধারণ ক'রেছে। সেই সকল তুষার গলিত হ'য়ে জটার অথবা বেণীর আকারে পর্ব্বত-গাত্রে শোভা বিস্তার ক'রে নীচের দিকে নেমে আসছে। সবুজ মাণিকের মত ঘন বনশ্রেণী এই সকল পর্ব্বতের তলদেশ আবৃত ক'রে বসনের আকারে দেখা যাচ্ছে। স্থানে স্থানে জঙ্গলের মধ্যে বরফ এবং কাঠের বাড়ী, বাড়ীর উপরও বরফ স্তূপ কার হ'য়ে জ'মে আছে। সকল বাড়ী নয়নগোচর হয় না,—বনান্তরালে লুকিয়ে আছে। পথ পিচ্ছিল, কর্দ্দমাক্ত ও উৎরাই। পথের পাশেও মাঝে মাঝে বরফ জ'মে স্তূপাকার হ'য়ে আছে। পথের দিকে চাহিলে কিছু মাত্র সৌন্দর্য্য বোধ হয় না, বরং অবসাদ এসে পড়ে। এই নিম্ন উপত্যকায় দূর্ব্বাঘাসে সমাচ্ছন্ন শ্যামল দৃশ্যের উপর দাবা বোড়ের ঘুঁটির মত ওই বাড়ীগুলির শোভা বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। দূরে ঐ বন বিটপী-শ্রেণী ও গ্রামগুলি, বেগুনী ও সাদা বর্ডারের উপর পান্নার কারুকার্য্যের মত ঝক্ ঝক্ ক'রছে এবং উহার পশ্চাতে নীল পর্ব্বতশ্রেণীর উপর শুভ্র তুষাররাশির পশ্চাৎ দিকে, বহুদূর ব্যাপিয়া স্তরে স্তরে ঢেউ তুলে তরঙ্গ মালার ন্যায় বরফের পাহাড় কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট ধূম্রাকারে যেন আকাশ ভেদ ক'রে ঊর্দ্ধদিকে অগ্রসর হ'চ্ছে। কি সুন্দর দৃশ্য! জঙ্গলের মধ্যে তুষারের অঙ্গে মেঘগুলি ছোট ছোট কুণ্ডলী পাকিয়ে

ধূমপুঞ্জের মত জন্মগ্রহণ ক'রে, ক্রমে বৃক্ষগুলির উপর আবরণ ফেলে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠে, কেমন আকাশে ব্যাপ্ত হ'য়ে প'ড়ছে, এবং দৃশ্যবস্তু সমস্ত ঢাকা দিয়ে, শুধুই আকাশের মত একাকার হ'য়ে যাচ্ছে। বড়ই মনোমুগ্ধকর ছবি! এই সকল বারিদ হ'তে বর্ষণ হ'য়ে যাচ্ছে। বর্ষণান্তে মেঘসকল শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে দিগন্তে চ'লে যাচ্ছে। পুনরায় নূতন সৃষ্টির মত দৃশ্য বস্তু সকল দৃশ্য-পটে ভেসে উঠ্‌ছে, এবং এই দৃশ্য-বস্তুর নূতন সৃষ্টির মত, মেঘেরও নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হ'চ্ছে। এমনি ক'রে সৃষ্টিকর্ত্তার বিশ্ব চরাচরে প্রতিনিয়ত যে কত নব নব সৃষ্টি ও ধ্বংস হ'চ্ছে—কে তাহা নির্ণয় ক'র্‌তে পারে? কিন্তু এই সৃষ্টি ও ধ্বংসলীলা দর্শনে মন—জগতের অসারত্ব অনুভব ক'রে উদাস হ'য়ে যায়।

এখানে খালসা হোটেলের ব্র্যাঞ্চ আছে, কিন্তু এখন তাহা বন্ধ। আরও সাত আট দিন পরে খুলবে, কারণ এখন এখানে লোক আস্‌বার ঠিক সময় হয় নাই। তজ্জন্য এখন এখানে থাকবার বা খাবার কোনও বন্দোবস্ত নাই। আমাদের সঙ্গেও খাবার ছিল না। এখন আবার বৃষ্টি আরম্ভ হ'য়েছে; এক দোকানের রোয়াকের শেডের ভিতর আমার ডাণ্ডি রাখা হ'লো। উনি ও পণ্ডিতজী অশ্বারোহণেই জলে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে খাবারের জন্য ক্ষুদ্র বাজারটী সমস্ত ঘুরে ঐ দেশীয় কিছু সুপক্ক ফল অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে কিনে আন্‌লেন, অন্য খাবার কিছু পেলেন না। বাজারে কয়েক খানি চা ও পাঁউরুটীর দোকান বা হোটেল র'য়েছে, কিন্তু সবগুলিই মুসলমানের। ফল সংগ্রহ ক'রে সেখান হ'তে কিছু দূরে এবং উপরে একটী কাঠের বাড়ীর দোতলার ঘরে গেলাম, এইটাই খালসা হোটেল, কিন্তু এখন এখানে কেহ নাই। এখানকার চৌকিদার আমাদের বসবার জায়গা দিলে এবং কাঙ্গড়িতে আগুন এনে দিলে।

আমরা সেই আগুনে হাত-পা কতকটা গরম ক'রে নিলাম। হোটেলের ধারে, রাস্তার উপর এবং হোটেলের অঙ্গনে প্রায় দু'হাত উচ্চ হ'য়ে বরফ জমে আছে। আমরা সেই বরফের উপর দিয়ে হোটেলে গেলাম। উনি ও পণ্ডিতজী সেই ফল কিছু কিছু আহার ক'রলেন। আমি কিছুই খেলাম না, ভিজে কাপড়ে ঠাণ্ডায়—হাত-পায়ের অসাড় অবস্থায় ফলের নামে গায়ে জ্বর এলো।

এখানে একটু বিশ্রাম ক'রে আবার নিজের নিজের যান-বাহনাদিতে আরোহণ ক'রে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে বার হ'লেম। তখন অল্প অল্প বৃষ্টি প'ড়্ছে। আট জন কুলি ও সহিসকে আট আনা জল খেতে দেওয়া গেল, কিন্তু তাদের খেতে দেখ্‌লাম না। ধন্য তাদের কষ্ট-সহিষ্ণুতা! আমরা বরাবর মেঘ-বৃষ্টির মধ্য দিয়ে চড়াই ও উৎরাই পার হ'য়ে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেম। এখানে একটী শিব-মন্দির র'য়েছে, মহারাজা প্রতাপ সিংহের মহিষী ইহা প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন। সাধনার স্থান বটে। আর একটী পর্ব্বতের উপর ভগ্নাবস্থায় দুর্গ-প্রাকারের মত গাঁথা র'য়েছে;—শুন্‌লাম মহারাজা প্রতাপ সিংহ ওখানে দেওয়ালী অর্থাৎ কালীমন্দির প্রস্তুত ক'রছিলেন, তাঁহার স্বর্গলাভ হওয়ায় উহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় প'ড়ে র'য়েছে। এখানে মহারাজার বাড়ী এবং পোলো গ্রাউণ্ড আছে। গ্রাউণ্ডের জমি সমতল। এই অসমতল রাজ্যের মধ্যে সমতল জমিটী বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। গ্রীষ্মকালে মহারাজা শ্রীনগর ছেড়ে এখানে এসে বাস করেন। শ্রীনগরের অনেক ধনী ব্যক্তিও গরমের সময় এখানে এসে বাস ক'রে থাকেন। বৎসরের মধ্যে জ্যৈষ্ঠ হ'তে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত এখানে থাক্‌বার সময়। কার্ত্তিক মাস হ'তে ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়ে, পরে তুষার প'ড়ে সমস্ত গুলমার্গ ডুবে যায়। তখন এখানে কেহই থাক্‌তে পারে না। মহারাজা এখানে কাহাকেও পাকা বাড়ী বা জায়গার কোনও

আর্য্যাবর্ত্ত

পাকা বন্দোবস্ত ক'রতে দেন না। ইহার চারিদিকে অসংখ্য গোলাপ ফুটে, তাই ইহার নাম গুলমার্গ হ'য়েছে।

পোলো গ্রাউণ্ডের সম্মুখে উপরে পর্ব্বতের গায়ে কতকগুলি ইংরাজদের ক্লাব হাউস আছে। অনেক ইংরাজ এখানে বাস করেন। বেশী ঠাণ্ডা ব'লে ইংরাজেরা এই জায়গা খুব পছন্দ করেন। কয়েকটী ইংরাজ-মহিলা ও ইংরাজকে আপাদমস্তক ওভার-কোটে এবং ওয়াটার-প্রুফে ঢেকে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে যেতে দেখ্‌লাম।

(কিলেনমার্গ)

এখান হ'তে আরও উপরে চার মাইল দূরে কিলেনমার্গ। বৃষ্টির জন্য আমাদের সেখানে যাওয়া হ'লো না। শুন্‌লাম—কিলেনমার্গ একটী উপত্যকা। গুলমার্গ অপেক্ষা এখানে বেশী শীত। রাস্তা খুব চড়াই ও খারাপ। বৃষ্টির সময় সেখানে যাওয়া উচিত নয়। আকাশ পরিষ্কার থাক্‌লে সকলে সেখানে গিয়ে থাকেন। এখান হ'তে কিলেনমার্গ পর্ব্বতের গায়ে অনেক জঙ্গল দেখা গেল। কিলেনমার্গ উপত্যকার সম্মুখেই পীরপঞ্জাল পর্ব্বতশ্রেণী। তাহার অপর পারে জম্বুরাজ্য। পীরপঞ্জাল পর্ব্বত প্রায় পনর হাজার ফুট উচ্চ।

(আলপাথর)

কিলেনমার্গের উপরে আলপাথর পর্ব্বত। উহার উপরিভাগ প্রায় বরফে ঢাকা থাকে। গুলমার্গ হ'তে আলপাথরের বরফের পাহাড় বেশ দেখা যায়। বলা বাহুল্য—সেখানে ঠাণ্ডা অত্যন্ত বেশী। পথ আরও দুর্গম। কিলেনমার্গ হ'তে অশ্বপৃষ্ঠে কিছু দূর গিয়ে পদব্রজে উপরে উঠ্‌তে হয়, এবং বরফের উপর দিয়ে যেতে হয়, কারণ সেখানে অশ্ব-পৃষ্ঠে যাওয়া যায় না, এবং সকলেরও সেখানে যাওয়া উচিত নয়।

আমরা কিছুক্ষণ গুলমার্গে বেড়িয়ে সেখান হ'তে ফিরলাম। তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। ট্যানমার্গ হ'তে পাঁচটার সময় মোটর ছাড়বে, আমাদের তার পূর্ব্বে সেখানে পৌঁছাতে হবে, সুতরাং আমরা সত্বর ট্যানমার্গ-অভিমুখে যাত্রা ক'রলাম। ফেরবার সময় উৎরাইএর ভাগ বেশী। অশ্বারোহণে চড়াই অপেক্ষা উৎরাই বেশী বিপদজনক। প্রতি মুহূর্ত্তে অশ্বপৃষ্ঠ হ'তে আরোহীর পতন সম্ভাবনা। উৎরাইএর পথে অশ্বারোহীর অত্যন্ত সাবধানতার প্রয়োজন। ইহা চন্দন বাড়ীর পথে বিশেষ রূপে অনুভব ক'রেছিলাম।

এখন প্রায় চারটা। বৃষ্টি নাই, মেঘ ভেদ ক'রে মাঝে মাঝে সূর্য্য দেখা দিচ্ছেন। বাম পার্শ্বে মহীক্কার পর্ব্বতের উচ্চ স্তর ক্রমে ক্রমে উপরে উঠে গেছে এবং দক্ষিণে ভীষণ খাদ। এই খাদ দেবদার, পাইন ও অন্যান্য বহুবিধ বৃক্ষে পরিপূর্ণ জঙ্গল। খাদের পরেই গগন-চুম্বী পর্ব্বতের পর পর্ব্বতশ্রেণী—যেন শেষ নাই। মহীক্কার পর্ব্বতের অঙ্গ বেষ্টন ক'রে উর্দ্ধ এবং অধোভাগে মেখলার ন্যায় সর্পগতি পার্ব্বত্য-পথ চ'লে গেছে। এই পর্ব্বতের শিরোভাগে মহীক্কারনাথ মহাদেবের বিশাল মন্দির আছে। আমাদের ভাগ্যে আর দর্শন ঘ'টলো না, উদ্দেশেই প্রণাম ক'রলেম। কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে দক্ষিণে দ্রং পর্ব্বত—জঙ্গল ও মেঘে আবৃত হ'য়ে র'য়েছে। ইহার উপর সূর্য্যের কিরণ পড়ায় মেঘ ও রৌদ্রের একত্র সমাবেশে বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে। এখন বৃষ্টি নাই, পশ্চিম গগনে মেঘ অপসারিত হওয়ায় সূর্য্য প্রকাশ পেয়েছেন, সুতরাং পথিপার্শ্বস্থ দৃশ্যগুলি আলোকিত হ'য়ে উঠেছে। করুণাময় ভগবান, আমাদের পার্ব্বত্য পথে—পর্ব্বতের উপরে, মেঘ-বৃষ্টি-তুষারপাত এবং রৌদ্রের খেলা সমস্তই দেখালেন।

ইহার পর পেরম্পুর পর্ব্বত। এই স্থান হ'তে রজত-রেখার ন্যায় নদী দৃষ্টিপথে পতিত হ'লো। এই স্থান শুড মৎস্যের জন্য বিখ্যাত। এখানে

অনেকেই মৎস্য শিকারে এসে থাকেন। ইহার পর রংমোর পর্ব্বত, তার পর যাবইথং পর্ব্বত। এই সকল পর্ব্বতের এবং মহীন্কার পর্ব্বতের উপত্যকার নাম পেরম্পুর উপত্যকা,—দৃশ্য অতিশয় মনোরম দেখাচ্ছিল। তখন বৃষ্টির পর সূর্য্যাস্তের কিরণ, আকাশ ভুবন পরিব্যাপ্ত ক'রে এই সকল পর্ব্বত ও উপত্যকার উপর, মেঘের ও জঙ্গলের উপর এবং দূর পর্ব্বতের উপরিস্থিত বরফের উপর পতিত হ'যে অপরূপ শোভার সৃষ্টি ক'রেছিল। আমরা সকলে এই অনুপম সৌন্দর্য্যের রসাস্বাদনে আনন্দ অনুভব ক'রতে ক'রতে অগ্রসর হ'লেম। ক্রমে পোস্কার পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরদেশ দৃষ্টিগোচর হ'লো। এই পর্ব্বতের উপর ট্রেস্ চশমা দেবাই বিরাজিত। ইহা হিন্দুদের একটী তীর্থ।

এই স্থানে এই পেরম্পুর নদীর রেখা মুক্তার ন্যায় শুভ্র এবং বহু শাখায় বহুদূরে ব্যাপিয়া বিভক্ত হ'য়ে গিয়েছে। ইহার উপলখণ্ড গুলি সমস্তই রজত বর্ণের। কত হীরা, কত শুক্তি যেন এই দুগ্ধ-প্রবাহিতার গর্ভে এবং কূলে বিছিয়ে রাখা হ'য়েছে। এই উপত্যকার বৃক্ষগুলি ছোট ছোট ঝোপের মত দেখা যাচ্ছিল। ইহার উপর যেন নানা বর্ণের ফুলের চাষ হ'য়েছে। লাল, নীল, সবুজ, হরিদ্রা প্রভৃতি বহুবিধ বর্ণের রূপের তরঙ্গ যেন বায়ু-হিল্লোলে মাঠের উপর তরঙ্গিত হ'য়ে যাচ্ছিল। দূরে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণীর উপর রৌদ্র পতিত হ'য়ে, তাহারই প্রতিচ্ছবি এই ক্ষেত্রের উপর প্রতিভাসিত হ'য়েছে। অনেকেই আকাশে ইন্দ্রধনুর খেলা নয়ন গোচর ক'রেছেন, কিন্তু এই ক্ষেত্রের উপর অতি চমৎকার বর্ণ বৈচিত্র্যময় ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি হ'য়েছে দেখ্‌লাম। ইহাই কি মরীচিকা?— কে জানে! কিন্তু ইহা ধারণ ক'রতে ইচ্ছা হয়। ইহার পাছু পাছু ছুটতে ইচ্ছা হয়। রৌদ্র যেন ইহার সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে অগ্রসর হ'চ্ছিল। বরাবর ট্যানমার্গ পর্য্যন্ত এই উপত্যকার বিস্তৃতি। পেরম্পুর

নদী এই সকল পর্ব্বতশ্রেণী দক্ষিণে রেখে পোস্কার পর্ব্বতের পাদদেশ দিয়ে কোন্ অনির্দ্দিষ্ট পথে চলে গেছে। এইসব দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রায় পাঁচটার সময় আমরা ট্যানমার্গে উপস্থিত হ'লাম।

অতি কষ্টে ডাণ্ডি হ'তে নেমে নিকটবর্ত্তী একটী ছোট কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হোটেলের মধ্যে গিয়ে ব'সলাম। শীতে হাত-পা আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে, তখনও জামা কাপড় শুকায় নাই। হোটেলের লোকেরা আমাদের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। তাহাদের গায়ের লুই দু'খানা খুলে আমাদের গায়ে দিয়ে দিলে এবং কাঙ্গড়িতে আগুন এনে দিলে। এই কাঙ্গড়ি সাজির মত হাতলবিশিষ্ট বেতের চুপড়ি, মধ্যে একটী হাঁড়ি—ইহাতে আগুন থাকে। হাতলটী তিনটী শিরবিশিষ্ট টুপির আকারে নির্ম্মিত। একদিক খোলা, ঐ দিক দিয়া আগুন রাখে। এই কাঙ্গড়ি এদেশের লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে রাখে। ইহা কাপড়ের ভিতর রাখ্‌লেও পোড়বার ভয় নাই। তাহারা আমাকে বালিকার ন্যায় এই কাঙ্গড়ি আমাব কোলে বসিয়ে, তাদের গায়ের লুই খুলে আমার সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে দিলে। কি খাদ্যের হুকুম হয়, তাহা প্রস্তুত করবার জন্য ব্যস্ত হ'লো। আমি কিছুই খেলেম না, উনি চা, পরেটা ও মাম্‌লেট আহার ক'রলেন। পণ্ডিতজী এখানে কিছু আহার না ক'রে তাঁহার বন্ধুর বাড়ী চ'লে গেলেন। আমি এই অবসরে গায়ের কাপড়খানা সেই আগুনে কতকটা শুকিয়ে নিলাম, এবং হাত দু'টাও একটু গরম ক'রে নিলাম।

আমরা এখানে একটু বিশ্রাম ক'রে পুলিস এবং অন্যান্য লোককে কিছু কিছু বক্‌সিস্ দিয়ে প্রায় ছ'টার সময় শ্রীনগর-অভিমুখে রওনা হ'লাম। এই সময় মোটরের যথেচ্ছা গতি, স্থানে স্থানে দাঁড়িয়ে চালকেব বন্ধু সম্ভাষণ, আমাদের সাতিশয় কষ্টদায়ক হ'চ্ছিল। জম্মুর পথে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় দু'দিন ধ'রে এই কষ্ট ভোগ ক'রেছিলাম। যাহা হোক,

আট্‌টার পর আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। পণ্ডিতজী নীচে থেকেই চ'লে গেলেন। আমি অতি কষ্টে কোনও রকমে তিন তলায় আমাদের কামরার মধ্যে গিয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে প'ড়লাম্। ঠাণ্ডায় শীতে ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তখন আমার এত কষ্ট হ'চ্ছিল,যে, কথা বলবার সামর্থ্যও ছিল না। উনি হোটেলে ব'লে দিলেন, যত শীঘ্র সম্ভব—দু'কাপ চা ও পরেটা দাও। শীঘ্র আহারীয় সামগ্রী হাজির হ'লো, সেই অবস্থায় চা ও পরেটা আহার ক'রলাম। সে দিন আব উঠ্‌তে পারি নাই, বস্ত্র গায়েই শুকিয়ে ছিল।

২৯ শে বৈশাখ, মঙ্গলবার—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে জোরে বারি বর্ষণ। পথ কর্দ্দমাক্ত। এ দিন আর ঘর ছেড়ে বাহির হই নি। ঠাণ্ডায় ও শীতে সমস্ত দিন ঘরের মধ্যে জড়সড় হ'য়ে থাক্‌তে হ'য়েছিল। এ দিন সমস্ত দিন-রাত এই ভাবেই কেটেছিল।

ঝিলমের বাঁধ

পরদিন ৩০ শে বৈশাখ, বুধবার—সকালে কিছু জলযোগ ক'রে বাহির হওয়া গেল। সে দিন আকাশ পরিষ্কার—মেঘ বা বৃষ্টি কিছুই নাই। ক্রমে ক্রমে ঘুরতে ঘুরতে আমরা ঝিলমের বাঁধে এসে উপস্থিত হ'লাম। নদীর গর্ভ হ'তে বহু উচ্চে প্রশস্ত বাঁধ। নদীর দিকে রেলিং দেওয়া,—অপর দিকে বড় পোষ্টাফিস, ক্লাব, ফটোগ্রাফারের দোকান এবং অন্যান্য নানাবিধ বড় বড় দোকান প্রভৃতি শোভা পাচ্ছে। রাজ-পথে নাম্‌বার জন্য মধ্যে মধ্যে প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপান। অপর দিকে নদী-গর্ভে হাউস্ বোট বা শিকারায় যাবার জন্য মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি কাঠের সোপান র'য়েছে। এখানে ঝিলম বেশ প্রশস্ত। নদীর উপর বহুতর ছোট বড় নানা রকম সুন্দর ও সুদৃশ্য বোট ভাস্‌ছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি দশ বার হাত চওড়া ও কুড়ি পঁচিশ হাত লম্বা,—ইহার ছোট বড়ও আছে, এ গুলি সবই একতলা। ইহাদের ছাদগুলি রেলিং দিয়ে ঘেরা এবং টেবিল, চেয়ার ও ইজিচেয়ার দ্বারা সজ্জিত। ফুটন্ত ফুল গাছের টব দ্বারা বাগানের মত ক'রে সাজিয়ে রেখেছে। এইগুলিই কাশ্মীরের বিখ্যাত ডুঙ্গা বা হাউস্ বোট। ইহার ভিতর অনেকগুলি কামরা, তাহার বিস্তৃত বিবরণ অন্য স্থানে লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছে। বাকিগুলি শিকারা। শিকারাগুলি অতি সুন্দর ভাবে সজ্জিত। এখান-কার দৃশ্য বড়ই মনোরম। বাঁধের উপর প্রশস্ত পথ। বড় বড় গাছে পথটীকে ছায়া-শীতল ক'রে রেখেছে। বেড়াবার উপযুক্ত স্থান। আমরা সেখানে অনেকক্ষণ বেড়িয়ে ফের্‌বার মুখে এক ফটোগ্রাফারের দোকানে গিয়ে কয়েক্‌খানি কাশ্মীরের দৃশ্য-ফটো ক্রয় ক'র্‌লাম এবং পথে বেতেরও

কিছু কিছু দ্রব্যাদি ক্রয় ক'বে বেলা প্রায় এগারটাব সময় হোটেলে ফিরলাম। পরদিন পহেলগামে যাবার জন্য পথে এক মোটর অফিসে যাওয়া গেল। মোটরওয়ালা সন্ধ্যার সময় হোটেলে এসে ভাড়া স্থির ক'র্‌বে—এইরূপ কথা হ'লো। কারণ তখন পণ্ডিতজী উপস্থিত থাক্‌বেন, ভাড়ার কথা তাঁর সঙ্গে হওয়াই ভাল। শ্রীনগর হ'তে পহেলগাম ষাট মাইল। সাধারণতঃ যাওয়া-আসা কাবের ভাড়া পঁয়ত্রিশ চল্লিশ টাকা।

হোটেলে ফিরে উনি হোটেলের ম্যানেজারকে পরদিন পহেলগাম যাবার কথা বলাতে, ম্যানেজার ব'ল্‌লেন, "আমাদের অর্থাৎ হোটেলের মোটর এখনি পহেলগাম যাবার জন্য প্রস্তুত র'য়েছে,—আপনারা এই গাড়ীতেই যান, ইহাতে বোম্বাইদেশীয় একটী স্ত্রীলোক যাবেন, সুতরাং আপনাদেরও যাবার সুবিধা হ'বে। পহেলগামে এই হোটেলের যে ব্রাঞ্চ আছে, তাহার ম্যানেজারও এই গাড়ীতে যাচ্ছেন, তাঁকে ব'লে দিচ্চি, সেখানে আপনাদের কোনও অসুবিধা হ'বে না। আপনাদের দু'জনের শুধু যেতে সাত টাকা ভাড়া লাগ্‌বে।" তাঁর কথায় আমরাও এই গাড়ীতে যাওয়া স্থির ক'রলাম, এবং তাড়াতাড়ি আহারাদি ক'রে চার পাঁচ দিনের মত আবশ্যকীয় কতকগুলি জিনিষপত্র ল'য়ে বাকি জিনিষগুলা ম্যানেজারের জিম্মায় রেখে একটার সময় পহেলগামের উদ্দেশে রওনা হ'লাম। পথে বোম্বাইদেশীয় একটী ভদ্র দম্পতি উঠ্‌লেন। সুবিধা হ'লো—একটী সঙ্গিনী জুট্‌লো।

পুরাণাধিষ্ঠান

শ্রীনগর হ'তে চার মাইল দূরে পুরাণাধিষ্ঠান নামে এক গড়খাই ভগ্ন মন্দির দেখা গেল। খৃষ্ট দশম শতাব্দীতে কাশ্মীরের মহারাজ পার্থ ইহা নির্ম্মাণ করেন। প্রায় ত্রিশ ফুট উচ্চ ও আঠার বর্গ ফুট ব্যাপিয়া এই মন্দিরের অবস্থিতি। ইহার গঠন-ভঙ্গী অতিশয় সুন্দর। একটী জলাশয়ের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। এক সময়ে এখানে যে স্থপতি-বিদ্যা উন্নতি লাভ ক'রেছিল, তাহা এই ভগ্ন মন্দির দেখ্‌লে বেশ বুঝা যায়।

জাফ্‌রাণ ক্ষেত্র

পরে আরও চার মাইল পথ অতিক্রম ক'র্‌লে পামপোর গ্রামে জাফ্‌রাণ ক্ষেত্র দেখ্‌তে পাওয়া গেল। বহুদূর বিস্তৃত মাঠের পর মাঠ এই ক্ষেত্রের অবস্থান। দেখ্‌লাম, জাফরাণের ছোট ছোট গাছগুলি এখনও সম্পূর্ণ বিকসিত হয় নাই। পাশে চারিদিকে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে র'য়েছে, দেখ্‌তে নীল বর্ণ আকৃতি, বেশ বড়। গাইড এই ফুল একটী নিয়ে আমাদের সকলকে দেখালে এবং ব'ল্‌লে, জাফরাণের ফুল কতকটা এই প্রকার। জাফরাণ ফুলের বর্ণ—রক্ত নহে নীল। এর যখন ফুল ফুট্‌বে, তখন তা'র সৌরভে ও সৌন্দর্য্যে এখানকার সমস্ত স্থান আলোকিত ও আমোদিত ক'রে দেবে। এই সৌন্দর্য্য দেখ্‌বার জন্য

তখন অনেকে এখানে এসে থাকেন। আমাদের ভাগ্যে তা' ঘ'টলো না. —কারণ এখন সে সময় নয়। জাফরাণ একমাত্র কাশ্মীরেই জন্মায়, অন্য কোথাও হয় না। কাশ্মীবের ধনী ব্যক্তিগণ জাফবাণ চাষের প্রতি অতিশয় মনোযোগী, সেজন্য তাঁদের উদ্যমও যথেষ্ট। জমির মালিকেরাই জাফরাণের বীজ সরবরাহ ক'রে প্রজাদের দ্বারা ইহা উৎপন্ন ক'রে থাকেন। এই মালিকদের জামিনদার বলে। জাফরাণ ভারতের সর্ব্বত্রই প্রেরিত হয়। কিন্তু আসলের সঙ্গে নকল জাফরাণও যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত ও বিক্রয় হয়। বিশেষ দেখে-শুনে ক্রয় না ক'র্‌লে, কাশ্মীরেও আসলের পরিবর্ত্তে মেকি কিনে ঠ'ক্‌তে হয়। আসল জাফরাণ ছোট ছোট ধূলার মত হয় না. তাহার পাতা বেশ বড বড় এবং তাহার সৌগন্ধ বহুদূর বিস্তৃত হয়। ইহার বর্ণ লঙ্কা-চূর্ণের মত রক্তবর্ণ। রজনী-গন্ধার ফুল যেমন বড বড় শীষের মাথায় ফোটে, তেমনি বড বড শক্ত বৃন্তের উপর ইহার নীল নীল ফুলগুলি ফুটে ওঠে। পাঠক ম'নে রাখ্‌বেন— এই জাফরাণ ফলিতে আমি নিজে দেখি নাই। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার নিজেরই সংশয় আছে। যদি কেহ জাফরাণ ফল্‌বার সময় গিয়ে থাকেন, তবে তিনি এই শোনা কথার সহিত তাঁহার চোখে দেখা জিনিষ মিলিয়ে নেবেন।

অবন্তীপুর

পাম্‌পোর হ'তে আট মাইল দূরে অবন্তীপুর গ্রামে উপস্থিত হ'লেম। মহারাজ অবন্তীবর্ম্মনের স্থাপিত অবন্তীপুর (খৃঃ ৮৫৫—৮৮৩) নবম শতাব্দীতে অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। অবন্তীবর্ম্মন্ অতি শান্তিপ্রিয় রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে নানারূপ সুকুমার শিল্পকলার উন্নতি হ'য়েছিল। তিনি অনেক মন্দির ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। এখন তার ভগ্নাবশেষ আছে মাত্র। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ তা' মাটি খুঁড়ে বা'র ক'রে পুরাতন স্মৃতি এখনও জাগরূক রেখেছেন। বহুদূর পর্য্যন্ত প্রাচীর ঘেরা, তা'র মধ্যে পাথরের ঘর বাড়ী, দালান, সোপান, মোটা মোটা স্তম্ভ, প্রাসাদ ও অট্টালিকার নিম্নাংশ দেখে একটী বৃহৎ রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ব'লে বেশ বুঝা যায়। ধ্বংস স্তূপ নহে, কারণ স্খলিত ভগ্নাংশ পরিষ্কৃত হ'য়েছে, সে গুলি ভারতের অতীত গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতি স্বরূপ ভগ্ন পঞ্জর রূপে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তা এরই পাশ দিয়ে ঘুরে চ লে গেছে।

অবন্তীনাথের মন্দির

আরও কিছুদূর গিয়ে একটী ভগ্ন মন্দির দেখা গেল,—কি বৃহৎ মন্দির! তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা, রাস্তা হ'তে দশ বার হাত নীচু জমিতে এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অবস্থিত। এখানে সোপান বেয়ে নাম্‌তে হয়। মন্দির তিন চারটী অংশে বিভক্ত। মন্দির, নাট-মন্দির ও চতুর্দ্দিকে নানা দেব-দেবীর মন্দির ছিল ব'লে মনে হয়। কারণ সেইরূপ সরঞ্জাম প্রকোষ্টের নীচের অংশগুলি অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে। বড় ভাঙ্গা ফটকের ঠিক সম্মুখে শেষ ভাগে খুব উচ্চ স্তরে বহু সোপান বেয়ে উঠে দেখা গেল, মহাদেবের শূন্য পিণাক প্রায় দেড় হাত উচ্চ ক'রে গাঁথা ভগ্নাবস্থায় র'য়েছে। আহা, ইহাই বিখ্যাত অবন্তী-নাথের মন্দির! এই মহাদেবের মাথার উপর বোধ হয় দোলমঞ্চের মত গাঁথা ছিল। এখন মাত্র সরু সরু স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। যখন এই মন্দির সমুন্নত-শির ক'রে গগন চুম্বন ক'রতো,—যখন মন্দির-শীর্ষে উন্নত শিব-পতাকা পত্‌-পত্‌ শব্দে আকাশের গায়ে উড্ডীন হ'তো,—যখন ভক্তবৃন্দের মুখ-নিঃসৃত সুধামাখা স্তোত্রগাথা তান-লয়-সংযোগে সুস্বরে গীত হ'তো,—যখন বাদ্যভাণ্ডের গুরু-গম্ভীর ধ্বনি আকাশে প্রতিধ্বনি তুলে দিগন্তে ছুটে যেতো,—যখন ভারে ভারে পূজা-সম্ভার দেবতার ভোগের জন্য এখানে নীত হ'তো,—এবং যখন ভক্তের হৃদয়-সুধা দিয়ে এই দেবতার পূজা হ'তো,—তখন কে ভেবেছিল যে, এই দেবতাও একদিন ধরণীর ধূলির মধ্যে আত্মগোপন ক'রবেন! মানব, এত দেখেও কি তোমার হৃদয়ের অন্ধকার ঘোচে না? তুমি কত দিনের মানব, কত দিন থাক্‌বে? কত দিন তোমার অক্ষয় কীর্ত্তিসকল, অক্ষয়

নাম ধাবণ ক'রে জগতের মাঝে তোমার কীর্ত্তিসকল ঘোষণা ক'রবে? কে তোমার পুত্র—কে তোমার পবিবার? তুমি কাব সন্তান? এ সকল দ্বন্দ্ব তোমার কবে ঘুচ্‌বে? হায মানব! কালেব কি পবিণাম—একবাব দেখ! একবার অন্তরের অন্তঃস্থলে ভাবনা ক'রে দেখ, বুঝবে—কেবল স্বপন! সংসাবে কিছুই নাই—কেবল নাই, নাই, নাই!—

এই মন্দিরের তিনটী গেট। ভগ্ন গেট পূর্ব্বকালেব স্মৃতি বুকে নিযে প্রায পনব যোল হাত পর্য্যন্ত উচ্চ অবস্থায় দণ্ডায়মান র'য়েছে। প্রকাণ্ড স্তম্ভ,—প্রায় আট দশ হাত এর পবিসর; এই দেয়ালেব গায়ে অনেক দেব-দেবীর মূর্ত্তি ক্ষোদিত র'য়েছে, মূর্ত্তিগুলি অতিশয় সুন্দব, বেশীর ভাগ হনুমানজীর। প্রায সমস্তই অখণ্ড অবস্থায় আছে। কাপড়ের পাড, গলার হার, হাতেব বাজু ও কঙ্কণগুলিতে অতি সুন্দব কারুকার্য্যের শিল্পকলা ফুটে উঠেছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলেম, আরও দেখ্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছিল,—সময় হ'লো না। পর পর বড বড তিনটী মন্দির দেখ্‌লেম। এই মন্দির দেওঘরের ৺ বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিবেব মত কতকটা মনে হয়। প্রকাণ্ড স্থান। কতকগুলি মাটির জালা এখান হ'তে বাহির হ'য়েছে। সে গুলি এক দিকে সারি সাবি সাজিযে রাখা হ'য়েছে। প্রবাদ—এ গুলি পাণ্ডবেব আমলেব জালা। এই সব দেখে আমরা মোটরে ফিরে এলাম। আমাদের সঙ্গে বোম্বাইবাসিনী স্ত্রীলোকটী ছিলেন ব'লে আমার বেশ একটু আনন্দ ও সুবিধা হ'য়েছিল।

আৰ্য্যাবৰ্ত্ত

বিজবিহারা

অতঃপর আমরা আরও ন'দশ মাইল দূরে বিজবিহারায় এসে উপস্থিত হ'লেম। বিজবিহারায় একটী চেনারবাগের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড উচ্চ মহাদেবের মন্দির। সম্মুখে স্রোতস্বিনী নদী। নদীর তীরে বাঁধা ঘাট। ঘাটের ঠিক উপরেই এই দেবালয়। পাশে একটী বৃহৎ চেনার গাছের তলা বাঁধান,—তার উপর এক খানি কাঠের ঘর। এখানে একটী ব্রাহ্মণ ব'সে আছেন। এই গাছের পরিধি ছত্রিশ হাত। কাশ্মীরের মধ্যে এত বড় চেনার গাছ আর কোথাও নাই। সুন্দর প্রশস্ত ছায়াময় শীতল এই স্থানটী। এমন সব জায়গায় এলে আর ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছা হয় না। মন্দিরটী ঘুরে ফিরে দেখে শুনে সঙ্গের লোকগুলি ফিরে যায়, আমার আর মন্দিরের ভিতর বুঝি দেখা হয় না। লোকগুলি কি—এমন স্থানে এসেও কিসের মন্দির তা জানবার স্পৃহাও হয় না! অথচ এত টাকা খরচ ক'রে দেখ্‌বার জন্যই বেরিয়েছে! আমার একটু ঘৃণা হ'লো। এরা সব চলে যায় দেখে, আমি তাড়াতাড়ি ঐ চেনার গাছের তলায় উপবিষ্ট ব্রাহ্মণটীকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে গেলাম, তখন আমার পাছু পাছু ঐ ব্যক্তিগণও ফিরলেন। ঐ লোকটীকে জিজ্ঞাসা ক'রতে জানা গেল—এই মন্দির মহাদেবের। দর্শনের অভিপ্রায় জানালে, ঐ লোকটী আমাদের জিজ্ঞাসা ক'রলেন, আমরা কোথা হ'তে এসেছি, আমরা কি জাতি—হিন্দু কি না? আমরা সকলে হিন্দু ব'লে পরিচয় দিলাম। তখন ব্রাহ্মণ ব'ল্‌লেন, 'জুতা খুলে ঐ নদীতে হাত-পা ধুয়ে ভিতরে গিয়ে দর্শন কর।' তিনি আমাদের মধ্যে একজনকে মন্দিরের চাবি দিলেন। আমরা নদীতে হাত-মুখ ধুয়ে দর্শন ক'রতে

গেলাম। মন্দিরের কক্ষ প্রশস্ত, প্রকাণ্ড একটী লিঙ্গমূর্ত্তি মধ্যস্থলে স্থাপিত। পিনাকের উপর একাদশটী ছোট ছোট শিবলিঙ্গ। পিনাকের পাশে একটী সিংহাসনে তিন চারটী বড় বড় শালগ্রাম শিলা ও একটী স্ফটিকের মহাদেব। পবিত্র দর্শন।—ইচ্ছা হ'লো এখানে ব'সে একটু জপ করি, কিন্তু সময় হ'লো না। মন্দিরের গায়েই একটী বিষ্ণু মন্দির। এখানে গরুড়ের উপর লক্ষ্মী-নারায়ণের মস্ত বিগ্রহ বসেছেন। শিবমন্দিরের সম্মুখেই ঘাটের উপর ছোট একটী মন্দিরে শ্বেত পাথরের একটী বৃষের মূর্ত্তি। আমরা দর্শন ক'রে ফিরলাম।

আর্য্যাবর্ত্ত

আচ্ছাবল

এবার আচ্ছাবল-অভিমুখে চ'ললেম। আচ্ছাবল একটা বাগান। ইহাও পর্ব্বতের গায়ে এবং মুসলমান বাদশাহের প্রস্তুত ও একই ধরণের। তবে এ যেন একটা ফলের বাগান, চত্বরে চত্বরে উঠে গিয়েছে—পাঁচ ধাপ থাকে বিভক্ত। সর্ব্বোচ্চ শেষ চত্বরে পর্ব্বতের তলদেশে পাষাণ ভেদ ক'রে, বহুদূর পর্য্যন্ত কল কল ক'রে জল উঠ্‌ছে। দেখ্‌লে মনে হয়—একটা সমরেখা বহুদূর পর্য্যন্ত ফাট ধ'রে এই জল উঠ্‌ছে। এ যেন অফুরন্ত জল-ভাণ্ডার। এই জল সীমাবদ্ধ ক'রে একটা চওড়া নালা গাঁথা আছে। এই জলের পরই বাগানের রাস্তা। সঙ্গের লোকগুলি একটা ছোট দরজা দিয়ে উপরে আর একটা চত্বরে চ'লে গেল। আমরা এই পথের উপর ব'সে এই জল অঞ্জলি অঞ্জলি পান ক'র্‌লেম। এর উপরের আর একটা চত্বরে ট্রাউট মাছের চাষ হ'চ্ছে। পর্ব্বতের এই অংশে বহু বহু নির্ঝরের জল চারিদিক দিয়ে চ'লে গেছে। আমরা দেখ্‌তে দেখ্‌তে নেমে এলাম। বাগানে প্রবেশ-দরজা দু'টা,—একটা দিয়ে প্রবেশ ক'রেছিলাম, অন্যটা দিয়ে বা'র হ'লেম। গেটের কাছে মালীরা ডিসে ক'রে ছাড়ান আখ্‌রোট্‌, বাদাম, পেস্তা ও ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, উদ্দেশ্য—বাবুদের উপহার দিয়ে কিছু পুরস্কারের প্রত্যাশা। দু'টা ফুলের তোড়া গ্রহণ ক'রে মালীকে কিছু পুরস্কৃত ক'রে গাড়ীতে উঠ্‌লেম।

অনন্তনাগ

এবার আমরা অনন্তনাগে উপস্থিত হলেম। অনন্তনাগের আর একটী নাম ইছলামাবাদ। এই স্থানে চারিদিকে অংসখ্য নির্ঝর-বারি অনন্ত বারিধারার সৃষ্টি ক'রে—এই স্থানের অনন্তনাগ নামের সার্থকতা সম্পাদন করছে। একটী জলাশয় এই নির্ঝর-বারিতে পূর্ণ হ'চ্ছে। অসংখ্য মৎস্যে জলাশয়টী পূর্ণ। জলাশয়ের তীরে রামসীতার মন্দির। এই জলাশয়ের জল আর একটী জলাশয়ে গিয়ে পড়েছে। ইহার মধ্যস্থলে একটী পাথরের শিবলিঙ্গ নিমজ্জিত রয়েছে। জলাশয় গভীর নয়, জলের ভিতর হ'তে শিবলিঙ্গ দেখা যাচ্ছে। এই জল একটী নালার মধ্যে দিয়ে ঝর্ ঝর্ শব্দে নীচে চলে যাচ্ছে। বৃহৎ বাগান ফল-ফুলে পরিপূর্ণ, চেনারের ছায়ায় সুশীতল। রামসীতার মন্দিরের দক্ষিণে একটী বাঁধান কুণ্ড। ইহাই গন্ধক চশ্‌মা। জল অতিশয় স্বচ্ছ ও গন্ধকের গন্ধ বিশিষ্ট। এই জল নিত্য ব্যবহারে চর্ম্মরোগ থাকে না।

পহেলগামের পথে

এইবার পহেলগাম অভিমুখে গাড়ী ছুটলো। মধ্যে মর্ত্তণ গ্রাম, কিন্তু সেখানে নামা হ'লো না, কারণ আর দেরী ক'রলে পহেলগাম পৌঁছুতে রাত্রি হবে, পথ খারাপ। কথা হ'লো—ফেরবার মুখে মর্ত্তণ দেখা হবে। ক্রমে ক্রমে বরফের পর্ব্বত অতি নিকটবর্ত্তী হ'য়ে এলো। অতি ঘন বরফরাশির মত মেঘপুঞ্জ নেত্র-পথ অবরোধ ক'রে নেমে আসছে। পর্ব্বতও আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এই মেঘপুঞ্জের মধ্যে আমাদের গাড়ী দ্রুতবেগে প্রবেশ ক'রতে লাগলো। চোখে-মুখে মেঘের স্পর্শ অনুভব ক'রতে লাগলাম। আমরা মেঘের মধ্যে ডুবে গিয়ে সিক্ত হ'য়ে উঠলেম। কিছু পূর্ব্ব হ'তে বৃষ্টি আরম্ভ হ'য়েছে, ঠাণ্ডাও বেশ অনুভব হ'চ্ছে। 'বাস' মেঘরাজ্য পশ্চাৎ ক'রে অগ্রসর হ'চ্ছে। ক্রমে ঘোর দুর্দ্দর্শ পর্ব্বতমালা দৃষ্টিগোচর হ'লো। দিগন্ত-বিস্তারী কাননের ঘন নিবিড়তায় অবিচ্ছিন্ন চলাচল শ্যাম-শোভায় শোভাময়। এই সকল শৈলমালা বর্ণ-বৈচিত্র্যে অতিশয় মনোমুগ্ধকর। যথা-তথা বিচিত্র বর্ণের বন-কুসুম প্রস্ফুটিত হ'য়ে শৈল-কায়া আলোকিত ক'রছে। স্থানে স্থানে কুসুমকুঞ্জে লতিকার ফুল ফুটে মালার মত দোদুল্যমান। মনুষ্যের অগম্য বহু উচ্চে মেষ, মহিষ বা ধেনুগণ আনন্দে তৃণ ভক্ষণে নিযুক্ত। কোথাও বা শৃঙ্গে শৃঙ্গে অজাসকল নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছে; যথা-তথা প্রস্রবণ-ধারা নেমে আসছে; কোথাও বা এ সকল দৃশ্য অন্তরাল ক'রে শুধুই মেঘের দৃশ্য—গগনে ভুবনে ব্যাপ্ত হ'য়ে একাকার হ'য়ে যাচ্ছে। এ সকল চলন্ত মেঘ বারি বর্ষণ ক'রতে ক'রতে উড়ে যাচ্ছে। পথের এক পার্শ্বে খাদ,—অপর পার্শ্বে অভ্রভেদী হিমালয়। উপত্যকার বৈচিত্র্যময় শোভা আর উপরে দূরে বরফের শ্বেত

শোভায় মানব-মন বিমুগ্ধ। হিমালয়ের বক্ষ বাহিয়া আমাদের গন্তব্য পথ; 'বাস' ক্রমশঃ উপরে উঠ্‌ছে;—ক্রমশঃই অপ্রশস্ত ভীষণ পথে অগ্রসর হ'চ্ছে। কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল অপ্রশস্ত পথ। পথের পার্শ্বে প্রবল স্রোতস্বতী কল্ কল ছল্ ছল্ শব্দে মহানন্দে ছুটে চ'লেছে। আমাদের 'বাস' যেন তারই সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। পথ এত পিচ্ছিল যে, স্থানে স্থানে গাড়ী পিছন দিকে স'রে আস্‌ছে—বিশেষতঃ চড়াইএ ওঠ্‌বার সময়। এক জায়গায় চড়াইএর মুখে গাড়ীর চাকা বন্ বন্ ক'রে ঘুর্‌তে লাগ্‌লো, কিছুতেই এগুতে পারছে না; তখন ড্রাইভারের কথামত সকলেই গাড়ী হ'তে সেই কাদার উপর নাম্‌লেন—সঙ্গের সেই স্ত্রীলোকটী পর্য্যন্ত, কেবল আমি একা ব'সে রইলাম। ড্রাইভার অতি কষ্টে সেই কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ পার ক'রে নিয়ে গেলো। সেই ভীষণ পথ সকলে পায়দলে অতিক্রম ক'রে আবার গাড়ীতে এসে উঠ্‌লেন। ক্রমে অন্ধকার হ'য়ে আস্‌ছে। বাস তীরের মত ছুট্‌ছে। ক্রমে পর্ব্বতের ভিন্ন দিকে বাস ঘুরে এলো। এখানে নদী আমাদের সঙ্গ ত্যাগ ক'রে নিম্নে উপত্যকা-ভূমিতে বহু শাখায় বিভক্ত হ'য়ে ছুটে চ'লেছে। বাস ক্রমেই ঊর্দ্ধে উঠ্‌ছে। নীচে জলপ্লাবিত ভূখণ্ডে দ্বীপের মত স্থলগুলি উপবনের মত দেখাচ্ছে। এই স্থলের উপলখণ্ডগুলি অন্বেষণ ক'রলে রত্ন মিলে কিনা জানিনা, কিন্তু হীরকোজ্জ্বল মুক্তারাশির শোভায় সমন্বিতা স্রোতস্বতী-শোভনা উপত্যকাভূমিকে দর্শন ক'রলে মনে হয়, যেন সিক্ত বসনা অনন্ত প্রকৃতি সতী, এই বিভাগের পর্ব্বতময় নীল দেহতলে রত্নময় চরণমঞ্জীর ধারণ ক'রেছেন। আর তাঁর সমুন্নত শিরে বিরাট শ্বেত-শোভাযুক্ত তুষারের মুকুট ধারণ ও সবুজ রেশমী বস্ত্রে অঙ্গ আবরণ ক'রে রত্নমালা সম শত শত নির্ঝরিণী প্রেমরূপা নয়নাশ্রুতে সিক্ত ক'রে সমাধিমগ্না। অহো—কি হৃদয়গ্রাহী রমণীয় দৃশ্য, প্রকৃতির কি ভাবময় রূপ!

আর্য্যাবর্ত্ত

পহেলগাম

শীতে জমাট হ'য়ে বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে সন্ধ্যা ৮টার সময় আমরা পহেলগামে পৌছালেম। শৈলগাত্রে—চারিদিকে শ্যামল তৃণের তলে বজ্‌বজে কর্দ্দমময় একটী ক্ষুদ্র উপত্যকায়—একটী মস্ত কাঠের বাড়ীর সম্মুখে আমাদের বাস গতি সংযত ক'রলে।

এই কাঠের বাড়ীটি শ্রীনগরের খালসা হোটেলের একটী শাখা। বাড়ীখানা মস্ত লম্বা দোতলা, সমস্তই কাঠের তৈয়ারী। সুন্দর গঠন, এখনও রং পালিস হয় নাই, নূতন প্রস্তুত হ'য়েছে—কতক অংশ এখনও বাকী। উপর নীচে অনেকগুলি ঘর। একবার বাড়ীটার প্রতি চোখ বুলিয়ে নিলাম। উঃ—কি কন্‌কনে ঠাণ্ডা—সর্ব্বশরীর যেন জমাট বেঁধে গিয়েছে! আস্তে ব্যস্তে আমরা সকলে মোটর হ'তে নেমে প'ড়লাম। বাহিরের মাঠের খোলা হাওয়ায় আরও যেন কাঁপিয়ে তুল্‌লে। দেখ্‌লাম, সেখানে যতগুলি লোক র'য়েছে সব গুলিরই আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে জড-সড় অবস্থা। কতকগুলি মেম সাহেব ছেলে-পুলে নিয়ে থর্ থর্ ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপ্‌ছে। সঙ্গের লোকগুলি নীচের এক একটী ঘর দখল ক'রলেন, আমরা উপরের একটী ঘর পছন্দ ক'রলেম। উপরে বারাণ্ডায় উঠে কি 'মহতোমহীয়ান্' পার্ব্বত্য দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হ'লো। অবশ্য এই দৃশ্য কাশ্মীরের চতুঃসীমানায় অবস্থিত। কিন্তু দূর হ'তে তো এমন ক'রে উপভোগ করি নাই। যে নিস্তব্ধ জঙ্গলাকীর্ণ গগনচুম্বী পর্ব্বতমালা শুভ্র তুষারাচ্ছন্ন শিরে হীরকদ্যুতি বিকীর্ণ ক'র্‌ছে যাহার শিরোদেশ হ'তে শতধারায় গলিত তুষার—নীল অঙ্গের শোভা শতগুণ বৃদ্ধি ক'রে শুভ্র বেণী অথবা ফণীর আকারে পৃথিবীর বুকে ছুটে আস্‌ছে—সেই যোগীরাজ পর্ব্বতের চরণতলে আমরা উপনীত হ'য়েছি। আমরা যে স্থানে এসেছি,—এই স্থানটী পর্ব্বতের শিরোদেশ হ'তে অতলস্পর্শী একটী ক্ষুদ্র উপত্যকা। ইহার চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বত-বেষ্টিত। এখানে আস্‌বার

পার্ব্বত্য পথ্‌টা এমন ভাবে ঘুরে গিয়েছে যে, তাহার অস্তিত্ব কিছুই বুঝা যায় না। এ যেন দেবগণের অথবা এই পাষাণ-ঋষিগণের একটী হোমকুণ্ড। নির্জ্জন স্থানে হোমকুণ্ডেব চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হ'য়ে এই পাষাণ-ঋষিগণ সমাধিস্থ। কি সুন্দর শান্তিময় স্থান! যদি শান্তি ভঙ্গ হয়—এই ঋষিগণের যেন এই আশঙ্কায় ক্ষুদ্র একটী শব্দ মাত্রও উচ্চারণ করতে জিহ্বা সঙ্কুচিত হ'য়ে প'ড়ছে। প্রকৃতির এই বিশাল দৃশ্য-পটের মধ্যে ডুবে গিয়ে আত্মবিস্মৃত হ'লেম। অন্তরে সকল ভাবনা তিরোহিত হ'য়ে কেমন একটী স্তব্ধ ভাবসমাধির মধ্যে মন আপনা হ'তে নিমগ্ন হ'য়ে গেল। সম্মুখেই নিম্নভূমিতে পর্ব্বতের চরণ-চুম্বিত ক'রে দুধগঙ্গা মুক্তামালা অঙ্গে ধারণ ক'রে কিশোরীর ন্যায় রূপের লহর তুলে দিয়ে নির্জ্জন কাননে মুক্তস্বরে সঙ্গীতের কলতানে কাহার উদ্দেশে বনান্তরালে ছুটে চ'লেছে! গানে—প্রাণে কিসের অনুভূতি জাগিয়ে দেয়! এ নীরব নিথব পর্ব্বতশ্রেণী কাহাব ধ্যানে নিমগ্ন র'য়েছে?—এই যে শত শত অশ্রুমালা পর্ব্বতের শ্বেত কপোল বহিয়া নির্ঝর বা তটিনীর আকারে ঝর ঝর ক'রে নেমে আস্‌ছে—এ কাহার উদ্দেশে? এই যে অরণ্যরূপ রোমাঞ্চ পর্ব্বতের সর্ব্ব অঙ্গ কণ্টকিত ক'রে তুলেছে—এ কিসেব অনুভূতি-স্পর্শে? এত বড় অবণ্য মাত্র শব্দবিহীন নীরব নিস্তব্ধ হ'য়ে র'য়েছে—এ কাহার আগমন-প্রতীক্ষায়? পহেলগামে—প্রকৃতী সতী যাঁহার চরণে আপনার প্রতি অঙ্গ সমর্পণ ক'রে সমাধিমগ্না হ'য়েছেন, আমি সামান্য জীব, তাঁহার চরণে শতশত প্রণাম করি। যিনি অসামান্য যত্নে আমায় এই স্থানে নিয়ে এসেছেন যিনি আমার আশে-পাশে প্রাণে-প্রাণে নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছেন,—যিনি মোহন বাঁশরীব তানে আমাদের পথ দেখিয়ে এই নির্জ্জন কাননে নিয়ে এসেছেন, তাঁর চরণে সতত প্রণাম করি। যিনি জীবের জন্য অশ্রুজলে বুক ভাসিয়ে কেঁদে কেঁদে

বেড়াচ্ছেন—যিনি বাঁশরীর তানে, প্রকৃতির গানে—কেঁদে কেঁদে বিরহের গান গেয়ে গেয়ে—প্রাণে প্রাণে—কাণে কাণে ব'লে বেড়াচ্ছেন—"জীব জাগো, জাগো—আর ব্যথা দিওনা আমায়! দেখ, তোমাদের জন্য কত কাল কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছি, আমার কোল ছেড়ে কত কাল আমায় ভুলে থাক্‌বে? আমায় ভুলে আরও কত দুঃখ ভোগ ক'রবে? আমি যে তোমাদের ধরা দেবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছি। তোমরা কি মায়া-মোহ পরিত্যাগ ক'রে একবার চেয়ে দেখ্‌বে না? একবার আমায় পাবার জন্য আকুল হ'য়ে ডাক্‌বে না? সময় হ'য়েছে, ঘরে এসো!—আর ভুলে থেকো না, আপন স্বরূপ বুঝে চল, মায়া-মোহ ভুলে যাও। একবার আমায় আপন ব'লে ডেকে লও।" কই, এমন অনুভূতি আমি জীবনে কখনও তো অনুভব করি নাই। যিনি আজ অস্থিরমতি শোক-সন্তপ্তা রমণীর প্রাণে এমন শান্তি-সুধা ঢেলে দিলেন,—আমার সেই জগৎ-জীবন চিত্ত-রঞ্জন প্রাণতোষের চরণে আমি সহস্র সহস্র প্রণাম করি। অজ্ঞানে আবৃত চক্ষু অন্ধজীব আমি,—যাঁর করুণায় পাষাণ গ'লে জল হ'যে যাচ্ছে—তাঁর করুণার কণামাত্র বোঝ্‌বার ক্ষমতা আমার কোথায়? কিন্তু আমার চিত্ত যাঁর করুণায় শান্তি লাভ ক'রেছে, সেই দয়াময়ের চরণে আমি কোটী কোটী প্রণাম করি। যে সকল ক্ষণস্থায়ী বস্তুতে মুগ্ধ হ'য়ে সেই প্রাণা-রামকে ভুলে আছি,—দীনের ঠাকুর দীননাথ দয়া ক'রে সেই সকল বস্তু একে একে সরিয়ে নিয়ে সাড়া দিচ্ছেন! আরে মূঢ়, নিত্যের প্রতি আসক্তা হও—অনিত্যে মুগ্ধ হ'য়ো না। গুরুদেব! আমার কি কর্ম্মের অবসান হ'য়েছে?—আমায় ডেকে নাও। আমি অক্ষম জীব—তুমি প্রাণ স্বরূপ নারায়ণ, আমার ক্ষমতা নাই—তোমার স্বরূপ বোঝ্‌বার! অথবা আমি মিথ্যা চিন্তা করি। তুমি হৃষিকেশ, হৃদয়ে অবস্থান ক'রছ, আমায় যা করাবে, আমি তাই ক'র্‌বো।

মুগ্ধ হ'য়ে চারিদিকের দৃশ্যাবলী দর্শন ক'রছি, আর মস্ত লম্বা বারাণ্ডায় পাইচারি ক'রছি। উপরে একলা আমি, বারাণ্ডার এ প্রান্তে আর কেহ নাই,—অপর প্রান্তে কয়েকটী সাহেব-মেম র'য়েছে।

মোটর হ'তে মাল-পত্র নামিয়ে উনি উপরে এসে আমায় ডাক্‌লেন। ক্ষণেকের ধ্যান ভঙ্গ হ'য়ে গেল,—বাস্তবে ফিরে এলেম। কি ভয়ানক কন্‌কনে শীত! উনি আমায় ডেকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ ক'রলেন। ঘরে দু'খানা ক্যাম্প-খাট, একটা টেবিল ও দু'খানা চেয়ার আছে। বিজলি বাতি নাই, শুন্‌লেম শীঘ্রই আস্‌বে। ঘরের সঙ্গে ড্রেসিংরুম, তাতে টেবিল, চেয়ার, আরসি ও আল্‌না আছে, পাশে বাথ্‌রুম, বাথ্‌রুমের পর পাইখানা—কমোট দেওয়া। উপরের ঘরের দৈনিক ভাড়া তিন টাকা, নীচের ঘরের দু' টাকা। ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই একটী লোক, কি আবশ্যক—জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে এলো। হাত-মুখ ধোবার জন্য এক বাল্‌তি গরম জল দিতে ব'ললেম, এখানে বলা আবশ্যক যে কল নাই, আবশ্যকীয় জল খানসামারাই দিয়ে থাকে। উনি চা এবং টোষ্ট দিতে ব'ল্‌লেন। অবিলম্বে ট্রে ক'রে চার সরঞ্জাম এলো। চার কাপ চা তৈয়ার ক'রে ফেল্‌লাম। গরম জলে হাত-মুখ ধুয়ে এবং গরম গরম চা খেয়ে শরীরটা একটু গরম হ'লে কতকটা আরাম বোধ ক'রলাম। সে রাত্রে আর অন্য কিছু আহারের প্রয়োজন হয় নাই। আর একবার চা ও টোষ্ট খেয়ে শুয়ে প'ড়লাম। গরম পা-জামা, মোজা, জামা, সেমিজ এবং তুলার জামা, লেপ ও কম্বল মুড়ি দিয়েও শীতের জন্য ভাল ঘুম হ'লো না। আমরা পহেলগামে যে ক'দিন ছিলাম, সর্ব্বদা গরম জামা কাপড় পরা সত্ত্বেও শীতে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম। শীতের জন্য কোন দিন রাত্রে ভাল ঘুমাতে পারি নাই। সে দিন সমস্ত রাত বৃষ্টি হ'য়েছিল।

বাইসারণ

পরদিন ৩১শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার সকালে গগন ও কানন মেঘাচ্ছন্ন ছিল এবং মধ্যে মধ্যে বারিপাতও হ'চ্ছিল। এ কারণ আমরা একটু বেলাতেই উঠ্‌লাম। উঠে দু'জনে বেড়াতে বা'র হ'লাম। তখন মেঘ-বৃষ্টি কেটে একটু একটু সোণার বরণ রৌদ্র ঝিক্‌মিক ক'রে উঁকি দিচ্ছে। নীচে নেমে এসে দেখ্‌লাম, আমাদের সঙ্গীরা সকলেই বাহিরে গেছেন। উঁহারা অদ্যই শ্রীনগর ফিরে যাবেন, তজ্জন্য বৃষ্টির মধ্যেই এখানকার অন্যান্য স্থান দেখ্‌তে বেরিয়েছেন। আমরা উঠানে নাম্‌লাম, মনে হ'লো—কে যেন কচি কচি সবুজ ঘাসের ফুলের গুটি দেওয়া এক খানি নরম গালিচা অযত্নে বিছিয়ে রেখেছে। কোথাও উঁচু কোথাও নীচু—যেন গালিচাখানা নানা স্থানে কোঁচ্‌কা প'ড়ে র'য়েছে। আরামে পা দিলাম, কিন্তু পচ্‌ ক'রে জল ছিট্‌কে উঠ্‌লো। আগাগোড়া জমী জলে প্লাবিত হ'য়ে র'য়েছে। শুনলাম, এ স্থান হ'তে অন্য স্থানে যেতে গেলে, ঘোড়া ভিন্ন যাওয়া যায় না। নদী,জঙ্গল,পর্ব্বত ভিন্ন এখানে সমতল জমী নাই, সুতরাং রাস্তা ঐ সকলের উপর দিয়ে। ভাব্‌ছি—তবে কি হবে? আমার কি আর কোথাও যাওয়া হবে না?—হোটেলের বারাণ্ডায় ব'সে ব'সে, এই পর্ব্বত, জঙ্গল, নদী, মেঘ, বৃষ্টি আর রৌদ্র ভিন্ন আর কিছুই দেখা হবে না?—ভাবছি আর বলাবলি ক'রছি, মনটা কেমনই ক'রছে, এতদূর এসে অন্য কিছু না দেখে এম্‌নি ফিরে যাব? এখানে এসে যিনি চন্দন বাড়ী প্রভৃতি দেখ্‌তে যান, তাঁকেই অশ্বারোহণ ক'র্‌তে হয়—স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত। আমি কি অশ্বারোহণ ক'র্‌তে পার্‌বো না? কিন্তু পার্‌বো না ব'লে তো সংসারে কোন কথা নাই, একবার চেষ্টা ক'রে দেখি না

কেন ? এতদূর এসে এখানকার অন্যান্য দৃশ্য-স্থানগুলি না দেখে ফিরে যাওয়া বড়ই আপশোষের কথা। এখনই তো আমার সঙ্গিনী যুবতীটী অশ্বারোহণে গিয়েছেন, তবে আমি পারবো না কেন ? এই সব চিন্তা ক'রছি, এমন সময় দুটী মুসলমান যুবক আমাদের অশ্বের প্রয়োজন আছে কি না, জিজ্ঞাসা ক'রে সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। আমি সাহসে ভর ক'রে দু'টী অশ্বই আন্‌তে ব'ল্‌লেম। উনি ব'ললেন, 'পারবে তো ?' মুখে কিছু ব'ললেম না, মনে ভাব্‌লেম—না জানি আজ কপালে কি আছে ! 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' জেনে উনি দু'টী অশ্বই আন্‌তে ব'ললেন। উদ্দেশ্য 'বাই সারণ' যাওয়া। যুবক দু'টী অশ্ব আন্‌তে ছুট্‌লো। অশ্ব কোথায় ?—আস্তাবলে নয়, উপরে ঐ পর্ব্বতের গায়ে, খোস মেজাজে চ'রে বেড়াচ্ছে। ছাড়া অশ্ব ধরা সহজ নয়। তাড়া খেয়ে অশ্বযুগল পর্ব্বতের উপরে লাফাতে লাফাতে ছুট্‌ছে, পিছন পিছন অশ্বের মালিকেরাও ছুট্‌ছে। এই পাহাড়ী জাতির অসাধারণ ক্ষমতা। ঐ সকল স্থানে একবার উঠ্‌তে হ'লে আমাদের হাঁফ ধরে, আর ওরা কেমন অনায়াসে ওর উপর ছুটোছুটী ক'রছে। ধন্য এদের কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও সাহস ! এদের আর একটী সাহসের পরিচয় পেয়ে আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলাম :—রাওলপিণ্ডি হ'তে কাশ্মীর আসবার সময় পথে এক স্থানে দেখেছিলাম, দুই পর্ব্বতের মধ্যে এক প্রবল নদী—ভয়ঙ্কর চওড়া, প্রবল তুফান তুলে ভীষণ গর্জ্জনে ছুটে চ'লেছে। দু'দিকেই অভ্রভেদী পর্ব্বত। নদী পারাপার হবার জন্য একটী তার দুই পর্ব্বতের শিখরে শিখরে সংযোগ ক'রে খাটান র'য়েছে। ঐ তারের উপর হাত রেখে, এক ব্যক্তি হাতের ঝাঁকুনি দিয়ে জোড় পায়ে ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে নদী পার হ'য়ে এ পারে আস্‌ছে। পতনে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সেই ব্যক্তির এই দুঃসাহসিকতা দেখে, সার্কাসের তারের খেলা অতি তুচ্ছ ব'লে ম'নে হ'য়েছিল। যাহা হোক, ঐ

ব্যক্তিরা অশ্বের সঙ্গে ছুটাছুটী ক'র্‌ছে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা বেড়াতে লাগ্‌লেম।

দু'খানি মুদিখানার দোকান, দু'খানি জামার দোকান, একটী মাংসের দোকান ও একটী মদের দোকান, আর একটী হিন্দু হোটেল এবং এই খালসা হোটেল ভিন্ন এখানে আর কিছু নাই। একটী খেল্‌বার মাঠের মত উঁচু নীচু প্রান্তর এবং প্রান্তরের সীমায় ঐ অভ্রভেদী উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী স্থানটীকে বেষ্টন ক'রে রেখেছে। পর্ব্বতগুলি এত উচ্চ যে, উহার শিখরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'র্‌লে মাথা ঘুরে যায়। উহার শিরো-ভাগে হিমকণা জমিয়া রজত শুভ্র শোভার বিস্তার ক'রে র'য়েছে। তার উপর বালারুণের কিরণ প'ড়ে মুকুরের উপর রক্তচ্ছবির ছটার ন্যায় কোথাও রক্ত কোথাও শ্বেত-আভায় চক্ষু ঝলসিত ক'রে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। উহার তলে শুভ্র নদীর কূলে একটু বেড়িয়ে, আমরা ঘরে এসে অশ্বে সোয়ার হবার জন্য প্রস্তুত হ'লাম। ট্রাউজার এবং পেটি-কোটের উপর বেশ ক'রে জড়িয়ে পেট বাঁধ্‌লেম। সাড়ীখানা ঘুরিয়ে প'রে, অঞ্চলের অন্তরে সাড়ীর উপর বেশ করে এঁটে বেল্ট প'রলাম। ইহাতে কাপড় সর্‌বে না। পরে গায়ের কাপড়খানা পিছন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে এনে পায়ের দু'পাশ দিয়ে ঝুলিয়ে দিলাম, কারণ পায়ের কাপড় স'রে গেলেও গায়ের ওড়না ঠিক থাক্‌বে। ইহাতে আব্রু নষ্ট হবে না। প্রস্তুত হ'তে হ'তে অশ্ব এলো। পরিষ্কার জিন লাগান দু'টী শিক্ষিত অশ্ব। এখন উঠা যায় কি ক'রে—বড়ই বিভ্রাট। একটী উচ্চ পাথরের পাশে অশ্ব দাঁড় করিয়ে দিলে। আমি ঐ পাথরের উপর উঠে অশ্বে সোয়ার হ'লেম। ওঁর তো বালাই নাই, দিব্য সোয়ার হ'লেন। আমার অশ্ব আগিয়ে দিয়ে উনি পিছনে রইলেন। সহিস অশ্বের মুখ ধ'রে নিয়ে চ'ল্‌লো।

আমাদের গন্তব্য স্থান 'বাই সারণ।' এখান হ'তে দেড মাইল। উহা পর্ব্বতের উপর একটী ময়দান, প্রাকৃতিক শোভায় পরিপূর্ণ। ইহার শোভা দর্শন করবার জন্য অনেকেই এখানে এসে থাকেন। সহিস ঘোড়ার মুখ ধ'রে সোজা পর্ব্বতের উপর উঠ্‌তে লাগ্‌লো। একে বাঙ্গালীর মেয়ে ঘোড়ার পিঠে, তায় পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন ব্যাপার সোজা নয়। কেবল চড়াই, মধ্যে মধ্যে উৎরাইও আছে। অশ্বপৃষ্ঠে চড়াই অপেক্ষা উৎরাই বেশী বিপদজনক। একটী পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন ক'রে ঘোর কাননে প্রবেশ ক'রলাম। রাস্তা এক রকম নাই ব'ল্‌লেও হয়, দেখ্‌লে মনে হয়—এ পথে যাওয়া অসম্ভব। গাছের ডাল পথ রোধ ক'রে র'য়েছে। কোথাও কাত হ'য়ে, কোথাও শুঁড়ি মেরে মাথা বাঁচিয়ে চ'লতে হ'চ্ছে, তাতেও নিস্তার নাই। পায়ে কাঁটা লেগে কাপড় টেনে ধ'রছে, ছাড়িয়ে নিতে দেরী সয় না—ঘোড়া আপন মনেই চ'লেছে। কাঁটা লেগে পায়ের জুতা খুলে যাচ্ছে,—ট্রাউজার, মোজা ছিঁড়ে পায়ে কণ্টক বিদ্ধ হ'চ্ছে। এ সকল বিপদ হ'তে বাঁচ্‌বার জন্যও যথাশক্তি চেষ্টা ক'রতে হ'চ্ছে। কোনও টান ধ'র্‌লে তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার পিট হ'তে প'ড়ে যেতে হবে। বলা বাহুল্য যে—এ দেশে কানন, নদী, প্রান্তর সমস্তই পর্ব্বতের উপর—এ দেশটা একটী পর্ব্বত। সুতরাং কেবলই চড়াই, উৎরাই, খাদ ও নদী পার হ'তে হ'চ্ছে। এক এক স্থান এমন কর্দ্দমাক্ত ও পিচ্ছিল (অবশ্য বৃষ্টির জন্য) হ'য়েছে যে, মানুষের পা থাকে না। অশ্বের পা নিয়তই পিছ্‌লে হোঁচট খাচ্ছে। বিশেষ সাবধান না হ'লে অশ্বপৃষ্ঠ হ'তে ধরণী চুম্বন ক'র্‌তে হবে। চমৎকার শিক্ষিত অশ্ব, সোয়ারকে বাঁচিয়ে আব্‌ড়ো-খাব্‌ড়ো পিচ্ছিল কর্দ্দমাক্ত চড়াই ও উৎরাইয়ের পথ অতি সাবধানে চ'ল্‌ছে। ভীষণ বিপদসঙ্কুল স্থানে সহিস সাবধানে অশ্বের মুখ ধ'রে টেনে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, এবং উচ্চৈঃস্বরে 'হোস খবরদার' ব'লে অশ্বকে সাবধান ক'রে দিচ্ছে। তথাপি

স্থানে স্থানে অশ্ব পা রাখ্‌তে পারছে না, হোঁচট খাচ্ছে। আমাকে আগাইয়া দিয়েছেন আর প্রহরী স্বরূপ নিজে পিছনে র'য়েছেন এবং কেবলই সহিসকে সাবধান ক'রে দিচ্ছেন, "দেখো জি, ঘোড়ী নেহি গিরে —হুঁসিয়ারসে লে চলো, আচ্ছিসে ইনাম মিল যায়েঙ্গে।" আর আমি বিপদের পথ পার হ'য়েই মনে ক'রছি,যদি ঐ খানে ওঁর অশ্ব পতিত হয়, তবে কি হবে! প্রায় সাত আট হাত চওড়া নদী, প্রবল তরঙ্গ, কুটিটী প'ড়লে ভেঙ্গে চ'লে যায়, এম্‌নি হু'টী পার্ব্বত্য নদী পার হ'লেম। ইহার মধ্যে অশ্ব অতি সাবধানে পার হ'য়ে গেল। পার হবার সময় নদীর গর্ভে অশ্বের পা পাথরে ঠেকে এবং স্রোতের বেগে প্রতিপদে পদস্খলন হ'চ্ছিল। সেখানে সহিসের জানু পর্য্যন্ত জল। বাহাদুর সহিস এবং বাহাদুর অশ্ব নিরাপদে পার ক'রে নিয়ে গেল। এই ভাবে হু'তিনটী পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন ক'রে গন্তব্য স্থান বাইসারণ-প্রান্তরে উপস্থিত হ'লাম।

জঙ্গলপূর্ণ পর্ব্বতের সঙ্গোপন-স্থলে সবুজ তৃণাচ্ছন্ন ঢালু প্রান্তর, প্রান্তরের সীমায় ঘন জঙ্গল। পর্ব্বত-নিঃসৃতা নদী এই জঙ্গল ভেদ ক'রে প্রান্তরের হু'দিক দিয়ে বেয়ে যাচ্ছে। প্রান্তরের তিন দিকে উচ্চ পর্ব্বত বরফে আবৃত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে বহু নিম্নে কতকটা সমতল ভূমি,—মাঝে মাঝে জঙ্গল ও মাঝে মাঝে জলার মত দেখাচ্ছে। এই বাইসারণের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই সুন্দর—ইহা এক নূতন দৃশ্য।

এখানে আস্‌বার সময় দেখ্‌লাম, আমাদের সঙ্গিনী সেই মেয়েটী অশ্বারোহণে এখান হ'তে ফিরছেন। আমাকে দেখে একটু সলজ্জ হাসি হাস্‌লেন, আমিও তার প্রতিদান দিলাম। তাঁর সঙ্গে তাঁর স্বামী এবং আর বে হু'জন সঙ্গী (একজন মাদ্রাজী ও একজন পাঞ্জাবী) আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই র'য়েছেন। সকলের হাতে এক একটী বড় লাঠি, এঁরা সকলেই যুবতীর রক্ষক স্বরূপ তাঁর পিছনে পায়দলেই

আসৃছেন। অশ্বারোহণে এতগুলি পুরুষের সম্মুখে প'ড়ে আমি বড লজ্জিত হ'লেম। ঐ যুবতীটীও আমাদের সাম্‌নে পডায়, লজ্জায় জডসড হ'য়ে উঠেছিল। এটা কিন্তু ভাল নয়। কি পুরুষ, কি স্ত্রী—অবস্থা বিশেষে সকলে যদি সেই অবস্থানুযায়ী চ'ল্‌তে পারে, তা'হলে বিশেষ কষ্ট হয় না। আমাব এখন যে অবস্থা, এই অবস্থায় যদি আমি অশ্বারোহণ না ক'রতেম, তা'হলে হয় তো ওঁর এই সব স্থানে আসা হ'ত না। এত দূরদেশে এসেও আমার জন্য এই সব জায়গা না দেখে ফির্‌তে হ'ত, এবং তাতে আপশোষও থেকে যেতো। আজ যদি আমি অশ্বারোহণ ক'র্‌তে না পারতেম,—বা লজ্জায় জড়সড় হ'য়ে অশ্ব হ'তে পড়ে যেতেম, তা হ'লে কি রমণী-সমাজের গৌরব বৃদ্ধি হ'ত ?

আমি যথাসাধ্য সাহস ও দক্ষতার সহিত পর্ব্বত পার হ'য়ে এলাম। এখন এই বাইসারণে উপস্থিত হ'য়ে আমার অজ্ঞতা ও লজ্জার শাস্তি স্বরূপ সহিসকে ব'ললেম, 'তুমি এই অশ্বকে একটু দৌড় করাও, ইহাতে আমার একটু অভিজ্ঞতা হোক, তোমাকে পুরস্কার দেব।' সে পুরস্কারেব লোভে অশ্বকে খানিকটা দৌড় করালে। আমারও অল্প স্বল্প অশ্বারোহণে অভিজ্ঞতা হলো এবং মনে একটু স্ফূর্ত্তিও হলো। আমরা অশ্বারোহণেই এখানে একটু বিশ্রাম ক'রে ও চারিদিকে বেড়িয়ে এখান হ'তে ফির্‌লাম। ফিরবার সময় এক পশলা বৃষ্টিও হ'য়ে গেল। কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে ওঁর অশ্বের পদস্খলন হ'লো, কিন্তু বিধাতার দয়ায় সাম্‌লে গেলেন। বিপদ ঘোরতরই হ'তে পার্‌তো। এইরূপে আমরা অশ্বারোহণে তিন মাইল পথ অতিক্রম ক'রে যখন হোটেলে ফিরে এলাম, তখন অনেক বেলা—প্রায় বাবটা। বার আনা হিসাবে দেড় টাকা দু'টী অশ্বের ভাড়া ও দু'জন সহিসকে এক টাকা বকসিস্‌ দিয়ে তাদের বিদায় দিলাম। হোটেলে শুন্‌লাম, আমাদের সঙ্গীগণ আহারাদি ক'রে পুনরায় অশ্বারোহণে

চন্দনবাড়ী গেছেন। সে দিন প্রায় সমস্ত দিনই বৃষ্টি হ'য়েছিল। আমরা আর বাহির হ'তে পারি নাই। দারুণ শীতে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আহারাদি সেরে ফুটন্ত গরম জলে হাত-মুখ ধুয়ে, দু'বাল্‌তি গরম জলের হুকুম ক'রে উপরে উঠ্‌লেম।

পর্ব্বতের প্রাকৃতিক দৃশ্য নিয়ত মনোহর পরিবর্ত্তনশীল। দূর হ'তে পর্ব্বতের প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন চিত্ত আকর্ষণ করে, তেমনই পর্ব্বতের অভ্যন্তরে বাস ক'রলে, পর্ব্বতের সকল সৌন্দর্য্য উপভোগ ক'রে মন মোহিত হ'য়ে যায়। যিনিই পর্ব্বতে বাস ক'রেছেন, তিনিই আমার কথা উপলব্ধি ক'রতে পারবেন।

শান্ত পরিষ্কার আকাশ—বারাণ্ডায় ব'সে ব'সে বনানীর শোভা দর্শন ক'রছি,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে বন ভেদ ক'রে অল্প অল্প ধোঁয়া নানাস্থানে গাছের মাথা বেয়ে আকাশের দিকে উঠ্‌তে দেখে মনে হ'লো, বুঝি পাহাড়ীরা বনের মধ্যে আগুন ক'রছে। কিন্তু এ তো আগুন নয়— যেমন কয়লার চুলায় আগুন দিলে প্রথমে অল্পে অল্পে গোময়ের সাদা ধোঁয়া পাতলা হ'য়ে স্তম্ভের আকারে উপর দিকে উঠ্‌তে থাকে, ক্রমে কয়লার অগ্নি সংযোগে স্থায়ী স্তম্ভের আকারে উপর দিকে উঠে গিয়ে কৃষ্ণবর্ণের ধূমে শূন্যমার্গ ক্রমে আচ্ছাদিত হ'য়ে যায়, সেই ভাবে— (কয়লার আগুনের ধোঁয়া ক্ষুদ্র) আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মত— বৃক্ষশিব-নির্গত ক্ষুদ্র ধূমপুঞ্জ ক্রমে বিরাট আকারে অরণ্য, পর্ব্বত, গগন ও ভূতল আচ্ছাদিত ক'রে অখণ্ড শূন্যের এক নূতন সৃষ্টি নিয়ে ক্রমে বৃষ্টির আকারে নেমে এলো। এ শুধু বারিপাত নয়,—বারীশ আপনি টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে ভূতলে ছড়িয়ে প'ড়ছে। ঝম্ ঝম্ ক'রে শিলা-বৃষ্টির পর মূহূর্ত্তে এ বিরাট দৈত্য যেন যাদুবলে মিলিয়ে গিয়ে—স্নাত তপনের নূতন অভিনয় আরম্ভ হ'লো।

রোদনরত বালকের মুখে—জল-ভরা চোখে,—মধুর হাসি যেমন ক'রে ফুটে উঠে,—বর্ষণের পর জলভরা রবি-কিরণ তেমনি ক'রে গিরি-চূড়ে বরফের উপর পতিত হ'য়ে নির্ম্মল পবিত্র আভায় ধরণীকে পবিত্র ক'রে তুল্‌ছিল। যেমন রবি-কিরণ মুকুরের উপর পতিত হ'য়ে ঠিক্‌রে উঠে এবং ঐ মুকুরের প্রতিচ্ছবি দ্বিতীয় ও তৃতীয় মুকুরের উপর পতিত হ'য়ে অপরূপ রামধনুর সৃষ্টি করে—তেমনই এই অনন্ত শিবরূপের উপর তীব্রোজ্জ্বল রবি-কিরণ পতিত হ'য়ে অপরূপ রামধনুর সৃষ্টি ক'রে বনস্পতি, ধরিত্রী ও গিরিগুহা আলোকিত ক'রে তুল্‌ছিল। কোলে নীলাভ নানা বর্ণের বিচিত্র কায়া নীলকণ্ঠী বারি-বর্ষণে স্নাত হ'য়ে, তার ভিজা দু'খানি পাখা যেন দিগন্তে মেলে দিয়ে এই রবি-কিরণ সেবন ক'রতে ব'সেছে। দু'টী শুভ্র তটিনী চরণ-মঞ্জীরের মত এই পাষাণ খেচরের দু'টী চরণ বেষ্টন ক'রে চ'লে গিয়েছে। কিন্তু এও ক্ষণিকের অভিনয়। পুনরায় রৌদ্রের খেলা! এ লিখে বুঝান যায় না—না দেখ্‌লে ধারণার বাহিরে থেকে যায়। এরই সহিত নদীর ভীষণ গর্জ্জন স্থানটীকে মধুরে ভীষণ ও গম্ভীর ক'রে রেখেছে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সঙ্গীগণ চন্দনবাড়ী হ'তে ফিরে এলেন। তাঁদের দুর্দ্দশায় পশু-পক্ষীও কেঁদে যায়। সর্ব্বাঙ্গ ভিজে,—শীতে হাত-পা বেঁকে যাচ্ছে। কথা বল্‌বার ক্ষমতা নাই—দাঁড়াবার শক্তি নাই। ইঁহাদের দুর্দ্দশা দেখে আমার তো চমক লেগে গেলো। পরদিন আমরাও চন্দনবাড়ী যাব, কিন্তু স্থির ক'রলাম যে, আকাশ পরিষ্কার না হ'লে যাব না।

এখন বৃষ্টি নাই। আমরা একটু বেড়াতে বেরুলাম। প্রথমেই দোকানে গিয়ে আমাদের দু'জনের গ্লোভ্‌স এবং পট্টির বায়না দিলাম। মেম সাহেবেরা সর্ব্বাঙ্গ উপযুক্ত পোষাকে ঢেকে ওয়াটার-প্রুফ্ গায়ে দিয়ে বাহির হ'য়েছেন এবং সদর্প পদবিক্ষেপে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

বাস্তবিক কি ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা—এই ঠাণ্ডার দেশে মদ্য-মাংসই উপযুক্ত আহার। আমাদের মত নিরামিষভোজীদের বাস করা এক রকম অসম্ভব। এখানে আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে ঠাণ্ডা অনেকটা কম থাকে। ঐ সময় ৺অমরনাথ-যাত্রীরা ভারতের নানাস্থান হ'তে এই দেশের মধ্য দিয়ে দেবাদিদেবের দর্শনার্থ গমন করে, এবং এই পহেলগামে রাত্রি বাস করে। যাত্রীদের থাক্‌বার কাঠের ঘরগুলি পরিত্যক্ত অবস্থায় এখন পড়ে র'য়েছে। তাহাদেব গমনাগমনের সুবিধার জন্য রাজ-সরকার হ'তে রীতিমত ব্যবস্থা হয়।

আমরা নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে ঘরে এসে দরজা বন্ধ ক'রে পশমী বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে আহারের প্রত্যাশায় কষ্টে চেয়ারে উপবিষ্ট হ'য়ে গল্প ক'র্‌তে লাগ্‌লাম। রাত ন'টার সময় গ্লোভস এবং পট্টি প্রস্তুত হ'য়ে এলো। পরে যথাসময়ে আমরা গরম গরম অতি উপাদেয় কাশ্মীরী পোলাও আহার ক'রে লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়ে শয়ন ক'রলেম।

চন্দনবাড়ী

পরদিন ১লা জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার প্রভাতে উঠেই কি সুন্দর দৃশ্য দেখ্‌লাম! বালারুণের রক্ত-আভা দশ দিকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। মেঘের চিহ্ন নাই—আকাশ পরিষ্কার। যেন নূতন দেশে প্রবেশ ক'রলেম। অভ্রভেদী পর্ব্বতের উপর ঘন বনানীর অন্তরালে সুদূরে অবস্থিত যে সকল পার্ব্বত্য ভুমি—কচি কিশলয়দলে সমাচ্ছাদিত হ'য়ে এক এক খানি গালিচার ন্যায় বিছান রয়েছে—তিন দিক শ্যামবর্ণ উচ্চ বৃক্ষশ্রেণীতে সীমাবদ্ধ হ'য়েছে—সে সকল স্থান গত দু'দিন যাবৎ এই উদ্ভাসিত অরুণ-কিরণের অভাবে আমাদের নয়ন-পথে পতিত হয় নাই। ঘন জঙ্গলের অন্তরালে পর্ব্বতের শীর্ষদেশে হিম-কণা গলিত হ'য়ে গোমুখীর আকারে যে সকল প্রপাতের উদ্ভব হ'য়েছে—সে গুলিও এ দু'দিন আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। তুষার গলিত হ'য়ে যে সকল পার্ব্বত্য নদী জটার আকারে পর্ব্বত-শিখর হ'তে রূপার মত শুভ্রবর্ণে নেমে আসছে—সে গুলিও এ পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাই নাই। যে ভীষণ গুহাসকল বিরাট মুখ ব্যাদন ক'রে জঙ্গলের অন্তরাল হ'তে বিভীষিকা দেখাচ্ছে—সে গুলিও প্রভাত-সূর্য্যের একান্ত অভাবে দেখ্‌তে পাই নাই। পর্ব্বতের এই মনোহর দৃশ্য দর্শনে অন্ধকার প্রদেশে বালসূর্য্যের স্নিগ্ধ কিরণে উদ্ভাসিত হওয়ার কারণ,—আমার হৃদয়ের প্রিয়জন-হারা অন্ধকার তমোরাশি যেন প্রিয়-সমাগমে আনন্দিত ও শান্তিপূর্ণ হ'য়ে গেল! তখন হৃদয়ের অন্তঃস্থল ভেদ ক'রে কে যেন পুরান কবির মধুর গীতি কাণের কাছে গেয়ে গেল :—

"আমায় আখে যে, কোথায় আছে সে?—
সে দেখে আমি দেখিনে, ফিরে চাই আশে-পাশে!

বল্ দেখিরে তরুলতা, আমার জগৎজীবন আছেন কোথা ?
তোরা পেয়ে বুঝি কোস্‌নে কথা, তাই তোদের কুসুম হাসে।
বল দেখি হিমাচল, তুমি কার প্রেমে হ'য়ে অচল—
উদ্ধশিরে অশ্রুবারি ঝরাও সখে, কার উদ্দেশে ?
বল্ দেখিরে বিহঙ্গকুল, তোরা কার প্রেমে হ'য়ে আকুল—
থেকে থেকে ডেকে ডেকে উড়ে যাস্‌রে কার উদ্দেশে ?
বল্ দেখিরে স্রোতস্বিনি, ও তুই কার প্রেমেতে উদাসিনী—
করি কুলু কুলু গীতধ্বনি, কার উদ্দেশে যাওরে ভেসে ?"

তন্ময় চিত্তে ভাব-রাজ্যে মগ্ন হ'য়ে গেলাম। ধন্য ভগবান! ধন্য তোমার মহিমা—ধন্য তোমার সৃষ্টি-কৌশল! আর এই অভাগিনীর প্রতি ধন্য তোমার করুণা! করুণাময় স্বামি—আমার ইহকালের দেবতা, পরকালের আশ্রয়—আমার অশান্ত হৃদয়ের সান্ত্বনা—আমার ভাগ্যের নিয়ন্তা—আমার জীবন্ত নারায়ণ, তোমার চরণে আমার সহস্র সহস্র প্রণাম!—যাঁর প্রত্যক্ষ দয়ায় আমি শ্রীভগবানের এই অভাবনীয় অচিন্তনীয় সৃষ্টি-কৌশল দর্শনে হৃদয়ে শান্তি লাভ ক'রলেম্!

অতঃপর আমরা চা, টোষ্ট প্রভৃতি কিছু পান-ভোজন ক'রে নদীর তীরে বেড়াতে গেলাম। পূর্ব্বদিনের কথামত তখনই সহিস অশ্ব নিয়ে উপস্থিত হ'লো। হোটেলে বলা ছিল,—গরম পরেটা এবং তরকারী প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হ'য়ে এলো, এবং আমরাও পূর্ব্বাহ্নেই অশ্বারোহণের উপযুক্ত বস্ত্রাদিতে সজ্জিত হ'য়েছিলাম,—সুতরাং তখনই রওনা হ'লেম।

আজ আমাদের গন্তব্য স্থান চন্দনবাড়ী। এখান হ'তে ন' মাইল। ভীষণ বিপদ-সঙ্কুল পার্ব্বত্য পথে যাত্রা ক'রতে হবে। দুর্গা দুর্গা ব'লে অশ্ব ছেড়ে দিলাম। এখন প্রায় আটটা। ক্রমে ক্রমে গিরি, নদী, উপবন

ও পর্ব্বত-শ্রেণী পার হ'য়ে চড়াইএর পথে ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে অশ্বযুগল অগ্রসর হ'লো। পথ ক্রমাগত চড়াই ও উৎরাই—তবে চড়াইয়েব ভাগই বেশী। স্থানে স্থানে পথ এত সঙ্কীর্ণ যে, একটি অশ্ব কষ্টে সাবধানে যেতে পারে,—পাশে সহিস যাবারও স্থান নাই। ইহার একদিকে অতলস্পর্শী ভীষণ খাদ—অন্যদিকে গগনস্পর্শী পর্ব্বত। দু'দিকেই চাহিলে মাথা ঘুরে যায়। বন্ধুর৺ কণ্টকাবৃত উপলখণ্ডে আচ্ছাদিত অপ্রশস্ত গিবিবর্ত্তে অশ্বপৃষ্ঠে বান্ধবহীন দম্পতি! উভয় পার্শ্বে দৃষ্টিপাতে ও অসাবধানে পতন অবশ্যম্ভাবী,—পতনে মৃত্যু অনিবার্য্য। কিন্তু কি মনোরম দৃশ্যাবলী। শৈলচূড়া হ'তে প্রবল তরঙ্গে তরঙ্গিনী কি ভীষণ মাধুর্য্য ও ভীতির সৃষ্টি ক'রে ভৈরব আরাবে নেমে আসছে! স্থানে স্থানে কে যেন পাগলিনী স্রোতস্বিনীর বিশ্রামের জন্য সম চতুষ্কোণ কালো পাথরের বেদী প্রস্তুত ক'রে রেখেছে। পর্ব্বত-দুহিতা প্রচণ্ড বেগে বেদীর উপর আছাড় খেয়ে ঘূর্ণাবর্ত্তে ঘুরে এসে, কোথাও ঘূর্ণির আকারে, কোথাও প্রপাতের আকারে, কোথাও বা তুষার-গর্ভ ভেদ ক'বে বেগে নিম্নদেশে ছুটে যাচ্ছে। আবাব কোথাও পাষাণ-স্তূপে বাধা পেয়ে মনোগত ইচ্ছায় বাধাপ্রাপ্ত অন্তঃপুরচারিণীর মত বিষম স্ফীত হ'য়ে শিলাখণ্ড প্লাবিত ক'রে ছুটেছে। যে স্থানে শুভ্র তুষাররাশি আলিঙ্গন ক'রে তরঙ্গমালিনী শৈল-সুতা চঞ্চল গমনে নিরতা,—সে স্থানে রবি-কিরণে তরঙ্গ-ভঙ্গ আর তুষারের খণ্ড খণ্ড শুভ্রতায়, কে যেন সহস্র সহস্র হীরকমালা ভাসিয়ে দিয়েছে। নিবিড় বন-মধ্যে পর্ব্বত-নিঃসৃতা অগভীর তুষার-শায়িনী খরস্রোতা এই তরঙ্গিণীর মাধুরী—লেখনীর মুখে বাহির করা যায় না। বুঝলেম - এই পার্ব্বত্য-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়েই মোগল-সম্রাট জাহাঙ্গীর কাশ্মীর শ্রীনগরে সালামার বাগের সৃষ্টি ক'রেছিলেন। শ্যামল ক্ষুদ্র উপত্যকা ভূমির পরপারে

গগনচুম্বী হিমালয় নিবিড় জঙ্গলে আবৃত, চরণতলে নীলস্রোতা স্রোতস্বতী প্রবাহিতা। শিশু ফণিনীর মত নির্ঝরিণীকুল নিম্নদেশে ছুটাছুটি ক'রছে। পার্ব্বত্য অশ্ব, ছাগ ও মেষকুল মনের সুখে বালক-বালিকার মত ছুটাছুটি ক'রে কখন নদী পার হ'চ্ছে, কখন বা জলে নেমে খেলা ক'রছে। কোথাও নানাজাতীয় বিহঙ্গমসকল ঝাঁক বেঁধে ব'সে আছে। কোথাও উপরে পর্ব্বতের গায়ে প্রকাণ্ড খিলানের মত গুহা যোগীদিগের পরিত্যক্ত অবস্থায় প'ড়ে রয়েছে। কোথাও ঘোর কাননের মধ্যে নানা বর্ণের বিচিত্র ফুল ফুটে আলোকিত ক'রে রেখেছে। মধুগন্ধে অলিকুল গুঞ্জন-শব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শ্বেত, নীল, কৃষ্ণ, রজত ও স্বর্ণ বর্ণের নানা জাতীয় বৃক্ষ, কাননের শোভা বর্দ্ধন ক'রছে। স্বর্ণ বর্ণের ভূর্জ্জপত্রের বৃক্ষ এ স্থানে বহুল পরিমাণে জন্মায়, কিন্তু রাজার আদেশে কেহ স্পর্শ ক'রতে পারে না। স্থানে স্থানে পর্ব্বতের শিরোদেশ হ'তে নিম্নে নদী পর্যান্ত তুষাররাশি জমে গিয়ে অভিনব জ্যোতির সৃষ্টি ক'রেছে। মাঝে মাঝে ঝর্ ঝর্ ক'রে প্রপাতের জল নেমে আসছে। কোথাও নদীর উপর পাঁচ ছ'ফুট উচ্চ হ'য়ে বরফ জমে বৃহৎ বৃহৎ সেতু প্রস্তুত হ'য়েছে। মধ্যে মধ্যে রাস্তার উপর বরফ জমে আছে। স্থানে স্থানে পথের পাশে দারুণ তুষারপাতে ও ঠাণ্ডায় মেষসকল মৃতাবস্থায় পতিত রয়েছে।

আমরা পাঁচ ছ' জায়গা বরফের উপর দিয়ে অগ্রসর হ'লেম। কি বিপদসঙ্কুল পথ—মসৃণ ঢালু বহুদুর ব্যাপিয়া বরফে আবৃত হ'য়ে আছে! এর উপর পতিত হ'লে, এমন কোনও অবলম্বন নাই যে, ধারণ ক'রবে! বরফের উপর চলা আমাদের পক্ষে এক রকম অসম্ভব। অশ্বদ্বয়ের বার বার পদস্খলন সত্ত্বেও উহারা কেমন সংযত হ'য়ে পার হয়ে গেল এবং অশ্বরক্ষকেরাও বিনা পদস্খলনে অনায়াসে চ'লে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের

এই নৈসর্গিক অনুপম সৌন্দর্য্য-দর্শন-জনিত আনন্দ ও শান্তিভোগ সত্ত্বেও প্রাণে মৃত্যুভীতির সঞ্চার হ'চ্ছিল। কারণ—একজন পতিত হ'লে আর একজন ত্বরিত গমনে উহাকে উদ্ধার ক'রতে কখনও সক্ষম হবে না, আর চকিতে কোথায় যে—কত নিম্নে গিয়ে উপস্থিত হবে—কল্পনায় প্রাণ শিহরিয়া উঠে! আর পাঁচ মিনিট কাল বরফের উপর প'ড়ে থাক্‌লে নিশ্চয়ই প্রাণ-বায়ু বহির্গত হ'য়ে যাবে। যেমন চিন্তা—কার্য্যতঃ আংশিক ফললাভ তেমনই ঘটে গেল। একস্থানে পর্ব্বতের শীর্ষদেশ হ'তে বহু নীচে নদী পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান বরফে ঢেকে আছে। জায়গাটা অত্যন্ত ঢালু ও মসৃণ, বহুদূর ব্যাপিয়া বরফ পড়িয়া আছে। স্থানটী এত ঢালু যে, দেখ্‌লে মনে হয়—এই স্থান অতিক্রম করা অসম্ভব। আমার অশ্ব কিন্তু বেশ পার হ'য়ে গেল, ওঁর অশ্ব অর্দ্ধেক এসে পদস্খলন হ'য়ে পতিত হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে উনিও সেই ঢালু জায়গায় বরফের উপর পতিত হ'লেন। অশ্ব পরক্ষণেই উঠে দাঁড়ালো। উনি ওঠ্‌বার চেষ্টা করাতে আরও একটু পিছ্‌লে নিম্নাভিমুখে চ'লে গেলেন। চারি দিকে বরফ, ধরবার কোনও অবলম্বন নাই। ওঁর অশ্বরক্ষকও ওঁকে ধরে বরফের উপর পতিত—দু'জনেই নিশ্চলভাবে বরফের উপর শায়িত। ওঠ্‌বার চেষ্টামাত্রেই দু'জনেরই আরও পিছ্‌লে নিম্নাভিমুখে যাওয়ার সম্ভাবনা। কি ভয়ানক বিপদ—দু'জনেই বুঝি নীচের দিকে চলে যায়! পাষাণ-মূর্ত্তির মত এই সকল দেখ্‌ছি, আর এক মুহূর্ত্তে—আমার অশ্বরক্ষী ইঙ্গিত মাত্রে ত্বরিত গমনে ঐ স্থানে উপস্থিত হ'য়ে উহাদের উপরিভাগে দাঁড়িয়ে, বরফের মধ্যে পা বাধিয়ে দিয়ে, জোরের সহিত উহাদের আকর্ষণ ক'রে তুল্‌লে, এবং ওঁকে ধ'রে সেই বরফাবৃত স্থান পার ক'রে আন্‌লে, ও এপারে এসে হাতের সাহায্যে পুনরায় অশ্বে আরোহণ করিয়ে দিলে। ধন্য এদের সাহস, শিক্ষা ও বীরত্ব! বিপদ উত্তীর্ণ হ'তে—ভগবানকে শত শত

ধন্যবাদ দিলাম এবং অশ্বরক্ষককে উপযুক্ত পুবস্কারেব আশা দিয়ে পুনরায় ধীরে ধীবে চন্দনবাড়ীর দিকে অগ্রসর হলেম। এইরূপ আরও ছু'তিন জায়গায় বরফ পার হ'যে অলৌকিক সৌন্দর্য্য দেখ্তে দেখ্তে আমরা প্রায় একটার সময় চন্দনবাড়ী উপস্থিত হ'লেম।

ভীষণ উচ্চ পর্ব্বতের গায়ে অতি সঙ্কীর্ণ পথ। এই স্থানটী চতুর্দ্দিকে অরণ্যযুক্ত তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বত এবং মধ্যে একটী উপত্যকা। অগণিত তুসাব-গলিত প্রবল নির্ঝরিণী একত্রে উপত্যকায় দুধগঙ্গা নাম্নী প্রবল স্রোতস্বতীর গর্ভে মিলিত হ'য়েছে। এই স্থান দর্শন মাত্রে আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। কি নিম্নভাগে—কি উপরিভাগে দৃষ্টি পতিত হ'লেই মাথা ঘুবে যায়! আর অশ্বের গমন-পথ নাই। অশ্বরক্ষক ব'ল্লে, 'বাবু, এই স্থান হ'তে আপনাদের ফির্তে হবে আর অশ্বের যাবার উপায় নাই, নচেৎ পায়দলে চলুন। আমরা অশ্ব হ'তে অবতরণ ক'রে ধীরে ধীরে চ'ললেম। আরও কিছুদুব অগ্রসর হ'য়ে মোড় ঘুরেই দেখি, আরও অতি ভীষণ স্থান। স্বর্গস্পর্শী উচ্চ পর্ব্বতমালা—কি নিম্নে কি উপরিভাগে দৃষ্টিপাত করা যায় না! এই স্থানে অবলম্বন স্বরূপ কিছু নাই—একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষ পর্য্যন্ত নাই। অতি সঙ্কীর্ণ পথ—দেড হাত প্রশস্তও নয়, তাহাও আবার উপর হ'তে ধস নেমে প্রায় বন্ধ হ'য়ে গেছে। অশ্বরক্ষকেরা আর অগ্রসর হ'লো না। যদিও আমরা দু'টী প্রাণী চরম সাহসে নির্ভর ক'রে সেই ঝুরো মাটি-মেশান নুড়ি পাথরের উপর দিয়েই অতি কষ্টে অগ্রসর হ'লেম, তথাপি তাহাও বন্ধ। পনর কুড়ি হাত অগ্রসর হ'য়ে মোড ঘুরে দেখ্লাম, অনতিদূরে পর্ব্বতের বাঁকের মাথায় অতি প্রশস্ত, অতি ভীষণ তুষার-গলিত স্রোতস্বতী, কুর্ম্মপৃষ্ঠ আকারের অতি বৃহৎ তুষারের সেতু ভেদ করতঃ উন্মত্ত জলতরঙ্গ তাণ্ডব নৃত্যে পথের উপর দিয়ে নেমে যাচ্ছে। এই পথ মাত্র এক হাত পরিমিত প্রশস্ত। নদীর

ও-পারেও ঐরূপ সঙ্কীর্ণ পথ দেখা যাচ্ছে। আমরা দু'জনে অসম সাহসে ঐ সঙ্কীর্ণ পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'লেম। উপর হ'তে ঝুরো নুড়ি পাথর এবং মাটি মাঝে মাঝে অল্প অল্প ক'রে প'ড়্ছে। আমরা অতি কষ্টে—এক রকম ব'সে ব'সে কোনও রকমে নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হ'লেম। আর কোনও রকমে অগ্রসর হবার উপায় নাই, সম্মুখেই ভীষণ তাণ্ডবে নদী নেমে যাচ্ছে, এবং নদীর উপর অতি বৃহৎ এবং প্রশস্ত বরফের সেতু-পথ বন্ধ ক'রে রেখেছে। আমরা সেই নদীর কিনারায় গিয়ে ব'সে বিশ্রাম ক'রলেম। উনি ঐ স্থানে ব'সে হাতের উপর পাত্র রেখে আহারাদি সম্পন্ন ক'রলেন, তৎপরে আমিও প্রসাদ পেলেম। আমরা অঞ্জলি অঞ্জলি ক'রে ঐ জল আকণ্ঠ পান ক'রলেম। চমৎকার সুপেয় সুস্বাদু জল। জল পানে শরীরের সমস্ত গ্লানি দূর হ'য়ে, নূতন বলের সঞ্চার হ'ল। শরীর স্নিগ্ধ হ'যে গেল। আমরা কিছুক্ষণ এই স্থানে ব'সে ব'সে, এই স্থানের সৌন্দর্য্য উপভোগ ক'র্‌তে লাগলেম্। এক এক বার উপরের দিকে চেয়ে মনে হ'তে লাগ্‌লো—যদি বেশী ধস্ নামে, তা'হলে আমরা সেই ধসের সঙ্গে সঙ্গে কোথায়—কোন পাতালে যে চ'লে যাব—তার চিহ্ন মাত্র থাক্‌বে না! চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মনে ভয়ও হ'তে লাগ্‌লো। ভগবানের ইচ্ছা যদি তাই হয়—আমরা বাঙ্গলার লোক—কোথায় কোন্ সুদূরে—পর্ব্বতের উপর—পর্ব্বতের গর্ভে সমাধিস্থ হ'ব,—তাহ'লে আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী, আমাদের কি শক্তি যে তার অন্যথা ক'র্‌বো! কিন্তু ভয় হ'লেও এখানকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এত সুন্দর যে, দর্শনে মন মোহিত হ'য়ে গেল! এ অপরূপ দৃশ্য জীবনে আর কখনও দেখিনি। আজ আমাদের এত কষ্ট ক'রে এখানে আসা সার্থক হ'য়েছে। এই জন্যই সকলে এত কষ্ট ক'রেও এখানে এসে থাকেন। দেখ্‌বার জিনিষ বটে। অতি সুন্দর, অতি মহান্—এ যেন একটী স্বর্গীয় দৃশ্য!

আইস বর্গ

এই কারণেই ঋষি-তপস্বীরা হিমালয়ের ভিতর এসে তপস্যা ক'রে পরম বস্তু লাভ করেন। এখানে তপস্যার ইষ্ট লাভ অচিরেই হয়। এ পবিত্র দৃশ্যে সংসারের সকল জ্বালা—শোক-তাপ ভুলে গিয়ে মন আপনা হ'তে ভগবানের দিকে চলে যায়—মনে একাগ্রতা জন্মায়। পরম সাধনার স্থান।

নদীর ও-পারে খানিকটা সবুজ তৃণাচ্ছাদিত শ্যামল বর্ণ ময়দান দেখা যাচ্ছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ঐস্থানে কোন মহাত্মার আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমের চতুর্দ্দিকে কিছু কিছু ফল-ফুলের গাছও দেখা যাচ্ছে এবং ওখানে বহুল পরিমাণে তুষার পতিত হ'য়ে আছে। অমরনাথ-যাত্রীরা ওখানে এক রাত্রি বিশ্রাম করে;—পরে শেষনাগে ও পঞ্চতীর্থে বিশ্রাম ক'রে অমরনাথে পৌছায়। এখান হ'তে অমরনাথ আঠার মাইল। অমরনাথের পাণ্ডার নিকট শুনেছি, ঐ শেষনাগে অতিশয় বৃহৎ একটী হ্রদ আছে। আর একটী পঞ্চশীর্ষ ও একটী সহস্রশীর্ষ অতিকায় শ্বেতবর্ণ সর্প মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। ঐ সর্পই শেষনাগ। অমরনাথে অমর-বাঞ্ছিত তুষার-নির্ম্মিত লিঙ্গমূর্ত্তি দেবতা শূন্যের উপর অবস্থিত। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হ'তে তিল তিল প্রমাণে বৃদ্ধি হ'য়ে পূর্ণিমায় পূর্ণ লিঙ্গমূর্ত্তি দেখ্‌তে পাওয়া যায় এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হ'তে তিল তিল প্রমাণে ক্ষয় হ'তে আরম্ভ ক'রে অমাবস্যার দিন সম্পূর্ণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। পুনশ্চ শুক্ল প্রতিপদ হ'তে অল্পে অল্পে দেবমূর্ত্তি গঠিত হ'তে থাকে। ঐস্থানে কোনও কোনও ভাগ্যবান এক জোড়া শ্বেত কপোতের দর্শন পায়। তুষারাবৃত স্থানে একটী প্রাণী মাত্রেরও থাকা সম্ভব নয়,—সেখানে কপোত দর্শন আশ্চর্য্য বটে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে এই প্রদেশের তুষার বহুল পরিমাণে গলে যায়। ঐ সময় রাজ-সরকার হ'তে অমরনাথের পথ বরফ কেটে পরিষ্কার করা হয় এবং যাতায়াতের ও থাক্‌বার সুবিধার জন্য অন্যান্য সকল প্রকার সুবন্দোবস্তও করা হয়। ভারতের

নানাস্থান হ'তে যে সকল সাধু-সন্ন্যাসীরা অমরনাথ দর্শনে আসেন, তাঁহাদের আহার এবং বাসস্থান রাজ-সরকার হ'তে প্রদত্ত হয়। ঐ সময় ভিন্ন অন্য সময় অমরনাথ যাওয়া অসম্ভব। অমরনাথ, বৎসরের মধ্যে শ্রাবণ-পূর্ণিমায় একবার মানব কর্ত্তৃক পূজিত হন। অন্য সময় দেবতারা পূজা ক'রে থাকেন। আমরা ক্ষুণ্ণ মনে উদ্দেশে অমরনাথের চরণে করযোড়ে প্রণিপাত ক'রলেম। এ যাত্রা তো ফিরলেম, পরে আবার কখনও হবে কিঁ না—কে জানে!

আমরা এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে, অতি কষ্টে এক রকম হামা দিয়ে ঝুরো মাটির উপর দিয়ে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত রাস্তায় উঠ্‌লেম। দু'টা মোড় ঘুরে পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে উপস্থিত হ'য়ে দেখি, অশ্বযুগল উপত্যকায় চ'রতে নেমেছে। হিম-সমাচ্ছন্ন হিমালয়ের একাংশে উপবেশন ক'রলেম। বনবেড়ালের মত অশ্বরক্ষকদ্বয় কেমন ক'রে উপত্যকায় অবতরণ ক'রে অশ্বযুগল ধ'রে নিয়ে এলো, ব'সে ব'সে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম্। অশ্বযুগল প্রস্তুত হ'লে পুনরায় অশ্বারোহণ ক'রে সেখান হ'তে ফিরলেম্।

এবার উৎরাইয়ের ভাগই বেশী। চড়াই অপেক্ষা উৎরাইয়ে অনেক কম সময় লাগে, কিন্তু অশ্বপৃষ্ঠে চড়াই অপেক্ষা উৎরাই আরও বিপদজনক। উৎরাইয়ের মুখে সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন, একটু অসাবধান হ'লে তৎক্ষণাৎ আরোহীর পতন সম্ভাবনা। পথে এক উৎরাইয়ের মুখে একটী বাঁকের মাথায় অশ্ব নিম্নাভিমুখে পদক্ষেপ করবা মাত্র, ভিন্নাভিমুখে স্থিত-দৃষ্টি আমি,—অশ্বপৃষ্ঠেই ভীষণ টোক্কর খেলাম্। একমাত্র গুরুর দয়ায় সে যাত্রা রক্ষা হ'য়ে গেল। হুঁসিয়ার অশ্বরক্ষক সে যাত্রা বাঁচিয়ে দিলে। যদি প'ড়ে যেতাম, তবে বহু নিম্নে ঠিক্‌রে পড়তাম্—কিছুতেই রক্ষা হ'তো না, কেহ চিহ্নমাত্রও দেখ্‌তে পেত

না। অসাবধানতা বশতঃ এইরূপ হওয়ায় অতিশয় লজ্জিত হ'লেম, এবং উনিও এজন্য আমাকে একটু মধুর ভৎর্সনা ক'রলেন। আমি একটু অপ্রস্তুত হ'লেম, কিন্তু ইহা দূর কর্‌বার জন্য অশ্বরক্ষককে অশ্বমুখ ছেড়ে দিতে ব'ললেম, এবং আপনি নিজে অশ্বচালনা ক'রে উৎরাই ও মধ্যে মধ্যে চড়াইয়ের বাকি সকল দক্ষতার সহিত পার হ'লেম। এইরূপ অশ্বারোহণে যাওয়া-আসায় আঠার মাইল পথ অতিক্রম ক'রে, বিকাল প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় হোটেলে ফিরে এলেম। সেদিন আর উঠ্‌তে পারি নাই—গায়ে এত ব্যথা হ'য়েছিল। দু'দিন যাবৎ গায়ের ব্যথা মরে নাই। রাত্রে আমাদের এত অধিক ক্ষুধার উদ্রেক হ'য়েছিল যে, দু'ডিস্ ক'রে পোলাও আহার ক'রেছিলাম। অন্যকার কার্য্য সমাপ্ত ক'রে যথাসময়ে শয়ন ক'রলেম। আজ আমরা কেবল দু'টী প্রাণী এই হোটেলে আছি। আমাদের সঙ্গীরা সব চ'লে গেছেন,—সাহেব মেমেরা পর্য্যন্ত।

পরদিন ২রা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ ও বিশ্রাম ক'রলেম। পূর্ব্বদিন প্রাতঃকালে আমাদের চন্দনবাড়ী রওনা হবার পূর্ব্বেই আমাদের সঙ্গী সাথী সব শ্রীনগরে তার দিয়ে মোটর আনিয়ে প্রস্থান ক'রেছেন। আজ আবার কতকগুলি লোক এখানে এসে উপস্থিত হ'লেন। এই মোটর কাল শ্রীনগরে ফিরে যাবে, আমরা এই মোটরেই যাব স্থির ক'রলেম্; নহিলে হয় তো মোটরের জন্য আবার আমাদের দু'চার দিন অপেক্ষা ক'রতে হবে, বা শ্রীনগরে তার ক'রে মোটর আনাতে হবে। বলা বাহুল্য, এখানে কোনও মোটর নাই। কারুশিল্পজাত কোন কোন বস্তু ক্রয়ের আশায় দোকানে উপস্থিত হ'লেম এবং দু'দশ টাকার কিছু ক্রয় ক'রে, দুধের রুটির চেষ্টায় বাজারে ঘুরতে রইলাম,—পাঁচ ছ'খানির বেশী সংগ্রহ ক'রতে পারলেম না।

এই রুটি গুর্জ্জরীরা প্রস্তুত ক'রে বাজারে দিয়ে যায়। কাঁচা দুধ জমিয়ে এই রুটি প্রস্তুত করে। এ কারণ সকল হিন্দুতে ইহা অবাধে ভোজন করে। এই রুটির উপর ছুরির দ্বারা বরফির মত দাগ দিয়ে, ঘিয়ে ভেজে আহার ক'র্‌তে হয়। ইহা অতি সুস্বাদু। শ্রীনগরে পাগ্‌লা বাবা নামে এক সাধু আমায় ব'লেছিলেন, 'দুধের রুটি, ঘাসের জুতি আর কাঠের বাতি (মশাল) সংগ্রহ ক'রো; পহেলগামে মিল্‌বে।' দুধের রুটি সংগ্রহ হ'লো, কাঠের মশাল অর্থাৎ কাঁচা কাঠ ভাঙ্গিয়া অগ্নি সংযোগ মাত্রে তৈলাক্ত দ্রব্যের মত বেশ তেজে জ্বলে ওঠে, এবং ধূপ-গন্ধে দিক্ আমোদিত হ'য়ে যায়। গত কল্য অশ্ব-রক্ষক উহা দেবে ব'লেছে। ঘাসের জুতি পরে শ্রীনগর হ'তে সংগ্রহ ক'রেছিলাম। এই জুতা এদেশী ব্রাহ্মণগণ পায়ে দেন, মূল্য দু'পয়সা চার পয়সা। তিনটী দ্রব্যই অতি পবিত্র।

পরদিন ৩রা জ্যৈষ্ঠ, রবিবার সকালে উঠে দৈনন্দিন কার্য্য সমাপ্ত ক'রে বেড়াতে বেরুলাম। কিছুক্ষণ বেড়িয়ে নদী-সৈকতে শিলাখণ্ডের উপর উভয়ে উপবেশন ক'রে গল্প এবং স্রোতস্বতীর রূপ-মাধুরী দর্শন ক'রে ও দাদুর খেল্‌বার জন্য জলের ভিতর থেকে ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর পাথর কুড়িয়ে নিয়ে বাজারের দিকে গেলাম এবং কিছু জাফ্‌রাণ ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় ক'রে হোটেলে ফিরে এলাম। পরে যথাসময়ে আহারাদি সমাপন ক'রে, সকলকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়ে ও হোটেলের বিল পরিশোধ ক'রে শ্রীনগরের পথে যাত্রা ক'রলাম। ঐদিন দেখ্‌লাম, এক সাহেব এসে এই পহেলগামে তাঁবু ফেলেছেন। সাহেবেরা প্রায়ই এখানে তাঁবু ফেলে বাস করেন। সাজ-সরঞ্জাম সমেত তাঁবু এখানেই ভাড়া পাওয়া যায়।

মর্ত্তন ও মার্ত্তণ্ড

পহেলগাম হ'তে বার মাইল দূরে এস মোকাম গ্রাম। সমস্ত পথটী পর্ব্বত, নদী, সবুজ উপত্যকা—আর দূরে তুষারমণ্ডিত উন্নত মস্তক পর্ব্বত। স্থানে স্থানে চেনার, দেয়ার, আখরোট ও নানাবিধ ফুলের গুল্ম। উচ্চ পর্ব্বতের নানা স্থানে ছাগ, মেষ ও গাভীকুলের বিচরণ ও তৃণ ভক্ষণ বড়ই মনোরম দেখাচ্ছিল। আরও এগার মাইল এসে মর্ত্তন গ্রামে উপস্থিত হ'লেম। এইখানে আমরা সকলেই মোটর হ'তে নামলেম্। পথের পাশে অনতিউচ্চ পাহাড়ের গায়ে এক বৃহৎ গুহা। শুনা যায়, ইহা প্রায় দু'শ ফুট লম্বা,—ভিতরের দিকে ক্রমশঃই সরু হ'য়ে গেছে। কিছু দূর যাওয়া যায়, তারপর আর হামা না দিলে যাওয়া যায় না। অন্ধকার ক্রমশঃই গাঢ় হ'য়ে উঠেছে। আমরা আর অগ্রসর না হ'য়ে ফিরলাম। মোটরে আরও কিছুদূর গিয়ে মর্ত্তন উৎসে উপস্থিত হ'লেম। এখানে প্রবেশ-দরজার পাশেই একখানি দোকানের মত ঘরে কাশ্মীরী পোষাক-পরিহিত বড় বড় চন্দন ও সিন্দুরের টিপ-পরা গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ পাণ্ডারা ব'সে আছেন। পবিত্র মুখশ্রী, ব্রাহ্মণদের দর্শন মাত্রে হৃদয়ে ভালবাসা এবং ভক্তির উদয় হয়। আমরা মোটর হ'তে নাম্‌বামাত্র, আমাদের ঘিরে ফেল্‌লেন। ছোট একটী গেট দিয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ ক'রলেম। কিছু দূরে পর্ব্বতের কোলে একটী বৃহৎ বাঁধান চতুষ্কোণ চৌবাচ্চার মত গভীর জলাশয়। এরই মধ্যে উৎসের জল—তিন জায়গায় গল্ গল্ ক'রে নির্গত হ'য়ে আস্‌ছে। পরিষ্কার কাচ-স্বচ্ছ নীর—তলায় কুটিটী পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে। বড় বড় কালো কালো মৎস্তে জলাশয় পরিপূর্ণ। এত বেশী মাছ —যেন উপর হ'তে নীচে পর্য্যন্ত পর্দ্দায় পর্দ্দায় সজ্জিত হ'য়ে রয়েছে।

উৎসের জল জলাশয় পূর্ণ হ'য়ে নালার মধ্য দিয়ে বা'র হ'য়ে নদীর আকারে চ'লে যাচ্ছে। এই নালাটীও জাল দিয়ে ঘেরা,—মাছে পরিপূর্ণ। জলাশয়ে হাজার হাজার কালো কালো মাছের মধ্যে একটী মাত্র বড় সোণার বরণ মাছ খেলা ক'রছে। দু'চার খানি বড় রুটি আনিয়ে কিছু টুক্‌রা টুক্‌রা ক'রে ফেলে দিলাম, দিবা মাত্র জল তোলপাড় ক'রে মাছেরা একত্রে গাঁদি লাগিয়ে দিল। আমি খান দুই আস্ত রুটি জলে ডুবিয়ে ধ'রতেই মাছেরা উঁচু হ'য়ে লাফিয়ে উঠে আমার হাত হ'তে রুটী গুলি ভক্ষণ ক'র্‌তে লাগ্‌লো—চমৎকার দৃশ্য! অনেকেই ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখে আনন্দ লাভ ক'রলে। এখানে সূর্য্যদেব জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন ব'লে ইহার নাম মার্ত্তণ্ড—ইহার অন্য নাম সূরজ গয়া। এই স্থানে পিণ্ডদান ক'র্‌তে হয়। কথিত আছে—এক বিধবার মৃত পুত্র তাহার মাতাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে এই স্থানে পিণ্ড প্রার্থনা করে। মাতা ঐ ঘটনা স্মরণ ক'রে এই স্থানে ব'সে ব'সে অতিশয় রোদন করেন। বৃদ্ধার অশ্রুজলে ঐ স্থান ভিজে যায়। তাঁহার অবস্থা দর্শনে ব্রাহ্মণগণ কারণ জিজ্ঞাসা করেন। পরে বৃদ্ধার মুখে সমস্ত অবগত হ'য়ে তাঁরা বৃদ্ধার দ্বারা মৃত পুত্রের পিণ্ড দিইয়ে দেন। মৃত পুত্র ঐ সময় শরীর ধারণ ক'রে সকলকে দর্শন দিয়ে পিণ্ড গ্রহণ করে। আমরা পাণ্ডার খাতায় নিজ নিজ নাম ধাম এবং বংশাবলীর নাম লিখিয়ে দিলাম।

এখানে একটী ছোট ঠাকুর বাড়ী আছে। তাহার মধ্যে মহাবীর, রামসীতা ও লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতির বিগ্রহ র'য়েছেন। দু'এক খানি ব্রাহ্মণের দোকানে দুধ-মিষ্টান্নাদি বিক্রয় হ'চ্ছে। যে সব যাত্রীরা এখানে আসেন, তাঁহারা এই সকল দোকান থেকেই ভোগ, পিণ্ড বা আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়ে নেন। স্থানটী সুন্দর ও নির্জ্জন। অতি শান্তিপ্রদ।

এরই পরে পুরাতন মার্ত্তণ্ড-মন্দির দেখ্‌তে গেলাম। এই স্থান শ্রীনগরের পথে পড়ে না। এখানে যাবার জন্য মোটরওয়ালার সঙ্গে আলাহিদা বন্দোবস্ত ক'রতে হয়। পথ ক্রমশঃই উর্দ্ধে। বেলা অপরাহ্ন হ'য়ে এসেছে। মাঝে মাঝে তীব্রোজ্জ্বল সূর্য্য-কিরণ চক্ষু ঝলসিত ক'রে দিচ্ছে। দূরে বিশাল পর্ব্বতশ্রেণী মেঘ-শুভ্র-তুষারের মুকুট ধারণ ক'রে আপন মহিমায় যেন বিনম্র শিরে ধরিত্রীর উপর ছায়াদান ক'রছে। চরণ-তলে বহু বিস্তৃত ময়দান ঢালু হ'য়ে ক্রমশঃই নেমে আস্‌ছে। তৃণাচ্ছন্ন সবুজ মাঠের উপব বিরাটকায় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ কি অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যের সৃষ্টি ক'রেছে। সংসারে অনিত্যতার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ স্বরূপ কি দারুণ কারুণ্যের সৃষ্টি ক'রে রয়েছে। উপরে অনন্ত আকাশ, নিম্নে বিস্তৃত সবুজ ময়দান, সাক্ষী স্বরূপ গম্ভীর ভাবে বিশালকায় নগেন্দ্র বহুদূর ব্যাপিয়া বেষ্টন ক'রে রয়েছে। গাম্ভীর্য্যের মহিমায় বুঝি ইহা অতুলনীয়। তেষট্টি ফুট লম্বা ইহার স্থিতি, কাশ্মীরে এই মন্দির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহৎ, এবং স্থপতি-বিদ্যার চরম আদর্শ ছিল। মন্দিরেব ছাদ বহুকাল ধ্বংস হ'য়ে গেছে। কিন্তু সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-ক্ষোদিত প্রশস্ত পাথরের খিলান, সুন্দর কারু কার্য্যময় দেওয়ালের উপর দাঁড়িয়ে আছে। কথিত আছে, এই মন্দিরে চুরাশিটা স্তম্ভ ছিল। এখনও বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভ বহু পরিমাণে চারিদিকে ছড়ান অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। মধ্যঃস্থলের একটী দেওয়াল ফাট ধ'রে হেলে পড়েছে। পতন নিবারণের জন্য লোহার শৃঙ্খলে বাঁধা রয়েছে। দেখ্‌লে মনে হয়—মাত্র এক খানি পাথরেই বুঝি ইহা প্রস্তুত হ'য়েছে। এখন আধুনিক জগতের কোনও শিল্পের সঙ্গে কি ইহার তুলনা হয় ?

এক সময়ে এই স্থানে সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। অধুনা নগরের চিহ্ন মাত্র নাই। শুধু ধুধু ক'রছে বিস্তৃত প্রান্তর। এই প্রান্তরের মধ্যে

অতীতের গৌরব স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য মাত্র মার্ত্তণ্ডদেবের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও ভগ্নশিরে দাঁড়িয়ে আছে।

সূর্য্যদেবের উপাসনার জন্য খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে এই মন্দির আদিত্য বংশীয় মহারাজ রামাদিত্য এবং তাঁহার রাজ্ঞী অমৃতপ্রভা প্রতিষ্ঠা করেন, এবং অষ্টম শতাব্দীতে মহারাজ ললিতাদিত্য নানারূপে এই মন্দিরের উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে, যখন রাজ-পুরোহিতগণ এই মন্দিরে প্রাতঃকালে জবাকুসুম সঙ্কাশ অরুণ দেবের,—মধ্যাহ্নে প্রখর তেজোদীপ্তিসম্পন্ন ভাস্করদেবের,—এবং সায়াহ্নে স্নিগ্ধ রশ্মিবিশিষ্ট অস্তাচলগামী তপনদেবের পূজা, ধ্যান ও স্তোত্র পাঠ ক'রতেন,—এবং চারিদিক ধূপ-ধুনার গন্ধে আমোদিত ও মধুর শঙ্খ ঘণ্টা-রবে দশদিক মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌তো, তখন এখানকার কি স্বর্গীয় ভাব ও মাধুর্য্য ফুটে উঠ্‌তো—তাহা এখন কল্পনাতেও আনা যায় না।

মহারাজ ললিতাদিত্য ছত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ইনি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক গৌড়-রাজের প্রাণসংহার করেন। তাহার প্রতিশোধ লওয়ার জন্য বঙ্গাধিপতির সৈন্যগণ কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করেন। অপ্রাসঙ্গিক বোধে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিলাম না।

মার্ত্তণ্ড মন্দির দেখে আমরা বরাবর শ্রীনগর-অভিমুখে যাত্রা ক'রে প্রায় পাঁচটার সময় খালসা হোটেলের সম্মুখে এসে উপস্থিত হ'লাম। মালপত্র নিয়ে হোটেলে গিয়ে দেখি যে, আমাদের পূর্ব্বের ঘরখানি অন্য লোক কর্ত্তৃক অধিকৃত হ'য়েছে। হোটেলের লোকেরা আমাদের জন্য দু'তলায় একখানি ঘর দিল, কিন্তু এ ঘর আমাদের পছন্দ হ'লো না, এর সঙ্গে বাথ্‌রুম ও পাইখানা নাই,—তা'হ'লেও এই ঘরের দৈনিক ভাড়া দু'টাকা। পূর্ব্বের রেট্ বদ্‌লে গেছে। এখন এই ঘর ব্যতীত এই হোটেলে আর কোনও ঘর খালি নাই, অগত্যা আমাদের এই ঘরই

নিতে হ'লো। কিন্তু ঘরের জন্য মনটা একটু ক্ষুণ্ণ হ'লো। বলা বাহুল্য, আমাদের পূর্ব্বের ঘরখানি খুবই ভাল এবং পছন্দসই ছিল। যাহা হোক, ঘরের অসুবিধায় এই হোটেলে আর থাকা হবে না—এই স্থির ক'রে উনি তখনই অন্য হোটেলের সন্ধানে বেরুলেন। আমিও সঙ্গ নিলাম। প্রথমে আমরা আমিরাকদলের পাশে ঝিলম-বক্ষে 'কাশ্মীর হিন্দু হোটেল' দেখ্লাম। এই হোটেল বোটের উপর—দোতলা। উপর নীচে অনেকগুলি ঘর। কয়েকটা ঘরে লোক আছে, বাকীগুলি খালি। এখানকার একজন লোক খালি ঘরগুলি সব আমাদের দেখিয়ে দিলে। দেখ্লাম,—ঘরে মোটামুটি সাজ-সরঞ্জাম সকলই আছে, প্রতি ঘরের দৈনিক ভাড়া এক টাকা। কিন্তু এখানকার কোনও ঘরই আমাদের মনোনীত হ'লো না। খালসা হোটেলের তুলনায় এ হোটেল ভাল নয়, এবং এখানে অসুবিধাও অনেক—স্নান, আহার ও পাইখানা ইত্যাদি। এখান হ'তে বেরিয়ে আরও দু'একটা হোটেলের সন্ধান লওয়া গেল, কিন্তু সব জায়গায় অসুবিধা দেখে খালসা হোটেলে থাকাই স্থির ক'রে ফিরে এলাম।

আমরা ফির্ছি, এমন সময় পথে পণ্ডিত শিবজীর সঙ্গে দেখা হ'লো। দেখ্বামাত্রেই পণ্ডিতজী ওঁর হাত দুখানি ধ'রে সহাস্যবদনে ব'ললেন, "বাবুজি, আমায় না ব'লে কোথায় চ'লে গিয়েছিলেন? আপনাদের বাসের জন্য ভাল হাউস বোট ঠিক ক'রেছিলাম।' উনি পণ্ডিতজীকে উপযুক্ত অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত ক'রে হোটেলের রুম নম্বর ব'লে, হোটেলে গিয়ে অপেক্ষা ক'র্তে ব'লে দিলেন। পণ্ডিতজী চ'লে গেলেন। আমরা কিছু খাদ্য ও পান নিয়ে হোটেলে এসে দেখ্লাম, পণ্ডিতজী আমাদের অপেক্ষায় ঘরের সাম্নে বারাণ্ডায় ব'সে আছেন। ঘরের দরজা খুলে ভিতরে তাঁকে বসিয়ে, নানা খোস গল্পের সঙ্গে পহেল-

গাম যাত্রাব পূরা বিবৃত্তি দিলেন। শেষে তাঁর সঙ্গে কথা হ'লো, পবদিন বাবটার সময় তিনি আমাদের যাদুঘর ও মহারাজগঞ্জ প্রভৃতি দেখিযে আন্‌বেন। পণ্ডিতজী বিদায হ'লেন। আমরা কিছু জলযোগ ক'রে বিশ্রাম ক'রলাম। ঘরেব জন্ত মনটা মোটেই ভাল ছিল না। রাত্রে আব আহারাদি কিছুই হ'লো না। উনি ঠিক ক'রলেন, দু'তিন দিনের মধ্যেই এখানকার দেখা শেষ ক'বে জম্বু হ'য়ে পেশওয়ার যাওয়া যাবে।

মিউজিয়ম

পরদিন ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার সকালে উঠে দু'জনে বেড়াতে বেরুলাম। ফেরবার মুখে বেতের সাজি, টিফিন বক্স প্রভৃতি দু'চারটে নমুনার স্বরূপ খরিদ ক'রে নিয়ে এলাম, এবং যথাসময়ে স্নানাহার ক'রে যাদুঘর প্রভৃতি দেখ্‌তে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে রইলাম। বারোটার সময় পণ্ডিতজী এলেন, আমরা তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে প'ড়লাম। ঝিলমের ধারে এসে এক খানা সিকারা ভাড়া ক'রে যাদুঘর দেখ্‌তে চ'ললাম।

যাদুঘরটী উঁচু মেঝের উপর সুদৃশ্য একখানি বাড়ী,—ঝিলমের ধারে উপবনের মধ্যে অবস্থিত। সম্মুখে প্রশস্ত রাজপথ। মহারাজা প্রতাপ সিংহের প্রতিষ্ঠিত ব'লে ইহার নাম 'স্যার্ প্রতাপসিং মিউজিয়ম।' আমরা বাগানের মধ্য দিয়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রলাম। প্রবেশ-মূল্য লোক প্রতি দু'আনা। প্রথমেই ফুলের বাগান। তন্মধ্যে গোলাপই বেশী। প্রত্যেক গাছে রাশি রাশি বড় বড় গোলাপ ফুটে উপবন আলোকিত ক'রেছে। বাগানের পর কতকগুলি বড় বড় জালা পথের ধারে সারি দিয়া বসান র'য়েছে। ঘরের বারাণ্ডায় নানাস্থান হ'তে আনীত মাটীর ও পাথরের মূর্ত্তি সকল সাজান র'য়েছে। তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিই অধিক।

মাটীর তলা হ'তে উদ্ধৃত কারুকার্য্যবিশিষ্ট ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড সকল অন্যান্য স্থান হ'তে আনীত হ'য়ে এখানে স্মৃতি-স্বরূপ সযত্নে রক্ষিত হ'য়েছে। একস্থানে বড় টেবিলের উপর কাশ্মীরের মানচিত্র—নদী, পর্ব্বত, উপত্যকা এবং রাজপথ প্রভৃতি অতি সুন্দর ভাবে মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত রয়েছে, এবং আরও বহুবিধ প্রস্তর ও মৃন্ময়-দ্রব্যাদি বহুস্থান হ'তে সংগৃহীত হ'য়েছে। ভিতরে কয়েকটী হলে পার্ব্বতীয় নানা জাতি পশুপক্ষী

ও কাশ্মীরের আখ্‌রোট কাঠের প্রস্তুত বহু প্রকার সুন্দর সুন্দর গৃহ-সজ্জ এবং অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম কার্য্যবিশিষ্ট 'পেপাব মেসিনের' কাজ প্রভৃতি সজ্জিত র'য়েছে। একটী স্থলে 'সো-কেসের' ভিতর শাল, রুমাল, জামিয়ার, গালিচা প্রভৃতি সূচি-শিল্প সকল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যে চার হাজার টাকা মূল্যের একখানা জামিয়ার র'য়েছে। বড় বড সো-কেসের মধ্যে রক্ষিত শালেব উপর কি চিত্রতা ফুটে উঠেছে। একখানি শালের উপর অতি সূক্ষ্ম সূচি-কার্য্যের দ্বারা সমস্ত কাশ্মীবের মানচিত্র অঙ্কিত করা হ'য়েছে। একখানি শালের উপর খালসা দরবার বা মহারাজা রণজিৎ সিংহের সভা অতি সুন্দর সীবন করা হ'য়েছে। আর একখানি শালের উপর ইংরাজ এবং খালসার যুদ্ধক্ষেত্র। এই সীবন-কার্য্যই কাশ্মীর-জাত অভিনব শিল্পকলা। সীবনের মূর্ত্তিগুলি এত সুন্দর ফুটে উঠেছে যে, অঙ্কিত বলে ভ্রম হয়। প্রথমতঃ অঙ্কিত ব'লেই ধারণা ক'রেছিলাম। এই সকল কারুকার্য্যের তুলনা নাই। কোনও স্থলে কাশ্মীবের হিন্দু বীরগণের বড় বড় কামান, বন্দুক, তলোয়ার, ছোবা, কিরীচ, হাঁসিয়ার, চন্দ্রহাস প্রভৃতি নানাবিধ পুবাতন অস্ত্রসকল তাঁহাদেব বীরবত্তাব সাক্ষ্য দিচ্ছে। কোথাও কাশ্মীরের হিন্দু নরপতিগণের চিত্র এবং রণজিৎ সিংহ হ'তে রাজ-বংশাবলীর পরিচয় ও কাশ্মীবের রাজাদের মুদ্রাসকল সাজান র'য়েছে। একটী ঘরে আদিম কাশ্মীরবাসীদিগের প্রতিমূর্ত্তি সকল উহাদের জাতীয় বেশভূষায় সজ্জিত ক'রে রাখা হ'য়েছে। অধুনা যুগের কাশ্মীরবাসীর সকল রকম জাতির মূর্ত্তিও রাখা হ'য়েছে। ইহাতে কাশ্মীরের আদিম পরিচয় বহুলাংশে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। রাজ-বংশের বিশিষ্ট দ্রব্য সকল—মহাপায়া, চতুর্দ্দোল, সিংহাসন, মূল্যবান সাড়ী ও মূল্যবান অলঙ্কাব প্রভৃতি সযত্নে রক্ষিত হ'য়েছে।

খানাবলে মহারাজার বিশ্রাম-ভবন প্রস্তুতের সময় ভিত খুঁড়ুতে খুব বড বড় প্রতিমার মত নাগ-নাগিনীর ও বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিসকল পাওয়া গিয়েছিল। (সম্ভবতঃ ঐ স্থানে নাগ-পূজার মন্দিরাদি ছিল ব'লেই অনুমান হয়।) ঐ সকল মূর্ত্তি এই যাদুঘরে রক্ষিত হ'য়েছে। কালো কষ্টি পাথরের সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট ফল-ফুল-লতার মধ্যে অতি সুন্দর এই সকল মূর্ত্তি। এই সকল প্রতিমায় ভাস্কর-বিদ্যার চরম উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। মূর্ত্তিগুলিতে যেমন শিল্প-দক্ষতা, তেমনি সুন্দর মাধুর্য্য ফুটে উঠেছে। একখানি ধাতুময় বৃহৎ প্রতিমা (সম্ভবতঃ সুবর্ণের) সম্প্রতি খানাবলে উদ্ধৃত হ'য়েছে। ঐ খানিও এখানে রাখা হ'য়েছে। কি সুন্দর বিচিত্রতা এই মূর্ত্তিখানিতে ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে! বাদামের আকারে গঠিত লতাবেষ্টিত কারুকার্য্যময় সমাধিস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি। এই ফুলবিশিষ্ট লতিকাব উপর স্প্রীংয়ের উপর রক্ষিত ছোট ছোট বাদামী আকারে গঠিত প্রতিমা। এই প্রতিমাগুলি দশ অবতারের। বিঘৎ প্রমাণ অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যময় পুতুল। সুন্দর মহিমময় মুখশ্রী-সমুন্নত গঠন দর্শকের চক্ষু এবং মন উভয়কেই আকৃষ্ট করে।

যাদুঘরের একাংশে সরকারী বড লাইব্রেরী আছে। সাধারণে এখানে এসে পুস্তক এবং মাসিক পত্রাদি পাঠ ক'র্‌তে পারেন। যাদুঘরটী খুব বড় না হ'লেও বেশ সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক।

যাদুঘরের সংলগ্ন খুব বড় ফলের বাগান আছে। ইহাতে এ দেশীয় নানা জাতীয় ফলের গাছ বিদ্যমান। এত বড় ফলের বাগান বোধ হয় কাশ্মীরের আর কোথাও নাই। আমরা এই বাগানে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে, এখান হ'তে বেরুলাম এবং সিকারা ক'রে বরাবর মহারাজগঞ্জ-অভিমুখে চ'ল্‌লাম।

মহারাজগঞ্জ

ক্রমে ক্রমে পহেলা পুল ও মহারাজার প্যালেস্ অতিক্রম ক'রে ফতে-কদলের নিকট সিকাবা হ'তে অবতরণ ক'রে তীরে উঠ্লাম। মহারাজ-গঞ্জ বহুদূর-ব্যাপী একটী খুব বড় বাজার। পথ, ঘাট, বাড়ী—অতি পুরাতন, অপরিষ্কার ও কদর্য্য—কতকটা কলিকাতার বড় বাজারের গলির মত। ইহার এখনও কোনও সংস্কার হয় নাই। পথের ধারে সারি গাথা ছোট বড় অপরিষ্কার দু'তলা, তিনতলা কাঠের বাড়ী। নীচের তলায় দোকান। দোকানগুলিতে হরেক রকমের দ্রব্যাদি সজ্জিত র'য়েছে। ক্রেতা, বিক্রেতা ও পথিকগণের গমনাগমন হেতু স্থানটী সর্ব্বদা জনাকীর্ণ। এখানে সকল জিনিষই পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পেপার মেসিনের ও আখরোট্ কাঠের জিনিষগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাগজ ও অন্যান্য দ্রব্যের সংমিশ্রণে প্রস্তুত একপ্রকার দ্রব্যকে পেপার মেসিন বলে। ইহা দেখ্তে কতকটা প্রেষ্ট বোর্ডের মত। ইহার দ্বারা নির্ম্মিত ছোট বড় বাক্স, কৌটা, সাবান দান, কলমদান, ক্যাণ্ডেল ষ্টিক, ইলেক্‌ট্রিক টেবিল ল্যাম্পের ষ্ট্যাণ্ড প্রভৃতি নানা রকমের নানাবিধ সুন্দর সুন্দর জিনিষ বিক্রয় হয়। ঐ সকল জিনিষের উপর রঙের দ্বারা অতি সুন্দর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজ—দেখ্‌তে বড় সুন্দর। জিনিষগুলি খুব হাল্কা। এই সকল জিনিষ বা কাজ দীর্ঘকাল স্থায়ী—জল লাগ্‌লে বা ধুলে নষ্ট হয় না, বা ইহার রংও উঠে না। আখ্‌রোট কাঠের সুন্দর সুন্দর কার্য্যবিশিষ্ট ট্রে, ডিস, বাক্স, কলমদান প্রভৃতি নানাবিধ জিনিষ বিক্রয় হয়। কাশ্মীরে যে কেবল ভাল শাল প্রস্তুত হয় তা নয়,—এখানকার বেতের কাজ, কাঠের কাজ ও পেপার মেসিনের কাজেরও তুলনা নাই।

সুন্দর সুন্দর নানাবিধ দ্রব্যাদিতে সজ্জিত অসংখ্য দোকান থাক্‌লেও, মহারাজগঞ্জ শ্রীনগরের অতি জঘন্য স্থান। এখানে এলে শ্রীনগরের শ্রীর কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না,—ররং বিশ্রী ব'লেই ম'নে হয়। বৃষ্টির সময় রাস্তাগুলি এত কদর্য্য হ'য়ে উঠে যে, এই স্থানে প্রবেশ ক'র্‌তে ঘৃণা বোধ হয়।

এখান হ'তে কিছু কাঠের ও পেপার মেসিনের নমুনা সংগ্রহ ক'রলেম, এবং অন্য দেশে দুষ্প্রাপ্য কাশ্মীরী জিরা ও চা এবং অন্যান্য কিছু কিছু জিনিষ এবং আংটী ও কাণের টপে বসাবার জন্য কয়েকটি খাঁটি পাথর ক্রয় ক'রে পুনরায় সিকারা ক'রে হোটেলে ফির্‌লাম।

হাউস বোট

৫ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার যথারীতি সকালের কার্য্য সমাপনান্তে দু'জনে বেড়াতে বেরুলাম। আমিরাকদলের নিকট হ'তে ঝিলমের ধার দিয়ে বরাবর দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হ'লাম। রাস্তা ঝিলমের পূর্ব্ব ধার দিয়ে চ'লে গেছে। বামে চিফ্‌কোর্ট ও অন্যান্য সরকারী বাড়ী, দক্ষিণে ঝিলম। ঝিলম-বক্ষে অগণিত ছোট বড় বহুবিধ সিকারা ও হাউস বোট সজ্জিত অবস্থায় শোভা পাচ্ছে।

ময়লা কাপড়-পরা এলায়িত বেণী কাশ্মীরী সুন্দরীরা, বহু আবর্জ্জনার মধ্যে সুবর্ণের মত,—বহুল ময়লার মধ্যে পদ্মের মত মুখগুলি অপূর্ব্ব শ্রীতে ভূষিত হ'য়ে, ঝাঁত্‌লা-ঢাকা বোটের ঘরের মধ্যে, রাশিকৃত কর্ণভূষণ ও রাশিকৃত চুড়ির রিণি ঝিনি নিক্বণসহ, কেমন নদীতে মাটির হাঁড়ি বাসন প্রভৃতি ধুয়ে নিচ্ছে—খাদ্য প্রস্তুত ক'র্‌ছে, কেহ বা ছুরি দিয়ে তরকারী বানিয়ে নিচ্ছে,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা অগ্রসর হ'লাম। আমাদের দেখে অনেক সিকারা ও হাউস বোটওয়ালারা, তাহাদের বোটে যাবার জন্য আহ্বান ক'র্‌তে লাগ্‌লো। কৌতুহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে আমরা একখানি হাউস বোট দেখ্‌তে গেলাম। নদীর কিনারা হ'তে দশ বার হাত দূরে হাউস বোট অবস্থিত। কিনারা হ'তে বোটের উপর তক্তা ফেলা, আমরা সেই তক্তার উপর দিয়ে বোটে উঠ্‌লাম। বোটের মালিক যত্ন ক'রে আমাদের নিয়ে গেল, অবশ্য সে ভেবেছিল, আমরা বোট ভাড়া ক'র্‌তে গিয়েছি। এ বোটখানি একতলা, পাশাপাশি পাঁচ ছ'টী কামরা, কামরাগুলি শয়ন কর্‌বার, বস্‌বার, খাবার, পড়্‌বার ও

স্নান কর্‌বার জন্য পৃথক পৃথক ভাবে নির্দ্দিষ্ট। ইহা ছাড়া কমোট দেওয়া পাইখানাও আছে। প্রত্যেক কামরা ম্যাটিং করা ও কামরার অনুরূপ উপযুক্ত আস্‌বাবাদিতে সজ্জিত। শয়ন-ঘরে দু'খানা নেয়ারের খাট ও আলনা প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যথাস্থানে রক্ষিত। সিটিং রুম বা বস্‌বার ঘর—সোফা, কৌচ, টেবিল, চেয়ার দ্বারা সজ্জিত। টেবিলের উপর পড়বার জন্য কতকগুলি পুস্তক পরিপাটিরূপে সাজান। প্রত্যেক ঘরের জানালাগুলিতে সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট রেশমের বা সূতির পরদা বিলম্বিত। ঘরগুলি সমস্ত পেন্টিং করা। ঘরের ভিতর দিয়ে অন্য ঘরে যাবার পথ আছে। ঘরের বাহিরে দু'ধারে সরু বারাণ্ডা। হাউস বোটগুলি পরিষ্কার ও পরিপাটিরূপে সজ্জিত এবং ধনী ব্যক্তিদিগের বাসের উপযুক্ত। হাউস বোটে অগ্নি জ্বাল্‌বার নিয়ম নাই। ইহার সঙ্গে রন্ধনাদি কর্‌বার জন্য আর একখানি বোট আছে। এই বোটে রন্ধনের উপযোগী চুলা ও অন্যান্য সরঞ্জাম আছে। অবশ্য এখানে দাঁড়ি-মাঝিরাও বাস এবং রন্ধনাদি ক'রে থাকে। তাহারা জাতিতে মুসলমান। বলা বাহুল্য—নিষ্ঠাবান হিন্দুর পক্ষে এখানে থাকা অসুবিধা।

আমরা যে বোটখানি দেখ্‌লাম, ইহার মাসিক ভাড়া এক শ' টাকা। সত্তর আসি হইতে দু' তিন শ' টাকা পর্য্যন্ত হাউস বোটের ভাড়া আছে। তীর হ'তে বোটে ইলেকট্রিকের বন্দোবস্ত করা যায়, তাহার চার্জ্জ স্বতন্ত্র। আবশ্যক মত বোট স্থানান্তরে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু তাহার জন্য দাঁড়ি-মাঝিদের সমস্ত খরচা স্বতন্ত্র দিতে হয়। হাউস বোটে অন্য সমস্ত সুবিধা থাক্‌লেও জলের অসুবিধা অত্যন্ত বেশী। বোট ঝিলমের উপর অবস্থিত হ'লেও বোটে জলকষ্ট, কারণ ঝিলমের জল অব্যবহার্য্য। আবশ্যকীয় সমস্ত জল উপরের কল হ'তে নিতে হয়। অবশ্য নিজের লোকজন থাক্‌লে বিশেষ অসুবিধা হয় না, কিন্তু

তাদের উপর নির্ভর ক'রলে, সময় সময় জলের জন্য বড়ই অসুবিধা ভোগ ক'রতে হয়। আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকটী খালসা হোটেল হ'তে সপরিবারে হাউস বোটে গিয়েছিলেন। কয়েকদিন বোটে বাস করবার পর জলের কষ্টে ও রন্ধনের অসুবিধায় পুনরায় তিনি হোটেলে ফিরে আস্‌তে বাধ্য হ'য়েছিলেন।

ডাললেক

ডাললেকটী কাশ্মীরের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডাললেকের ডাল-দরোজা, ঝিলম এবং লেকের কৃত্রিম সংযোগ-স্থলে একটি প্রকাণ্ড গেট। পাথর দিয়ে গাঁথান কৃত্রিম প্রণালীর মুখে ইহা অবস্থিত। জলের গতি নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। তিন দিক পর্ব্বত-বেষ্টিত লেকের বুকে শত শত নির্ঝরিণী প্রপাত এবং নদী মিলিত হ'য়েছে। সামান্য বৃষ্টি হ'লেও বরফ গলিত জল প্রবলবেগে পর্ব্বত হ'তে নামতে থাকে এবং লেকের মধ্য দিয়ে ঝিলম নদীতে নিঃসারিত হ'য়ে যায়। তখন ঝিলম ফুলে উঠে উত্তাল তরঙ্গে নাচতে থাকে। লেকের জল বাহির ক'রে না দিলে, অল্পেই শ্রীনগর ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা, আরও ঝিলমের জল স্থির রাখবার জন্য উহার জলবেগ সংযত করা হ'য়েছে। এতদ্ভিন্ন লেকের জল আরও ভিন্ন ভিন্ন সুঁতি বা প্রণালী দিয়ে বাহির ক'রে দেওয়া হ'য়েছে, এবং কতক পরিমাণ জল নদীকে পূর্ণ ক'রে রেখেছে। জঙ্গলী কাঠ বোঝাই বড় বড় নৌকা লেকের মধ্য দিয়ে যখন ঝিলমে পতিত হয়, তখন ডাল গেটের উপর একজন লোক দাঁড়িয়ে ভীমবলে কপিকলের সাহায্যে ভীষণকায় প্রকাণ্ড দরোজা উত্তোলিত ক'রতে থাকে। ঐ সময় সতত নির্ঝর-বারিতে পরিপূর্ণ লেকের উচ্ছলিত জলরাশি উদ্দামবেগে নদীতে এসে পতিত হয় এবং ঐ জল-স্রোতের সাহায্যে নাবিকেরা মাল-বোঝাই নৌকাগুলি পূর্ণোদ্যমে নদীতে আনিয়া ফেলে। ডাল দরোজা উত্তোলিত হ'লে ঝিলমের জল অতি মাত্র স্ফীত হ'য়ে প্রচণ্ড স্রোতোবেগে নাচিতে থাকে। আমাদের তরণী এই ভীষণ জল-তরঙ্গের মধ্যে কিনারা আশ্রয় ক'রে নাচতে নাচতে বেগে ছুটে চ'ল্লো। প্রণালীর জল সংযত করার জন্য জল অতি দুর্গন্ধ ও কদর্য্য

শ্যাওলায় পরিপূর্ণ, উহা দর্শনেই ঘৃণার উদয় হয়। ইহার দুই পার্শ্বে কাশ্মীরী বস্তি। এই স্থান পার হ'য়ে তরণী যখন লেকের উপর বাহিত হয়, তখন প্রশস্ত স্বচ্ছ নীলবর্ণ জলরাশির উপর কমল-বনের অপূর্ব্ব শোভায় মন মোহিত হ'য়ে যায়। কমল-কহ্লার-শোভিত নীল জলে হংসকুলের বিচরণ,—কূলে ছবির মত ফুলময় রাজধানী শ্রীনগর, অপর তীরে বহু দূরে পর্ব্বতশ্রেণী,—দূরে দূরে কাননের মোহন শোভা,—চিত্ত অলস আরামের স্বপ্নরাজ্যে নিমগ্ন হ'য়ে যায়। ছোট ছোট খণ্ড খণ্ড জমির উপর ফল-ফুলের গাছ দিয়ে ভাসমান বাগান করা হ'য়েছে। এই জমিগুলি ভাসমান বস্তুর দ্বারায় কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত ক'রে খুঁটি অথবা নঙ্গরের দ্বারায় জলের উপর স্থিরভাবে রাখা হ'য়েছে। এই গুলিই কাশ্মীরের বিখ্যাত ফ্লোটিং গার্ডেন বা ভাসমান বাগান। প্রায়ই চুরির দ্বারা একের বাগান অন্যের সহিত যোজিত হয়, তজ্জন্য ইহার অপর একটী নাম 'জোমিন চৌরী'। কখন কখন প্রবল বাতাস বা অন্য কোনও কারণে কোন কোন বাগান স্থানচ্যুত হ'য়ে, বিস্তৃত লেকের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়ে, তখন ঐ সকল বাগানের মালিকেরা সিকারা কিম্বা বোটের সাহায্যে বাগান অন্বেষণে বহির্গত হয়। দূর থেকে দেখ্‌লে এগুলি ছোট ছোট দ্বীপ ব'লে ভ্রম হয়। শঙ্কর শৈলের উপর হ'তে এই অঞ্চলটী পুষ্পময়ী জলার মত দেখায়, অথবা শত শত প্রণালী দিয়ে সাজান প্রকাণ্ড ফুল-বাগানের মত মনে হয়। ইহার আশে-পাশে তীরের উপর চেনার, দেয়ার, সফেদা ও পাইন বৃক্ষ-ঢাকা বহু কুটীর বা বস্তি র'য়েছে। এই লেকের জলে প্রচুর পানিফল জন্মায়। বালক, বালিকা, পুরুষ ও রমণী কোমর পর্য্যন্ত জলে নেমে পদ্মের মৃণাল এবং পানিফল আহরণ করে;—এ দু'টী জিনিষই এ দেশবাসীর প্রিয় খাদ্য।

নীলাঞ্জন প্রভা মহাদেও পর্ব্বতের কোলে, দীর্ঘে প্রায় চার মাইল ও প্রস্থে প্রায় তিন মাইল ব্যাপিয়া ডাললেক অবস্থিত। মধ্যে পর্ব্বতের সান্নুদেশে নীলাম্বরণের কিনারার মত রাজপথ শোভা পাচ্ছে। অপর পাবে ফুলময় শ্রীনগর,—সুন্দরের সংযোগে সুন্দর শ্রীনগর সুন্দরতর হ'য়ে উঠেছে। শ্রীনগরের কণ্ঠহারের মধ্যমণির মত ডাললেকের নীলিমাময় প্রশস্ত জলরাশি এই নগরের শোভা বর্দ্ধন ক'রছে। ইহারই তটে শ্রীনগরের সকল সৌন্দর্য্য বিরাজমান। এই লেকের ধারে সালামারবাগের মোহন চিত্র। মহাদেও পর্ব্বত-নিঃসৃতা প্রচণ্ড প্রপাত বারি,—সালামারবাগের হৃদয়-শোভা বর্দ্ধিত ক'রে প্রবল উদ্দাম বেগে বাগানের প্রাচীর ভেদিয়া ঝর্ ঝর্ ক'রে পতিত হ'য়ে এই লেকের বুকে মিলিত হ'য়েছে। নির্ণিমেষ লোচনে এই দৃশ্য দর্শন ক'রতে ইচ্ছা হয়। ইহার তীরেই নিশাতবাগের চারুচিত্র গগন-পটে আঁকা র'য়েছে; এবং ছায়াশীতল নিরাভরণা কুটীরবাসিনী তপস্বিনী গুপ্তগঙ্গার নীল স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ জলে পরম যোগী মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি নিমজ্জিত রয়েছে; এবং মহাদেও পর্ব্বত-নিঃসৃত হারুয়াণ হ্রদের জল শতমুখী হ'য়ে এই লেকের বুকেই মিশে গেছে।

এই লেকের কুলেই রাণাওয়ারি গ্রামের নিকট শিখগুরু হরগোবিন্দ সিংহের নামে উৎসর্গীকৃত গুরুদোয়ারা অবস্থিত। দশম গুরু হরগোবিন্দ সিংহের জন্মদিনে এই গুরুদোয়ারায় মেলা এবং মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাণা ওয়ারির এক মাইল দূরে মুসলমানদিগের হজরৎবল নামক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। আরবদেশীয় কোন মহাপুরুষের দ্বারা আনীত হজরৎ মহম্মদের শ্মশ্রু এই স্থানে রক্ষিত আছে। ঈদ-পর্ব্বের সময় সেই শ্মশ্রু প্রদর্শিত হয়।

লেকের তটে প্রশস্ত প্রাঙ্গনের পারে মস্‌জেদ্, ইমামবারা, মুসাফের

খানা, হজরবং বল প্রভৃতি সুদৃশ্য দর্শন। এ সকলই এই লেকের অলঙ্কার স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। লেকের ধারে মহারাজার চেনার বাগ শতাধিক বড় বড় চেনার বৃক্ষে (কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের মত) স্থানটীকে স্নিগ্ধ শান্তিময় ক'রে রেখেছে। এই শান্তিকুঞ্জে প্রবেশ ক'র্‌লে আকাশ দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, ঢলঢলে পল্লবের চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত র'য়েছে। নীচেটি পরিষ্কার—একটী পাতাও পতিত নাই। লেকের উপর হ'তে এই কাননটি ছবির মত মনে হয়। এই কাননের তলে সুঁতি, এবং সুঁতির উপর বহু সিকারা ও বোট ভাস্‌ছে ও একটা ঝুলন সেতু সুঁতির উপর ঝুলছে। পহেলগামে যাবার সময় এই চেনার বাগের পাশ দিয়ে এবং এই সেতু পার হ'য়ে যেতে হয়। চেনার বাগে বায়ু সেবনে শরীর ও মন উভয়ই নবীন ও প্রফুল্ল হয়। সুঁতির মধ্যে জেলেরা বর্ষা বিদ্ধ ক'রে মাছ ধরে। অনেক রকমের মাছ বহুল পরিমাণে এখানে পাওয়া যায়। কাশ্মীরের হিন্দুরা মাছ খায় না, কিন্তু মাংস খায়। সেতুর ও-পারে মহারাজার ফলের বাগিচা। উপরে শ্যামকান্তি সুবন্য কানন, নিম্নে নীলমণিনিভ স্বচ্ছ জলরাশি। এই স্থানটি যেন নীলের রাজ্য। কর্ম্মাবসানে নিভৃত চিন্তার মনোরম নিলয়।

ডালহ্রদ ভিন্ন কাশ্মীরে আরও কয়েকটী হ্রদ আছে, তন্মধ্যে উলার হ্রদটী সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এই হ্রদ শ্রীনগর হ'তে অনেক দূরে, গিলগিট যাবার পথে। মোটরে যাওয়াই সুবিধা কিন্তু অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। নৌকাতেও যাওয়া যায়, কিন্তু সময়-সাপেক্ষ। এই হ্রদটী অতি বিস্তৃত। গ্রীষ্মকালে ইহার ব্যাস প্রায় চৌদ্দ মাইল। ঝিলম, মধুমতী প্রভৃতি অনেক পার্ব্বত্য নদী ইহাতে পতিত হ'য়েছে উলার হ্রদে সকাল বেলায় বেড়ান নিরাপদ, কারণ বিকালের দিকে সময় সময় অতর্কিত ভাবে

হঠাৎ ঝড় উঠে, তখন নৌকায় থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক। অনেক দূর হ'তে আমরা উলার হ্রদে যেতে সাহস ক'রলাম না।

আমাদের মোটামুটি এক রকম কাশ্মীর দেখা শেষ হ'ল। শুনেছি, এখানে প্রকৃতি সতী বিভিন্ন ঋতুতে নব নব রূপের বদল নিয়ে অভিনব সাজে সজ্জিত হ'য়ে, অপরূপ সৌন্দর্য্য ধারণ ক'রে মর্ত্তে নন্দনকাননের শোভা সম্পাদন করে। যদি সকল ঋতুগুলি এখানে কাটাতে পারতেম, তা সেই সমস্ত সৌন্দর্য্যই উপভোগ ক'রে ধন্য হইতেম, কিন্তু আমাদের পক্ষে সেটা সম্ভবপর নয়। নববেশধারিণী সৌন্দর্য্যময়ীর আংশিক সৌন্দর্য্য দর্শনে, জ্বালাময় প্রাণে শান্তিময় ভগবানের শত প্রকার অনুভূতি লাভে সন্তুষ্ট হ'য়ে, শ্রীনগর ত্যাগের সঙ্কল্প ক'রলাম। যাঁর অশেষ করুণায়, সহায়হীন দম্পতিযুগল শোক সন্তপ্ত-হৃদয়ে সুদূর বিপদসঙ্কুল পার্ব্বত্য প্রদেশে নির্ব্বিঘ্নে ভ্রমণ ক'রে বেড়ালো,—সেই সাক্ষাৎ শিবরূপী শ্রীগুরুর চরণে শত শত প্রণাম ক'রে, পরদিনই জম্মু যাত্রা স্থির ক'রলাম্ এবং সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার সমস্ত আয়োজনও ঠিক ক'রে ফেল্লাম।

চতুর্থ অধ্যায়

জম্বু

জম্বুর পথে

৬ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার সকালে হোটেলের বিল চুকিয়ে দ্বারবান প্রভৃতি লোকজনকে যথাযোগ্য বক্‌সিসাদি দিয়ে, সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বেলা প্রায় ন'টার সময় আমরা শ্রীনগরের খালসা হোটেল পরিত্যাগ ক'রলাম। বাসের কুলিরা এসে মালপত্রাদির ব্যবস্থা ক'রে নিয়ে গেল। তারা এমন তাড়াতাড়ি ক'র্‌লে যে, আমাদের আর আহারের সময় হ'লো না, সামান্য কিছু জলযোগ ক'রেই বেরিয়ে প'ড়লাম।

এ যাত্রাটা আমাদের সব চেয়ে বেশী কষ্টদায়ক হ'য়েছিল। তাহার একমাত্র কারণ, এই বাস কোম্পানীর খামখেয়ালি। ন'টা'র সময় বাস ছাড়বার কথা, ঠিক সময়ে বাসের কুলিরাও হোটেল থেকে তাড়াতাড়ি ক'রে মালপত্র সহ আমাদের নিয়ে গেল, আমরাও সময়ের অল্পতা হেতু আহারের কোনও বন্দোবস্ত ক'র্‌তে পারলেম না। কিন্তু বাস ছাড়্‌লো প্রায় এগারটার সময়। এরূপ হবে জান্‌লে অনায়াসেই আমাদের আহারাদি সম্পন্ন হ'তে পারতো, কিন্তু বিধির বিধানে এ দিন আমাদের উপবাসেরই ব্যবস্থা ছিল।

মোটর অফিস বা আড্ডা হোটেলের নিকটেই। এখান হ'তে কয়েকটি কোম্পানীর মোটর রাওলপিণ্ডি ও জম্বু যাতায়াত করে। আমরা মালপত্র সহ এখানে এসে উপস্থিত হ'লেম।

এ দিন অল্প অল্প গরম বোধ হ'চ্ছিল, তার উপর ঝাড়া দু'ঘণ্টা বাসে ব'সে ব'সে অত্যন্ত বিরক্তি লাগ্‌ছিল। যদিও পূর্ব্বদিন উনি এই বাসের প্রথম সিট্ রিজার্ভ ক'রে টিকিট কিনেছিলেন, তথাপি এই রিজার্ভ সিট্ নিয়েও ইহারা গোলমাল লাগিয়ে দিল। উনি অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে হোটেলে ফিরে আস্‌ছিলেন দেখে উহারা আপোষ ক'রে নিল।

আমাকে প্রথম সিট দিয়ে উনি আমার পিছনের সিটে ব'সলেন। অন্যান্য যাত্রীর সহিত অনেক খুটিনাটির পর বেলা এগারটার সময় জম্মুর উদ্দেশে বাস ছেড়ে দিল। এখান থেকে জম্মু ২০৩ মাইল। দু'জনের ভাড়া পাঁচ টাকা।

আমরা পহেলগামের পথ ধ'রে চ'ললাম। কুড়ি মাইল পথ অগ্রসর হ'য়ে খানাবলে উপস্থিত হ'লাম। এই স্থানে মহারাজার একটী সুন্দর উপবন এবং বিশ্রাম-ভবন আছে। এই বাড়ীটি প্রস্তুত হওয়ার সময় ভিত খুঁড়তে কষ্টি পাথরের অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি এবং কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ মাটির জালা বাহির হয়। এই সকল দ্রব্য প্রতাপ মিউজিয়মে রাখা হ'য়েছে। আমরা মহারাজার বিশ্রাম-ভবন পাশে রেখে জম্মুর দিকে অগ্রসর হ'লেম।

ভেরিনাগ

খানাবল হ'তে ভেরিনাগ পনের মাইল। প্রায় আর্দ্ধেক পথ সমতল ভূমি অতিক্রম ক'রে উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লেম। পরে ক্রমনিম্ন পথে অবতরণ ক'রে, সমতল ক্ষেত্রে তৃণাচ্ছন্ন শ্যামল প্রান্তরের মধ্য দিয়ে, লোয়ারমণ্ডা গ্রামের কাছে ভেরিনাগে এসে উপস্থিত হ'লেম। দূরে নানা মুস্তকের শ্যামল পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্টি অবরুদ্ধ ক'রে রেখেছে। পাইন গাছের জীর্ণ জঙ্গলে-ঢাকা অতি বিশালকায় পর্ব্বতের কোলে সুন্দর একটা উপবন; উপবনের মধ্যে প্রাচীর-ঘেরা চারিদিক পাথর দিয়ে গাঁথা আটকোণা একটী জলাশয়। ইহাই ভেরিনাগ সরোবর। চব্বিশটী খিলানের উপর এই প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে। একটী খিলানের উপর প্রস্তর-ফলকে উর্দ্দু অক্ষরে লিখিত আছে,— এই স্থান হ'তে ঝিলমের উৎপত্তি। আকবর ও জাহাঙ্গীর বাদশাহের আদেশে প্রায় ৩৪০ বৎসর পূর্ব্বে মিস্ত্রি হায়দার কর্ত্তৃক ইহা প্রস্তুত হয় এবং ইহার জল নির্গম-পথ ও কৃত্রিম জল-প্রপাত সম্রাট শাহজাহানের আদেশে নির্ম্মিত হয়। সরোবরের কানায় কানায় টল্‌টলে গাঢ় নীল রঙের স্বচ্ছ জল বড় বড় কালো কালো মাছে পূর্ণ হ'য়ে রয়েছে। কিছু খাদ্য জলে ফেলে দিলে, চড়্‌বড়্‌ ক'রে এই ফোয়ারার মত মাছ লাফিয়ে উঠ্‌তে থাকে। এখান হ'তে নালার মধ্য দিয়ে জল ঝর্‌ঝর ক'রে আর একটী নালায় গিয়ে প'ড়ছে। এখানেও বড় বড় কালো কালো মাছগুলি চমৎকার খেলা ক'রছে। এখান হ'তে জল বরাবর সোজা কৃত্রিম পথে বাগানের মধ্য দিয়ে চ'লে গিয়েছে। বাগানের শেষ প্রান্তে বড় বড় পাথর সাজিয়ে প্রপাতের সৃষ্টি করা হ'য়েছে। সাজান পাথরের গায়ে বিবিধ বর্ণের লতা জড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছে। লতাগুলি
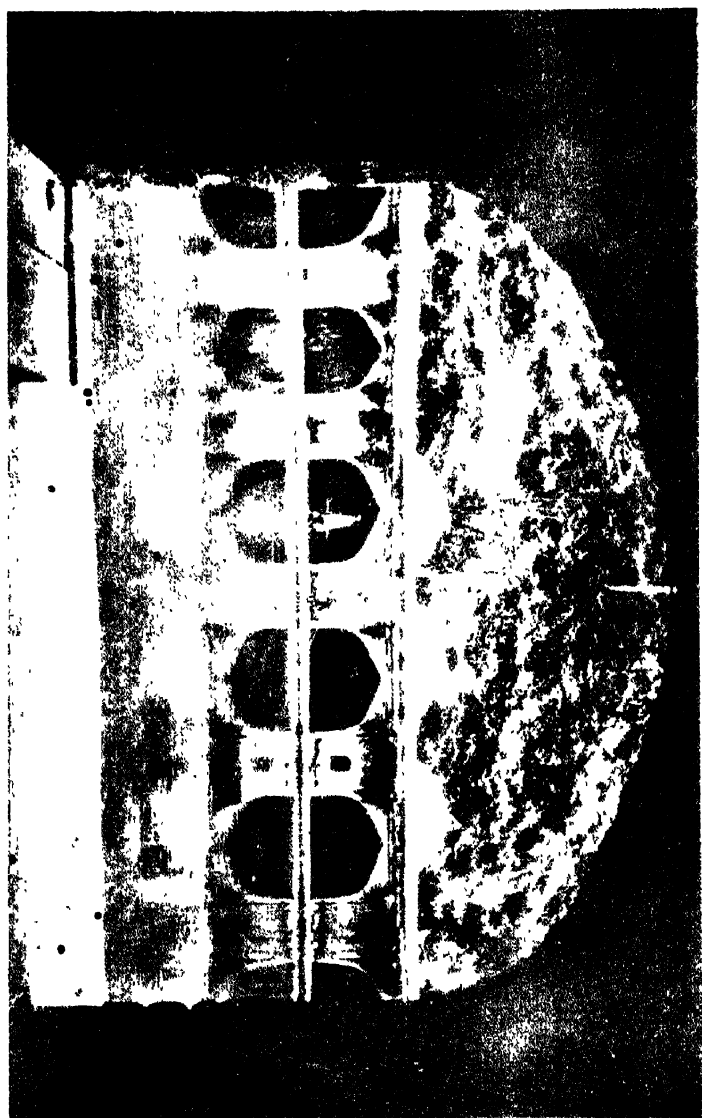
ফলে ফুলে বৃদ্ধি হ'য়ে প্রপাতের চমৎকার সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি ক'রেছে। প্রপাতের মুখে—উল্‌টা স্রোতে মাছগুলি মনের সুখে খেলে বেড়াচ্ছে। ন্যাসপাতি, আখরোট, আপেল, চেরি ও আঙ্গুর প্রভৃতি বৃক্ষ-লতায় বাগানটী ছায়া-শীতল ক'রে রেখেছে। এখন ফলের সময় নয়, শুধু চেরি পেকে স্থানে স্থানে আলো ক'রে রেখেছে।

এক স্থানে একটী ছোট পুষ্করিণীর মাঝখানে অনতিউচ্চ বড় একটী জলস্তম্ভ, ফুলে ফুলে উপরের দিকে উঠে চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়ছে। অফুরন্ত জলোদ্গীরণে পুষ্করিণী ছাপিয়ে জল—নালার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এ যেন কোনও স্বপ্ন-রাজ্য, এ রাজ্যে মন যেন কিছু অজানা হারানোর প্রাপ্তি-আশায়—অজানা রাজ্যে ব্যাকুল হ'য়ে ঘুরে বেড়াতে চায়।

বনিহাল পাস্

ভেরিনাগ দেখে জম্বুর দিকে অগ্রসর হ'লাম। লোয়ারমুণ্ডার পর, ক্রমোন্নত হ'য়ে উৰ্দ্ধে, তদূর্দ্ধে ও বহুউর্দ্ধে ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে। ক্রমে এত উপরে উঠেছে যে, এই স্থানে উপস্থিত হবার পর নীচের বস্তু আর দেখা যায় না। মধ্য পথের দৃশ্যগুলি, এক খানি প্রকাণ্ড ম্যাপের মত দেখাতে লাগ্‌লো। স্থানে স্থানে বরফ প'ড়ে পথ প্রায় বন্ধ। পর্ব্বত-শিখর হ'তে বড় বড় নদী সমতল ক্ষেত্রে নেমে আস্‌তে আস্‌তে জমে পাঁচ ছ'হাত পুরু তুযার-মূর্ত্তি ধারণ ক'রে পথ রুদ্ধ ক'রে আছে। পথের উপর হ'তে এই সকল বরফ কেটে পথ বার করা হ'য়েছে। দুই পাশে বরফ পাঁচ ছ'হাত পুরু স্তুপাকার হ'য়ে আছে। এই রকম প্রায় শতাধিক বরফ-কাটা পথ পার হ'লেম। কি ভীষণ গুরু গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত এই পীরপঞ্জাল গৈরিক পর্ব্বতশ্রেণী! প্রশস্ত সর্পাকৃতি রাজপথ ইহারই অঙ্গ শোভিত ক'রে উর্দ্ধে—তদূর্দ্ধে ও বহুউর্দ্ধে উঠে গিয়েছে। পুনরায় শিখর বেষ্টন ক'রে নিম্নে—তন্নিম্নে ও বহু নিম্নে নেমে এসেছে। এই ভাবে শ্রেণীবদ্ধ অনন্ত পর্ব্বতমালা পার হ'তে হ'তে পাখির মত মোটর যেন উড়ে চ'লেছে। সমস্ত জম্বুর পথে এই গৈরিক পর্ব্বতমালা ভীষণ আকারে দাঁড়িয়ে আছে।

অবন্তীপুর, খানাবল, অনন্তনাগ, লোয়ারমুণ্ডা, আপার মুণ্ডা প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়ে জম্বুর রাস্তা। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ডাক বাঙ্গলা বা চটি আছে।

বনিহাল পর্ব্বত ভয়ঙ্কর উচ্চ—একটী সুড়ঙ্গ এই পর্ব্বতের বক্ষ ভেদ ক'রে বহুদূর পর্য্যন্ত চ'লে গেছে—ইহারই নাম বনিহাল পাস্। এই বনিহাল গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়ে জম্বুর পথ। সুড়ঙ্গের উপর ও উহার বিবর-মুখের খিলানের উপর তুষাররাশি স্তুপাকার হ'য়ে জমে আছে।

আম্যানত

ঐ সকল তুষার গলিত হ'য়ে বৃষ্টির আকারে ঝর্ ঝর্ ক'রে সুড়ঙ্গের মধ্যে পতিত হ'চ্ছে ও সুড়ঙ্গের অঙ্গ বাহিয়া হু হু ক'রে নেমে আস্‌ছে।

সুড়ঙ্গের ভিতর ভয়ানক অন্ধকার—প্রবেশ ক'রলে ভয় হয়। সম্মুখের বাতি জ্বেলে দিয়ে মোটর ভিতরে প্রবেশ ক'রলো। অন্য একখানি মোটর ও-মুখ হ'তে প্রবেশ ক'রছিল, আমাদের মোটর তখন প্রায় মধ্য পথে এসে প'ড়েছে। ক্রমাগত হর্ণ বাজিয়ে ইঙ্গিত করাতে সেই মোটর-খানি পেছিয়ে গেল।

টনেল হ'তে বা'র হ'য়ে দেখা গেল, দৃশ্য-পট পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে। নীচের বস্তুগুলি আর কিছুই দেখা যায় না, মধ্য-পথে দৃশ্য-গুলিই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব'লে বোধ হ'চ্ছিল।

বনিহাল গিরি-সঙ্কট পার হ'য়ে আমরা পীর পঞ্জালের অপর পারে উপস্থিত হ'লাম। এখান হ'তে জম্বুরাজ্য সূচনা হ'য়েছে। পীর পঞ্জা-লের উপর হ'তে জম্বু রাজ্য—কি অপরূপ দৃশ্য! তুষার রাশি মেঘে ঢাকা বিশাল কায়া গগনস্পর্শী অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণী দিগন্ত প্রসারিত মেঘমালার অভিনব রাজ্য। ভীষণ ভীষণ পর্ব্বতসকল বহুদূর ব্যাপিয়া একটির পর একটী উচ্চ শিরে পায়ে পা ঠেকিয়ে ভীষণ ভ্রুকুটি বদনে যেন জম্বুরাজ্যের সীমানায় প্রহরায় নিযুক্ত আছে। পশ্চাতে দূর দূরান্তরে শত শত চূড়া-শোভিত অতি উচ্চ স্তরের পর স্তর বিন্যস্ত ক'রে শ্বেত আবরণ;—বুঝিবা দেব-সৈনিকের শ্বেত বস্ত্রাবাসসকল নির্ম্মিত হ'য়েছে। পরে আরও দূরে ও কি ও—উহাও কি বস্ত্রাবাস? না আর কিছু? ও যেন, পক্ককেশরাশি উড়িয়ে দিয়ে কর্ম্মঠ অতিকায় বৃদ্ধ মন্ত্রীগণ শ্বেত বস্ত্রে শোভিত হ'য়ে উচ্চতর স্তম্ভে আসীন র'য়েছেন, এবং উচ্চ হ'তে কর্ম্মক্ষেত্র পরিদর্শন ক'রছেন। আর তাঁহাদের পশ্চাতে অসংখ্য শ্বেত পতাকা সকল গগন-প্রান্তে উড্ডীন হ'য়ে দিগন্তে দোদুল্যমান হ'চ্ছে।

নিকটের কতকগুলি পর্ব্বতের গায়ে, তাহার শোভা বৃদ্ধি ক'রে প্রশস্ত রাজপথ সকল সাপের মত এঁকে বেঁকে চ'লে গেছে। ভিন্ন শৈল-শৃঙ্গ হ'তে তাহা দেখ্‌তে সতনরি কণ্ঠহারের মত সুন্দর। সজারুর কাঁটার মত ছোট বড বৃক্ষ-ঢাকা শৈলমালা ইহারই প্রহরায় নিযুক্ত থেকে ভ্রূকুটি বদনে দাঁড়িয়ে আছে। নীচে বহুদূরে ছোট ছোট পল্লিগ্রাম, নদী, শষ্যক্ষেত্রসকল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দেখাচ্ছে। যত অগ্রসর হ'ওয়া যাচ্ছে—ততই ঐ গুলি বড় হ'য়ে উঠ্‌ছে। কার সাধ্য নীচের দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখে!—মনে হয় মাথা ঘুরে এখনই গাড়ী হ'তে বহু নিম্নে পতিত হ'ব। মেঘ সকল আমাদের বহু নীচেয় জমাট বেঁধে র'য়েছে। এই স্বর্গের মত উচ্চ হ'তে, ঐ বহু নিম্নে, ঐ স্থানে দ্রুতগতিতে অবতরণ ও এই স্থানে একই ভাবে পুনরারোহণ অতিশয় ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে যিনি স্থির চিত্তে শ্যেন পক্ষীর মেঘরাজ্যে গমন ও দ্রুত পৃথিবীতে আগমন লক্ষ্য ক'রেছেন, তিনি কতকটা এই বাসের গতি বুঝ্‌তে পার্‌বেন। আর যাঁদের চাক্ষুস পরিচয় আছে, তাঁদের বল্‌বার কিছুই নাই।

এই পার্ব্বত্য পথে বাসগুলি যেন চার খানি পাখা মেলে উড়ে চ'লেছে। 'কার' গুলি মটর কড়াইয়ের মত গড়িয়ে যাচ্ছে। নিয়তই এই পথে বাস এবং কার ছুটাছুটি ক'রছে। পথের এক দিকে অনন্ত শূন্য; অপর দিকে ভীমকায়া পর্ব্বতশ্রেণী সোজা দাঁড়িয়ে আছে। আর গাড়ীগুলি নিয়ত অদৃশ্যমান বক্রগতিতে মেলট্রেণের মত ছুটে চ'লেছে। একটু অসাবধানে বিপরীতগামী দুই খানি গাড়ীর ঠোকাঠুকি খুবই সম্ভব। যাহা হোক, এমনি ক'রে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা রামসু চটিতে এসে উপস্থিত হ'লাম।

রামস্থ চটি

পার্ব্বত্য রাজ্যে, পর্ব্বত-গাত্রে চটিটি অবস্থিত। নিম্নে দূরে প্রবাহিতা উত্তাল তরঙ্গমালিনী নদী। পরপারে ও চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ ক'রে ভীষণ কায় কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবর্ণ এবং পীতবর্ণের বন্ধুর গিরিশ্রেণী সমুন্নত শিরে শত শত বাহুপ্রসারণে যেন স্বর্গ আক্রমণে উদ্যত হ'য়েছে। শত শত নির্ঝরিণী যেন নানা শব্দের ঐক্যতানে স্থানটিকে মুখরিত ক'রে অনন্তের পথে ছুটে চ'লেছে। কোথাও বা প্রপাতের নিদারুণ গুরুগম্ভীর কলরবে কর্ণ বধির হ'য়ে যাচ্ছে।

দু'খানি 'বাস' গতায়াত ক'রতে পারে, এমনি একটী বাঁধা পথ—অজগরের মত অঙ্গ ঢেলে দিয়ে এঁকে বেঁকে পর্ব্বতের অন্তরালে গিয়ে মুখ লুকিয়েছে। পথের পাশে তৃণ ও মাটি-মিশ্রিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, লেপা-মোছা পাকা ঘরের মত মাটির ছাদ দেওয়া কতকগুলি ছোট ছোট ঘর। অপর পাশে একটী দারু-নির্ম্মিত দোতলা ডাক বাঙ্গলা। বাঙ্গলার পিছনে ভরাটশূন্য। তৎপরে প্রচণ্ড স্ফীতা উত্তাল তরঙ্গময়ী নদী গভীর গর্জ্জনে ছুটে চ'লেছে। এই স্থানে এসে 'বাস' রজনীর মত বিশ্রাম বাসনায় স্থির হ'লো। আমরা সকলে একে একে নেমে প'ড়লাম। দ্রব্যাদি 'বাস'-চালকের তত্ত্বাবধানে রেখে সকলে চটিতে গিয়ে আশ্রয় নিলেম। পূর্ব্বোক্ত ছোট ছোট ঘরগুলি চটি নামেই পরিচিত। স্থানটী অতি ক্ষুদ্র, ছোট একখানি গ্রাম।

আমরা একটী লোকের সঙ্গে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ডাক বাঙ্গলার উপরে গিয়ে উঠ্‌লেম। বেশ প্রশস্ত, সার্সিদেওয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকার—কাশ্মীরী বারাণ্ডা। বারাণ্ডার কোলে ছোট বড় দু'টী ঘর। বড় ঘরটী টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি আসবাব দ্বারা সজ্জিত এবং এর সঙ্গে একটী পাইখানাও

আছে। এক রাত্রির ভাড়া দেড় টাকা। ছোট ঘরে আসবাব-পত্র বিশেষ কিছু নাই, পাইখানাও নাই, এক রাত্রির ভাড়া বার আনা। কিন্তু এখানেও ভাড়ার কোনও বাঁধা রেট নাই। লোক এবং সময় বিশেষে ইচ্ছামত আদায় করে। আমরা বড় ঘরেই আশ্রয় নিলাম।

ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটী ভেন্টিলেটার এবং একটী চিম্‌নি উভয়ই র'য়েছে। ঘরের পশ্চাতে সরু একটী বারাণ্ডা। বারাণ্ডার এক প্রান্তে পাইখানা, অবশ্য কমোট দেওয়া। অপর প্রান্তে একটী টুল, একখানি চেয়ার, বড় এক বাল্‌তি জল। টুলের উপর একখানি বড় এনামেলের গাম্‌লা। মোটামুটি গোছলখানার সবঞ্জাম র'য়েছে। ঘরের মধ্যে দু'খানি নেয়ারের খাটিয়া, দু'টী টেবিল এবং দু'খানি চেয়ার ও একটী টেবিল ল্যাম্প। মেঝেটী আগাগোডা শতরঞ্চি দিয়ে মোড়া। দেওয়ালে দু'টী আনলা। মোটের উপর বেশ সন্তোষজনক বন্দোবস্ত।

সমস্ত দিনের পরিশ্রান্ত দেহে বাসোপযোগী বাসস্থান লাভ ক'রে, আমাদের মনটা বেশ প্রফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লো। সন্ধ্যার সময় পাশের ঘরে এক খেতাবি রাজা এসে উপস্থিত হওয়ায়, হোটেলওয়ালা এক রাত্রের জন্য তাঁহার সঙ্গে তিন টাকা বন্দোবস্ত ক'রলে। যাহাহোক, প্রথমে আমরা একটী অস্থায়ী খানসামার বন্দোবস্ত ক'রে নিলাম, লোকটী হিন্দু। তারপর ঘরের সংস্কার আরম্ভ হ'লো। প্রথমতঃ এনামেলের গামলা খানি সরিয়ে দিলাম, এবং দু'চার কলসী জল আন্‌বার ব্যবস্থা ক'রে দিলাম। প্রতি কলসী চার পয়সা ক'রে মজুরী নিল। জল রাখ্‌বার জন্য 'বাস' হ'তে বালতিটা আনিয়ে নিলাম। আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি সঙ্গে থাক্‌লে কষ্ট কম হয়। পরে কীটব্যাগ দু'টী ও হাণ্ডব্যাগটা এবং রাত্রিবাসের জন্য ছোট বাঁধা শয্যাটীও 'বাস' হ'তে আনিয়ে নিলাম।

এখানকার বন্দোবস্ত সমস্ত ঠিক ক'রে উনি আহারীয় সংগ্রহের চেষ্টায়

বেরুলেন, আর আমি ব্যাগগুলি খুলে ঘর-সংসার গুছাতে ব'সলেম। প্রথমতঃ ঝাড়ু গাছটা বা'র ক'রে সব বেশ ক'রে ঝেড়ে ফেল্‌লাম্, তৎপরে একটা টেবিল মধ্যে টেনে এনে একখানি ধপধপে সাদা ফ্লানেল বার ক'রে টেবিলটী ঢাকা দিয়ে নিলাম। দু'খানি চেয়ার এনে টেবিলের ধারে রাখ্‌লাম। বিছানাটী খুলে একখানি খাটিয়ায় কম্বল এবং চাদর দিয়ে শয্যা প্রস্তুত ক'রলাম। অপর খানিতে একখানি পরিষ্কার কম্বল বিছিয়ে বসবার স্থান ক'রে নিলাম। সকালের ভিজা কাপড়গুলি খুলে বারাণ্ডায় শুকাতে দিলাম। মুখ-হাত ধোবার জন্য একটী মগ ও একখানি সাবান, একখানি গামছা, গোছল টেবিলে রেখে দিলাম, মাটির মোড়কটী বা'র ক'রে রাখ্‌লেম। আরসি, চিরুণী প্রভৃতি একটী টেবিলে সাজিয়ে নিলাম। পুরা দস্তুর ঘর-সংসার বানিয়ে ফেলেছি। আজ্‌কের মত শান্তি। 'তারপর বেশ ক'রে হাত-মুখ ধুয়ে-মুছে কাপড়গুলি ঝেড়ে-ঝুড়ে পরিষ্কার ক'রে প'রে নিলাম। এবার ভদ্রলোক হয়ে সঙ্গে আনীত যে ফল, মেওয়া ও মিষ্টান্নাদি ছিল,—সেইগুলি ধুয়ে-মুছে ছুরির দ্বারা আহারের উপযুক্ত ক'রে নিয়ে ডিসে সাজিয়ে-গুছিয়ে টেবিলের উপর রেখে দিলাম। পথে, সুরাই ভর্ত্তি ক'রে নির্ঝরের সুপেয় শীতল জল এনেছিলাম, দু'টী গেলাস ধুয়ে, ঐ জল ভর্ত্তি ক'রে টেবিলের উপর ঢাকা দিয়ে রেখে দিলাম। পরে পানের বাক্সটী বার ক'রে খাটিয়ার উপর ব'সে পান সাজায় মনোযোগ দিলাম। এতক্ষণে উনি দু' কাপ্ চা ও কিছু মিষ্টান্ন নিয়ে উপস্থিত হ'লেন। সমস্ত প্রস্তুত দেখে খুসী হ'য়ে জিনিষগুলি টেবিলের উপর রেখে দিয়ে, হাত মুখ ধুয়ে এলেন। এতক্ষণে আমার পানগুলিও হ'য়ে গেছে। বাক্স শুদ্ধ তুলে রেখে সাম্‌নে ব'সে সমস্ত দিনের পর পরিতোষ ক'রে জলযোগ করালেম। উঁহার আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি এগিয়ে দিয়ে, আমিও জলযোগ ক'রে নিলাম।

উনি ব'ল্লেন, এখানে গরম গরম ডাল-রুটি ও তরকারি প্রস্তুত হ'চ্চে, কিছু আনবার ব্যবস্থা করি। আমি সম্মতি জ্ঞাপন করাতে, উনি উহার সন্ধানে একখানি ডিস হাতে ক'রে চ'লে গেলেন। এখানে বলা দরকার যে, এ প্রদেশে অর্থাৎ জম্বুরাজ্যে উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি জল দিয়ে ধোয়া হয় না, ছাইয়ের মত একপ্রকার জিনিষ দিয়ে বেশ ক'রে মেজে, শুকনা কাপড়ের টুকরা দিয়ে মুছে নেওয়া হয়। ছাই দিয়ে মুছে নেওয়ার কারণ ওঁর মনে ঘৃণার উদয় হওয়ায়, হোটেলের বাসনের পরিবর্ত্তে ঘরের বাসনেই আহার সংগ্রহের ব্যবস্থা ক'রলেন।

এতক্ষণে আমি প্রাকৃতিক দৃশ্যে মনঃসংযোগ করবার সময় পেলেম এবং বারাণ্ডায় গিয়ে মুক্ত বায়ুতে দেহ একটু শীতল করবার অভিলাষে বারাণ্ডার দিকে অগ্রসর হলেম।

তখন অন্ধকার রজনী তার পাতলা কৃষ্ণবর্ণ অঞ্চলখানি প্রকৃতির বুকের উপর উড়িয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে আস্‌ছে। পাহাড়ের গায়ে চারিদিকে কৃষ্ণছায়া পতিত হ'য়ে, কেমন যেন ভয়-দেখান ভাব হ'য়ে উঠ্‌ছে। একে বারাণ্ডার নীচে উপরে আশে-পাশে বহুদূর পর্য্যন্ত মহা শূন্য ;—বারাণ্ডাটি যেন এই মহা শূন্যে দোদুল্যমান। তার মধ্যে এই শূন্যের ব্যবধান রেখে ঐ দূরে বিকটকায় কৃষ্ণবর্ণ গিরিশ্রেণী অনন্ত আকাশের সহিত মিলিত হবার জন্য স্পর্দ্ধা ক'রে মাথা তুলে উঠেছে। আর উহারই চরণতলে গিরিনন্দিনী পিতার মত আস্ফালনে ফুলে উঠ্‌ছে এবং গভীর গর্জ্জনে ছুটে চ'লেছে। কিন্তু সে কত নীচে ? এত নীচেয়, যে, ভাল ক'রে চেয়ে দেখ্‌লে স্মৃতিশক্তি লোপ হ'য়ে আসে।

পার্শ্বেই একটু দূরে জঙ্গলের মধ্যে একটী প্রপাতবারি আছাড় খেতে খেতে কিনারায় ছুটে আস্‌ছে এবং আর পথ নাই দেখে ক্রোধভরে নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ছে ও ভৈরব গর্জ্জনে উচ্চ হ'তে লাফিয়ে প'ড়ে

কাশ্মীর—জল প্রপাত (রামবাণ) —১২২

চূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। আর ঐ চূর্ণাংশগুলি নদী-নীরে কায়া মিলিত ক'রে, কোন্ অজানা পথে ছুটে চ'লেছে। অশান্ত উচ্ছৃঙ্খল মতি,—যেন মহত্তের চরণে আত্ম সমর্পণ ক'রে প্রেমের বন্যায় ভেসে চ'লেছে। কিন্তু ওর গর্জ্জনের সহিত শূন্য গিরি-গহ্বরের প্রতিধ্বনি মিলিত হ'য়ে কর্ণ প্রায় বধির হ'য়ে আস্‌ছে। প্রকৃতির এ হেন অসহ্য গাম্ভীর্য্যময় মূর্ত্তিখানি প্রাণে কি যেন এক অজানা আশঙ্কার সৃষ্টি ক'রে শরীর রোমাঞ্চিত ক'রে তুল্‌ছে। ভাল ক'রে চারিদিক চেয়ে দেখ্‌তে গিয়ে, ব্যথিত চক্ষু দু'টি মুদ্রিত হ'য়ে এলো।

এমন সময় হোটেলওয়ালার 'মায়ীজি'-সম্বোধন এ হেন দৃষ্টি-ব্যথা হ'তে আমাকে অব্যাহতি দিল।

সম্বোধন অনুসরণ ক'রে চেয়ে দেখ্‌লাম, হোটেলওয়ালা আমাকেই ডাক্‌চে বটে। ঘরের মধ্যে এসে তার আরজিগুলি শুনে নিলাম। তার মন্তব্য যে, তাকে যদি এক সেট্ আসবাব ছেড়ে দিই, তা'হলে সে এই রাত্রেই তিনটি টাকা লাভ ক'র্‌তে পারে, নহিলে আর আসবাব-পত্র না থাকায় বেচারা অবমানিত হবে। কারণ—মস্ত খেতাবওয়ালা এক রাজা আওরৎ সমেত পাশের ঘরে এসে হাজির হ'য়েছেন। আর খাটিয়াখানি ছেড়ে দিতে আমার বিশেষ আপত্তি নাও থাক্‌তে পারে, কারণ আমি বাবুর স্ত্রী হওয়ায়, দ্বিতীয় খাটিয়াখানি আমার রাত্রে আবশ্যকই বা কি?

বেচারার মন্তব্য শুনে মনে মনে হাস্য সংবরণ ক'র্‌তে পারলেম না। যাহাই হোক, মুখে গাম্ভীর্য্য এনে ব'ললেম, "বাপু, খাটিয়াখানি নিয়ে যাও, আর কিছু দিতে পারবো না।"

বেচারা করজোড়ে জানালে, যদি মেহেরবাণী ক'রে একটা টেবিল ছেড়ে দিই, তা'হলে টেবিলের পরিবর্ত্তে সে একটা টিপয় এনে দিয়ে সব গুছিয়ে দিয়ে যেতে পারে।

মনে মনে হেসে আর বিশেষ আপত্তি ক'রলেম না। বেচারা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পট পরিবর্ত্তনে মনোযোগী হ'লো। জলযোগান্তে, হোটেল হ'তে কালি চেয়ে নিয়ে উনি দু'এক খানি চিঠি লিখেছিলেন। সেই কালির দোয়াতটী টেবিলের উপরেই ছিল। হোটেলওয়ালা জিনিষ-পত্র নাড়াচাড়া ক'রতে ক'রতে, শত সাবধানের মধ্যেও কালির দোয়াতটী সাদা ধপধপে ফ্লানেল খানির উপর উপুড় ক'রে দিল।

অপ্রস্তুত বেচারা,—তাড়াতাড়ি সাবান দিয়ে ফ্লানেল খানি ধুয়ে দিলেও, বাম-স্ু চটির স্মৃতি স্বরূপ কালির দাগটি ফ্লানেল খানিতে মুদ্রিত হ'য়ে রইল।

ঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে দ্রব্যাদি গুছিয়ে রেখে দরোজাটি বন্ধ রাখবার উপদেশ দিয়ে এবং নিজে বন্ধ ক'রে দিয়ে, হোটেলওয়ালা চ'লে গেল। পরক্ষণে একটি বালককে সঙ্গে করে গরম রুটি, তরকারি, গরম দুধ ও কিছু ক্ষীরের মিষ্টান্ন নিয়ে উনি ফিরলেন। ঘরে ঢুকেই তো অবাক, একি হ'লো?—পট এমন পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল কি ক'রে?

খাবারগুলি হাত হ'তে নিয়ে, ওঁকে বস্‌তে ব'লে, বালককে বিদায় দিয়ে, দোরটি ভেজিয়ে দিলাম। পরে কোন্ ইন্দ্রজালে পট পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে, তা বুঝিয়ে দিলাম। শুনেই তো চটিতং, শান্ত মেজাজের লোকটি—বেশীক্ষণ তো চটে থাক্‌তে পারেন না। হোটেলওয়ালার উদ্দেশে দু'একটী অশ্রাব্য গালি দিয়ে, শেষে আমিই যে ছেড়ে দিয়েছি বুঝে আমার প্রতি দু'একটী মৃদু বাক্যবাণ ঝেড়ে শান্ত হ'য়ে গেলেন; এবং ব'ললেন—আস্‌বাবের দরুণ ঘরের ভাড়া হ'তে কতকাংশ কেটে নেবেন। কিন্তু পরদিন ভাড়া দিবার সময় কেটে তো নিলেন না, উপরন্তু কিছু বকসিসও দিয়েছিলেন।

খাদ্যগুলি গরম ও তাজা হ'লেও আহারযোগ্য নয়। কেবলমাত্র

দুধটুকু পান ক'রে দুজনেই শুয়ে প'ড়লেম। শীত এখানে খুবই কম। প্রকাণ্ড ভেন্টিলেটারের তলে, গায়ের সমস্ত শীতবস্ত্র খুলে ফেলে, মাত্র কম্বলখানি গায়ে দিয়ে শয়ন ক'রলাম। শ্রান্ত দেহ, শান্তি প্রয়াসে নিদ্রার চেষ্টা ক'রতে—দূরাগত প্রপাতের ব্যাঘ্র গর্জ্জনবৎ দারুণ চীৎকারে কর্ণ বধির প্রায়, ব্যথিত ইন্দ্রিয় কিছুতেই নিদ্রালাভ ক'রতে পারলে না। তার উপর ঝড় এবং বৃষ্টি আরম্ভ হ'লো। ঝড়-বৃষ্টি, নদী ও প্রপাতের সম্মিলিত শব্দে কর্ণ বধির হ'যে আস্‌তে লাগলো। এইভাবে বিনিদ্র রজনীর তিন প্রহর কাটিয়ে দিয়ে, তিনটা বাজ্‌লেই প্রাতঃ কৃত্যাদির জন্য উঠে প'ড়লাম। কারণ চারটায় বাস ছাড়বার কথা।

ওঃ কি—ভয়ানক দুর্য্যোগময়ী রজনী! বারাণ্ডায় পা দিতে শরীর শিহরিত হ'য়ে উঠ্‌লো। অন্ধকারের ভীষণ শূন্যতা—তার বিরাট মুখ ব্যাদন ক'রে ভৈরব গর্জ্জনে বিশ্ব সংসার গ্রাস করবার জন্য উদ্যত হ'য়েছে। ঝড়ের বাতাস প্রকৃতির বুক কাঁপিয়ে দিয়ে হাঃ হাঃ শব্দে দীর্ঘ নিশ্বাসের মত ব'য়ে যাচ্ছে। জগৎ-জননী বুঝি, তাঁর অধম সন্তানগণের জগৎব্যাপী অমঙ্গল দর্শনে, বিপুল অশ্রুরাশি ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টির আকারে বর্ষণ ক'র-ছেন। আমার হাতের ক্ষীণ বাতির আলোটি—তার ক্ষীণ রশ্মিরেখার দ্বারায় অন্ধকারের বুক চিরে যতটুকু অগ্রসর হ'লো, তাহাতে প্রকৃতির দারুণ শূন্যতার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়ে ভীষণ দাঁতখামুটির মত অন্তর চমকিত ক'রে অট্টহাস্য ক'রে উঠ্‌লো। সংকীর্ণ বারাণ্ডাটি মহাশূন্যে দুলছে। অন্ধ-কার তার দারুণ কোলে আমায় আকর্ষণ ক'রছে। কে যেন পিছন হ'তে ধাক্কা দিয়ে অগ্রসর ক'রে দিচ্ছে। মাথা এবং দেহ সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে প'ড়ছে। উলঙ্গ শ্মশানচারী ব্যোমকেশের উলঙ্গিনী মহা প্রকৃতির সহ তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হ'য়েছে।

এই দুর্য্যোগের মধ্যে দু'জনে দ্রব্যাদি সমস্ত গোছ-গাছ ক'রে, যাত্রার

কোনও লক্ষণ না দেখে পুনরায় শুয়ে প'ড়লাম। এখনও ড্রাইভারের দেখা নাই। ক্রমে পূর্ব্বদিক উদ্ভাসিত ক'রে উষা দেবী আগমন ক'রলেন। ঝড়-বৃষ্টিও কিছুক্ষণ পূর্ব্বে থেমে গেছে। প্রকৃতি এখন স্থিরা—গম্ভীরা। উনি তখন উঠে ড্রাইভারের সন্ধানে চ'ললেন। অনেক ডাকাডাকির পর তাহার নিদ্রাভঙ্গ করালেন। ড্রাইভার এসে দ্রব্যাদি নিয়ে গেলো। উনি হোটেলের বিল মিটিয়ে দিলেন। রাম-মু ডাকবাঙ্গলাকে অভিবাদন ক'রে আমরা যাত্রা ক'রলাম। নেমে এসে দেখি—হরি হরি!—তাবৎ মাল 'বাসের' ছাদে ভিজে ঢপ্‌ঢপে হ'য়েছে। একখানি ত্রিপলও চাপা দেয় নাই। কাশ্মীরের এই মোটর-চালকগুলি ভয়ানক অর্ব্বাচীন। সর্ব্ব প্রকারেই এদের বিশ্বাস করা দায়,—বিশেষতঃ বিদেশীদের পক্ষে। যাক্, উষা যখন রক্তিম-রাগে রঞ্জিত হ'য়ে পূর্ব্বাকাশে পর্ব্বতের পশ্চাতে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে—উষার আগমনে তামসী নিশীথিনী কর্ম্মাবসানে ধীরে ধীরে বিশ্রাম-বাসনায় অপসারিত হ'চ্ছে—তখন বাস ছেড়ে দিলে। ইহাদেরই বাক্‌চাতুর্য্যে আমাদের দু'দিন অনাহারে থাক্‌তে হ'লো। অন্তকার কষ্ট বর্ণনাতীত।

শৈল-পথে

৭ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার ভোরে 'দুর্গা দুর্গা' ব'লে জম্মুর উদ্দেশে যাত্রা ক'রলাম। রামস্থ শৈল-শৃঙ্গ সিলেট পাথরের জনক। পথের পাশে ভগ্ন সিলেট পাথর রাশি রাশি পতিত হ'য়ে র'য়েছে। বড় বড় ঝরণা শৈল সিক্ত ক'রে ঝর্ ঝর্ ক'রে নেমে আস্‌ছে। দুর্ভেদ্য জঙ্গল পৃষ্ঠে ধারণ ক'রে, বড় বড় শৈল-চাপ, পথের উপর ছাদের আকারে ঝুঁকে র'য়েছে। শৈল-চাপের ফাটলের অন্তরাল দিয়ে ঝরণার জল, বিশৃঙ্খলে হুড়্ হুড়্ ক'রে রাজ-পথে পতিত হ'চ্ছে এবং পতিত জলরাশি পথের পাশ দিয়ে ঘোলা জলের ড্রেণের মত হুহু শব্দে চ'লে যাচ্ছে। স্থানে স্থানে পাহাড়ের গায়ে আও-তার মধ্যে নিরন্তর জল পতিত হ'য়ে পুরু শেওলা জমে রয়েছে। কোথাও প্রকাণ্ড অখণ্ড শৈল নেড়া মাথা বাড়িয়ে দিয়ে গাড়ী বারাণ্ডার মত, রাজ-পথ আচ্ছাদিত ক'রে রয়েছে। ও যেন আয়ত্তের মধ্যে শিকার পেলে, এখনই গায়ের উপর লাফিয়ে প'ড়বে। কোথাও রাশি রাশি সিলেট ধস্ নিয়েছে। পথের পাশে সিলেট-চূর্ণ কাঁড়ি হ'য়ে রয়েছে। উপরে যেন গোছা গোছা সিলেটের প্লেট সাজিয়ে রেখেছে। কোথাও পাহাড়ি বালক-বালিকারা বাসের শব্দে পর্ব্বতের উপর এসে উঁকি দিচ্ছে। উহা-দের হাস্যোৎফুল্ল মুখশ্রী এবং কৌতুকপূর্ণ চাহনিতে নিটোল স্বাস্থ্য ফুটে উঠ্‌ছে। কোথাও জঙ্গলের তলা দিয়ে, কোথাও পাথরের তলা দিয়ে, কোথাও উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল ফেণাময়ী স্রোতস্বতীর সেতুর উপর দিয়ে, কোথাও উচ্চ গৈরিক পর্ব্বতের চরণ-তলে সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে বাস ছুটেছে। ছোট ছোট বহুতর সেতু প্রস্তুত ক'রে পর্ব্বতে পর্ব্বতে সংযুক্ত করা হ'য়েছে। নিয়ত এইরূপ সেতু অতিক্রম ক'রে পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন ক'রতে ক'রতে চ'ললেম।

হু'টী বড় বড় প্রবল নদী পার হ'যে, প্রাতঃকালে যখন কিশোরের নির্ম্মল শুভ্র হাসির মত বালার্ক-কিরণ সমস্ত পর্ব্বতের উপর ছড়িয়ে প'ড়ে পর্ব্বতকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে, তখন আমরা রামবাণ শৈলের চটিতে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। শীতের অন্তে মহারাজার সৈন্যগণ জম্মু হ'তে ডেরা উঠিয়ে ক্রমে ক্রমে শ্রীনগরে ফিরছে। অন্ততঃ একটী রেজিমেণ্ট বেরিয়েছে। এই চটিতে ইহাদের আস্তানা প'ড়েছে। সারি সারি দোকানগুলি সব গরম হ'য়ে উঠেছে। বড় বড় কড়ায় নানারূপ খাদ্য প্রস্তুত হ'চ্ছে। পাঁচ ছ'খানা দোকানে গরম গরম লুচি, তরকারী, হালুয়া, ক্ষীরের তাল, দুধ প্রভৃতি প্রস্তুত হ'চ্ছে। আর সৈন্যগণ অপরূপ ভঙ্গিতে ঐ সকল খাদ্য পানাহারে ব্যাপৃত হ'য়েছে। কেহ বা পর্ব্বতের কোলে শুয়ে, কেহ কেহ বা পর্ব্বত-গাত্রে পৃষ্ঠ রেখে হেলায়িত ভাবে উপবিষ্ট হ'য়ে নিজ নিজ সুবিধামত নিবিষ্টমনে আহারে ব্যাপৃত হ'য়েছে। সকলেরই অস্ত্র-শস্ত্র, ব্যাগ প্রভৃতি অপরূপ সজ্জায় গায়ে আঁটা সাঁটা হ'য়ে ঝুলছে। প্রত্যেকের মাথায় সুন্দর পীত বর্ণের পাগড়ী।

একটী গাছের তলায় আমাদের বাস গিয়ে দাঁড়ালো। আরোহীরা সকলেই নেমে গেল এবং এই খানে সকলেই প্রাতরাশ সমাধা ক'রে নিল। কেবল মাত্র আমার স্বামী মহাশয় কিছুতেই রাজি হ'লেন না,— বল্লেন 'এই প্রাতঃকালে আহার সম্ভব নয়, এখনও আহারের সময় হয় নাই।' এই একগুঁয়েমির জন্য সমস্ত দিন অনাহারে থাকতে হ'লো। 'বাস'-চালকের নির্দ্দেশমত বেলা বারটার মধ্যে জম্মু পৌঁছাবার কথা। ওঁর ইচ্ছা যে, জম্মু পৌঁছে একটী ভাল দোকান বা হোটেলে উঠে আহারাদি সম্পন্ন ক'রবেন। কিন্তু অর্ব্বাচীনদের গদাইলস্করি চালে এবং ইচ্ছামত গাড়ী চালনার ব্যবস্থায় বেলা প্রায় তিনটার সময় জম্মু পৌঁছাতে হ'য়েছিল। যাহা হোক, সকলে এখানে আহারাদি সম্পন্ন
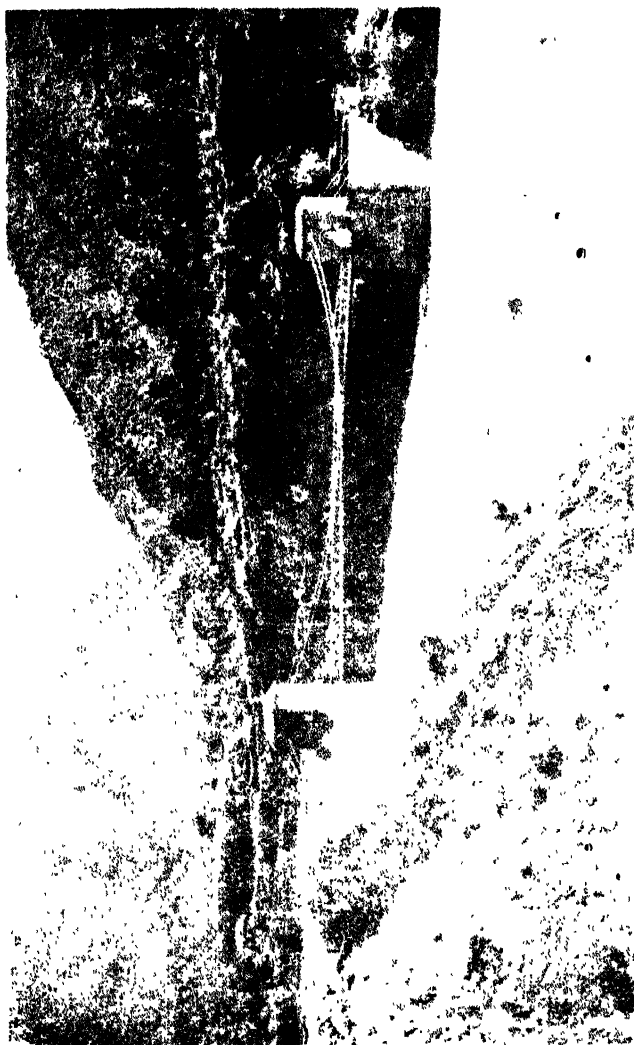
করে নিল এবং আমাদের জানিয়ে দিল যে, এর পর আর ভাল খাদ্য মিল্‌বে না। তথাপি সময় হয় নি ব'লে—উনি নিশ্চেষ্ট রইলেন। অতএব চালক গাড়ী ছেড়ে দিল। রামবাণ পর্ব্বতের দারুণ চড়াইয়ে গাড়ী উঠ্‌তে লাগ্‌লো। দক্ষিণে অভ্রভেদী পীরপঞ্জাল পর্ব্বতশ্রেণী, বামে গভীরতম খাদ। দূরে উপত্যকায় পর্ব্বত-নিঃসৃতা চন্দ্রভাগা অথবা চেনাব নদী' নিশানা রেখে, পার্ব্বত্য পথে গাড়ী যেন পাখা মেলে আকাশের দিকে উড়ে চ'ল্‌লো। সমস্ত পথেই সৈন্যদলের সারি সারি রসদের গাড়ী। সৈন্যদলের ছোড়ভঙ্গ গতি দেখ্‌তে দেখ্‌তে চ'ল্‌লাম। কোথাও গাছতলায় দু'চার জন সৈনিক দলবদ্ধ হ'য়ে শুয়ে র'য়েছে! কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল পাহাড়ের গায়ে ব'সে আছে,—আবার কোথাও বা কুজ-কাওয়াজ ক'রে চ'লে আস্‌ছে। এই সব দেশী সৈন্যের নির্ভীক আরামের অবসর দেখে, প্রাণে বড়ই আনন্দ হ'চ্ছিল, এবং একটা চাপা নিশ্বাসও বুকের মধ্যে ঠেলে উঠ্‌ছিল। হায়, আমাদের সমুদ্রগর্ভে জলমগ্ন বাঙ্গ্‌লাদেশ! এ ভূ-স্বর্গ হ'তে তুমি কত নীচে?

যদিও কাশ্মীর একটী স্বাধীন হিন্দুরাজ্য, আমাদের বাঙ্গলা হ'তে উচ্চতর সোপানে অবস্থান ক'রছে, তথাপি দুঃখের বিষয়, ইহারাও আপনাদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেল্‌ছে। এরা ডুবেছে—তলিয়ে যেতে বেশী দেরী হবে না। জাতীয় পাগড়ী পরিত্যাগ করে নাই মাত্র। নির্জ্জীব সর্পের মত,—বর্ণ-বৈচিত্র্যে সুন্দর।

পীরপঞ্জাল পর্ব্বতমালা ব্যথাদায়ক গম্ভীর। ঘোর কাননময় বহু স্রোতস্বতী-প্রবাহিত দুরধিগম্য গিরিমালাময় প্রদেশে, একটী ভীষণকায় গগনস্পর্শী পর্ব্বত-চূড়ায় একটী পুরাতন প্রকাণ্ড কেল্লা দেখা গেল। শুনলেম, পূর্ব্বে কোনও মুসলমান বাদসা এই কেল্লা নির্ম্মাণ ক'রেছিলেন। অধুনা মহারাজার সৈন্যবাহিনী ঐ কেল্লায় বাস করে। চন্দ্রভাগা নদী,

এই শৈলস্থলে সর্পিণীর ন্যায় বেষ্টন ক'রে, শৈলশতের মধ্য দিয়ে কোথাও দৃশ্য, কোথাও অদৃশ্য হ'য়ে, কোথাও ক্ষীণা, কোথাও বা প্রবলা হ'য়ে, বিচিত্র গতিভঙ্গে খেলা ক'র্‌তে ক'র্‌তে চ'লে গেছে। আর ইহারই কলেবর বৃদ্ধি ক'রে শত শত প্রস্রবণ গিরি-চূড়া হ'তে প্রবল বেগে হুড়্ হুড়্ ক'রে নেমে আস্‌ছে। এই সকল স্থানে বহুদূর পর্য্যন্ত গিরি-অঙ্গ ভঙ্গ হ'য়ে গেছে। ইহার উপর শত শত সেতু প্রস্তুত ক'রে শৈলে শৈলে সংযুক্ত করা হ'য়েছে। গাঢ় শৈল-তরঙ্গের মধ্যে ডুব দিয়ে প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হ'য়ে বাটোট্ পর্ব্বতের মনোহর চিত্রে মন মোহিত হ'য়ে গেলো। নিষ্ঠুর পাষাণ রাজ্যের মধ্যে এ যেন মাতৃস্নেহের প্রস্রবণ দেখা দিল। দারুণ গাম্ভীর্য্যে চক্ষু ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছিল, বাটোটের হসিত মূর্ত্তি সেই ভার নামিয়ে নিল। যেন কোন শিল্পানুরাগী বিত্তশালী ভূস্বামীর, কোন শিল্পকুশলী কারিকরের হাতে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপবন-বাটিকা প্রস্তুত হ'য়েছে। ফল ফুলের গাছ বা ঝোপগুলি—আকৃতি এবং বর্ণ-সৌন্দর্য্যে সকল রকমে, উৎস, বেদীকুঞ্জ বা বিশ্রামঘরের আকৃতি প্রাপ্ত হ'য়ে সুবিন্যস্ত হ'য়ে র'য়েছে। বাটোট্ একটী পার্ব্বত্য নগরী। এই প্রাকৃতিক উদ্যানের মধ্যে জঙ্গলে-ঢাকা ছোট ছোট মাটির বাড়ীগুলি—বাড়ীর লাগোয়া রঙ্গিন ফুলের চাষ এবং জীবিকার জন্য শ্যামল ক্ষেত্রগুলি, এই প্রাকৃতিক উদ্যানের শোভা শত গুণ বাড়িয়ে তুলেছে। পুরা একটী ঘণ্টা 'বাস' এই বাটোট্‌কে চোখের অন্তরাল ক'রতে পারিনি। ঘুরে ঘুরে বহু ঊর্দ্ধে, পর্ব্বতের মাথার উপর উঠে, অবশেষে দু'টী শৃঙ্গে মিশে গেছে। বাসের শব্দে জিজ্ঞাসুদৃষ্টি ল'য়ে সুরবালার মত কতকগুলি পাহাড়ী যুবতী ঘোর অরণ্যে গ্রামের মধ্যে ঘরের বাহিরে দলবদ্ধ হ'য়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। উহাদের মুখগুলি এই

স্থানের ফোটা ফুলের মত সুন্দর। ময়লা কাপড়ের মধ্যে অধিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ ক'রছে।

জম্বুর পথ—পীরপঞ্জাল পর্ব্বতমালা দুরধিগম্য পর্ব্বত-তরঙ্গ—অথবা ঘোর ভীষণ পর্ব্বতারণ্য। অসংখ্য পর্ব্বতমালার প্রত্যেকটী প্রদক্ষিণ বা অর্দ্ধপ্রদক্ষিণ ক'রে রাজপথ ঘুরে ঘুরে উঠেছে এবং অপর পার্শ্ব দিয়ে ঐ ভাবে অবতরণ ক'রেছে। ইহার এক পার্শ্বে বিকট দর্শন রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ পাষাণ প্রাচীর অভ্র ভেদ ক'রে উঠে গেছে, অপর পার্শ্বে অতল-স্পর্শী খাদ,—দৃষ্টি মাত্রে মাথা ঘুরিয়া যায়। এরূপ ভয়ঙ্কর পথে অত্যন্ত অসুস্থতা অনুভব ক'রতে হয়। তার উপর প্রখর সূর্য্যতাপে শরীর ক্রমশই অবসন্ন হ'য়ে আসছে। যতই রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হওয়া যাচ্ছে, ততই উত্তাপ অত্যধিক ব'লে বোধ হ'চ্ছে। আর 'বাসে'র ইঞ্জিনের উত্তাপে দেহ-মন যেন দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। তৃষ্ণায় সমস্ত শরীর পর্য্যন্ত শুষ্ক হ'য়ে যাচ্ছে। কাশ্মীরের পথে এত কষ্ট আর কোথাও অনুভব করি নাই। শীতবস্ত্রগুলি অনেকক্ষণ খুলে ফেলতে হ'য়েছে। গাত্র-বস্ত্রও অসহ্য বোধ হ'চ্ছে। আর 'বসে' ব'সে থাকা এক প্রকার অসম্ভব হ'য়ে উঠ্ছে। মনে হ'চ্ছে, এখনই বাস হ'তে ঠিক্‌রাইয়া ঐ শৈলতলে অনন্তের পথে যাত্রা ক'রতে হবে। তুষার রাজ্য বহুকাল পার হ'য়েছি। রামসু-শৈল হ'তে আর তুষার দেখি নাই। ঘোর পর্ব্বতের অন্তরালে প্রবেশ ক'রে, বহির্জগতের সহিত এ যেন লুকোচুরি খেলা আরম্ভ ক'রেছি। বিপক্ষ-পক্ষ সহস্র চেষ্টা ক'রলেও আর 'চোর' দিতে হবে না,—কার সাধ্য ইহার মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করে! কিন্তু এ হেন লুকোচুরি-খেলায় বড়ই শ্রান্ত হ'য়েছি, দম বুঝি বা বন্ধ হ'য়ে আসে। কেবল মাত্র, ঐ দূরে—শৈলপাদ-দেশে অবস্থিত উপত্যকার বিচিত্র সৌন্দর্য্য ও মনোহর শৈলমালার অপরূপ অফুরন্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ, আর

দূরে বহুদূরে দৃষ্ট জমাট বাঁধা হিমসমাচ্ছন্ন শৈল-শিখরের নয়ন-মুগ্ধকর শির শোভা মন হরণ ক'রে রাখে। ক্ষণকালের নিমিত্তও ক্লান্তি বিস্মৃত হ'তে হয়। আর পর্ব্বতে প্রস্ফুটিতা বন-কুসুমের পুষ্পাসারে সুরভিত সুশীতল বাতাসে—চোখে, মুখে ও মাথায় ওষধি লেপন ক'রে দিয়ে যাচ্ছে। তাই এই দুস্তর অনন্ত পর্ব্বতমালা জীবন্তে পার হ'য়ে চল্লেম। ইহার উপর চালকের খেয়ালমত বাসের চালনা—কখনও আকাশ-পথে পাখা মেলে উড়ছে, কখনও স্থির হ'য়ে—বুঝি এই লৌহযানকে ঘাস-জল দিচ্ছে। এবংবিধ খেয়ালের যথেচ্ছাচারিতা—অত্যন্ত কষ্টদায়ক বোধ হ'চ্ছিল।

বেলা বারটার সময় টৌলঘরের চটিতে এসে চালক জানিয়ে দিল যে, এ স্থানে আহারাদি হবে। আহারের জন্য অন্য সকলে বাস হ'তে নেমে গেল। উঁহার তো চক্ষুস্থির, উঁহার বাসনা যে, একটী ভাল স্থানে পৌঁছে স্নানাদি ক'রে আহারাদি ক'রবেন, ইহার যতই বিলম্ব হ'চ্ছে, ততই উঁহার মেজাজ খারাপ হ'য়ে উঠ্‌ছে। এখানে গাড়ী ছাড়তে দেড় ঘণ্টার উপর বিলম্ব হবে। অনেক সাধ্য-সাধনার পর উনি নেমে গিয়ে অদূরস্থিত একটী ঝরণার জলে মাথা, মুখ-হাত ধুয়ে এলেন। আমিও মুখে-মাথায় ঠাণ্ডা জল দিয়ে কতকটা সুস্থ হ'লেম। গাড়ীর ভিতর ব'সে ব'সেই, সঙ্গে যে সকল ফল ছিল এবং আর কিছু মিষ্টান্ন এনে উনি জলযোগ ক'রলেন এবং আমিও কিছু জলযোগ ক'রে নিলাম। উদর পূরে সুশীতল জল পান ক'রে শরীর কিছু স্নিগ্ধ হ'লো। এ সময়ে দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্র আমাদের অতিশয় পীড়িত ক'রে তুলেছিল। তার উপর আমি ছিলাম প্রথম সিটে—ইঞ্জিনের পাশে, ইঞ্জিনের উত্তাপে আমাকে যেন রুটি ভাজা ক'রে তুলছিল। সকলের আহারাদির পর 'বাস' ছেড়ে দিল।

কিছুক্ষণ পরে আমরা আর একটী টোল ঘরে এসে উপস্থিত হ'লাম। এখানেও বিপদ মন্দ নয়। এখানে অনেকগুলি গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। আমদানি রপ্তানী ও মালামাল ওজন হ'চ্ছে। শ্রীনগর হ'তে যতগুলি বাস ছাড়ে, সকলগুলিই মাল এবং মানুষ উভয়ই বহন করে। প্রায় প্রত্যেক চটিতে বা ডাকবাঙ্গলায় মাল দিচ্ছে ও নিচ্ছে এবং পথের উপর যাত্রী তুলছে ও নামিয়ে দিচ্ছে। ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত ও রাত্রিজাগরণে ক্লিষ্ট স্নানার্থী পথিকের পক্ষে বাসের এ হেন যথেচ্ছাচার মন্থর গতি, যে কি কষ্টদায়ক, সে কেবল ভুক্তভোগীই জানেন; কষ্ট—বর্ণনাতীত। নয়নরঞ্জন প্রকৃতিই কেবল ক্ষণকালের জন্য শ্রান্তি হরণ ক'রে লয়। এই টোল ঘরের কার্য্য মালামাল তল্লাস করা ও ওজন করা এবং ওজন অনুসারে মাশুল আদায় করা এবং সমস্ত গাড়ী-চালকের, চালনার গতি নির্দ্দেশ করা। এ হেন দারুণ পার্ব্বত্য পথে ঘণ্টায়......মাইলের বেশী গাড়ী চালালে চালক দণ্ডিত হয়। কিন্তু ইহারা ইচ্ছামত গাড়ী চালনা করে এবং নির্দ্দেশমত সময়ে টোলঘরে হাজিরা দেয়। এক ব্যক্তি অন্য গাড়ীতে বিলাতী লবণ আমদানি ক'রেছিল, দেখ্‌লাম টোল ঘরের বারাণ্ডায় ঐ লবণ ছড়িয়ে রাশিকৃত করা হ'য়েছে। এতদ্দেশে বিলাতী লবণ এবং গো-হত্যা নিষিদ্ধ। টোল ঘরে সকল গাড়ীর মাল-পত্র তল্লাস ক'রে ছাড়পত্র দিলে তবে সেখান হ'তে গাড়ী বাহির হয়। অনেকটা সময় এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হ'লো। পরে ছাড়-পত্র নিয়ে গাড়ী নির্ব্বিঘ্নে ছুটে চ'ল্‌লো।

কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে ঐ দূরে নয়ন-পথে অস্পষ্টতর হ'য়ে ও কি দেখা যায়?—ও-কি কোন রাজপ্রাসাদ? এত বড়—এত উচ্চ, এ হেন ভীষণ অবয়ববিশিষ্ট রাজপ্রাসাদ কি মানবের? এই রাজপ্রাসাদের রাজ-অন্তঃপুরীর ঘুমন্ত পুরীতে, কি পাষাণ-গঠিত দৈত্যকুমারী নিদ্রিত

আছেন? ইহার প্রবেশ-পথ কি আকাশ-মার্গে? আকাশ-পথচারী কোন্ দেবতার সোণার কাঠির পরশ পেলে, এ হেন দৈত্যকুমারী জাগরিত হবে? কোন্ যাদুকরী—কোন্ মোহিনী-মায়ায়, এ হেন প্রকাণ্ড রাজপুরী জীবন-হীন ক'রে রেখেছে? এ কি কোন সঞ্চিত কলসের বারিবিন্দুর পরশ পেলে পুনরায় জীবন পেয়ে জেগে উঠ্‌বে? এ কি, কোন অজানা পক্ষিরাজ-বাহিত অজানা রাজপুত্রের অপেক্ষা ক'রে দৈত্যকুমারী নিদ্রিত আছেন? কে জানে!

ক্রমে পরিস্ফুট হ'য়ে দৃষ্টিপথে ভেসে উঠ্‌ল। দেখলাম, এক অতি উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, দৃঢ় প্রাকারবেষ্টিত দুর্গের আকারে দাঁড়িয়ে র'য়েছে। সুন্দর কারুকার্য্য-শোভিত উচ্চ দেবালয়, মন্দিরাদির চূড়া-অলঙ্কৃত রাজ-প্রাসাদাবলী শির সমুন্নত ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। এই দৃশ্য সততই দর্শকের দৃষ্টি আকৃষ্ট ক'রছে। এই অপ্রাকৃত দুর্গ-প্রাকারের চরণ ধৌত ক'রে অপ্রাকৃত কারুকার্য্যময় প্রাকারের কারুকার্য্যময় বড় বড় স্তম্ভাবলীর চরণ চুম্বিত ক'রে, ভীষণ গড়ের মত স্রোতস্বিনী চন্দ্রভাগা তিন দিক দিয়ে বহিয়া চ'লেছে। আর অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণী পশ্চাৎভাগ রক্ষা ক'রছে।

আমরা এখন প্রকাণ্ড উপত্যকার উপর দিয়ে ছুট্‌ছি—অথবা আমাদের যান বা রথ ছুট্‌ছে। কর্কশ উপত্যকা—সৌন্দর্য্যের চিহ্নমাত্র নাই। মরীচিমালী প্রচণ্ডবেগে অগ্নিবর্ষণ ক'রছেন। পার্ব্বত্য ভূমি কোথাও সমতল নহে। এটি উদমপুর বা উদমপুর জেলা। দূরে শৈলোপরি চিতোর গড়ের মত, বহুদূরব্যাপী সহর দেখা যাচ্ছে। বাড়ীগুলি ও রাজবাটী ইটের প্রস্তুত। উপত্যকা পিছনে ফেলে আবার ঊর্দ্ধ পথে 'বাস' ছুটে চ'লেছে। দূরে—দক্ষিণে আবার নয়ন-স্নিগ্ধকর মনোহর পর্ব্বত মালা ধীরে দৃষ্টিপথে ভেসে উঠ্‌ছে। বালুকাময় বিশাল পর্ব্বতের উপর দিয়ে উত্তপ্ত সমীরণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে—অদূরস্থ তাওয়াই নদীর ধু ধু

প্রসারিত প্রচণ্ড বালুরাশিকে উপহাস ক'রতে ক'রতে আমাদের 'বাস' পাগলের মত ছুটে চ'লেছে। বালুর পাহাড়ের বায়ু—তপ্ত বালু-মিশ্রিত—দগ্ধ ক'রে তুলছে। দুই পার্শ্বে বালুরাশির ভীষণ উচ্চ পর্ব্বত। এ পথে একটী তৃণ পর্য্যন্ত নাই। আকাশে বাতাশে অগ্নি বর্ষণ ক'রছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিপ্রহরের রৌদ্র প্রকৃতির বুকে ঝরছে। কখন কখন সাদা ধপ্‌ধপে চূণের পাহাড়ের মধ্য দিয়ে, কখনও সাদা—কখনও লাল বালুর পাহাড়ের মধ্য দিয়ে, কখনও বা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ শিলাতলের উপর দিয়ে—চড়াই ও উৎরাইয়ের পথে বাস ছুটছে।

মস্ত একটা পার্ব্বত্য নালা পার হ'য়ে চড়াইয়ের পথে বাস ছুটলো। উত্তপ্ত বায়ু সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়ে দিচ্ছে, পিপাসায় তালু শুষ্ক হ'য়ে যাচ্ছে। নিষ্ঠুর গৈরিক পর্ব্বত মুখ ব্যাদন ক'রে বিভীষিকা দেখাচ্ছে। ক্রমেই মস্তিষ্ক বিকল হ'য়ে আসছে। চৈতন্য অতি কষ্টে ধরা দিচ্ছে। অন্তকার কষ্ট বর্ণনাতীত..................

এবার দূরে ঐ জম্বু সহরের নমুনা দেখে প্রাণে আশার সঞ্চার হ'চ্ছে। রঘুনাথজী ঠাকুর-বাড়ীর উচ্চ উচ্চ মন্দিরের চূড়া সকল বহুদূর হ'তে দেখা যাচ্ছে। রাজপ্রাসাদের গম্বুজের উপর পতাকা উড়ছে। শিব-মন্দিরের চূড়া, গীর্জ্জার চূড়া ও মসজিদের চূড়া সকল—বহুদূর হ'তে দৃষ্ট হ'চ্ছে। ক্রমেই সহর স্পষ্টতর হ'য়ে উঠছে। আমরা রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হ'লাম। অদূরে তাওয়াই নদীর ভীতিপ্রদ বালুকারাশির ও-পারে জম্বু ষ্টেশন দেখা যাচ্ছে। তাওয়াই নদীর অপূর্ব্ব প্রকাণ্ড সেতু নদীর বক্ষে ঝুলছে। সহরের পাশ দিয়ে নদীর প্রকাণ্ড সেতু পার হ'য়ে ষ্টেশনের নিকট এসে 'বাসে'র গতি রুদ্ধ হ'লো।

জম্বু ও কাশ্মীরের চুম্বক পরিচয়

১

'গুলমার্গ' শৈলে দেবী, বিকসিতা আধ ছবি—
বালিকা নির্ম্মলা মাত্র কিশোরে প্রবেশ,—
সর্ব্ব অঙ্গ পূর্ণ নয়, ঢল ঢল কান্তিময়—
আধ লাজে ঢাকা, আধ বিকাশে সুবেশ।

২

'কাশ্মীর' শৈলের মাঝে পূর্ণাঙ্গী নর্ত্তকী সাজে—
শোভনা প্রকৃতি নব নৃত্যপরায়ণা,—
ছড়ায়ে ললিত কলা, উজলি মাধুরী-লীলা
রমশোভা নীলবিভা বিভাসে ললনা!

৩

'জম্বু'-গিরিশ্রেণী-মাঝে প্রৌঢ়া নারী গৃহসাজে
সাজাইয়া গিরিমালা অটুটা গম্ভীরা,—
বিরাজ করেন সতী সাথে ব্যোমকেশ পতি
নিথর পাষাণ-তলে, নীরব সুস্থিরা।

৪

'পহেলগাম' গিরি 'পরি তপস্বিনী বৃদ্ধা নারী
ধ্যানমগ্না সমাধিস্থ পরমেশে লীন,—
জ্ঞান-অগ্নি প্রজ্বলিত, যোগমার্গে উপনীত—
পরিত্যাগি কর্ম্মপথ অলঙ্কার-হীন।

৫

'চন্দনবাড়ী' গিরিচুড়ে, যোগে লভি চন্দ্রচুড়ে—
মূর্ত্তিমতী শিব-সতী করেন বিরাজ,—
শান্তি-সুধা-ধারা ধায়— আনন্দ ভাসিয়া যায়
সৃষ্টি-স্থিতি শান্তি-পুণ্য—পূর্ণ সর্ব্বকাজ!

৬

সিদ্ধি-অন্তে জন্ম পুনঃ কর্ম্মফল নিদারুণ
জ্বালা মালা ঘোরাবর্ত্ত 'জম্বু' রাজধানী,—
'চিত্ত' হারা ক্ষিপ্তপ্রায়, পাগলিনী শান্তি চায়,
নিম্নস্তরে শান্তি নাই—বুঝালে জননী।

জম্বু

রঘুনাথজীর মন্দির

সুদীর্ঘ পথযাত্রাব অবসানে, নিশ্চিন্ত মনে 'বাস' হ'তে নেমে প'ড়লেম। একটী গাছ-তলায় উপবেশন ক'রে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা গেল। একটু শীতল জলের অন্বেষণ ক'রে কোথাও মিল্‌লো না। কলেব জল উত্তপ্ত। বায়ু গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। বেলা প্রায় আড়াইটা, সূর্য্য প্রখর অগ্নি বর্ষণ ক'রছে। পথের দিকে চাওয়া যায় না। শান্তি-লাভে,—শ্রান্তদেহ পুনরায় আশ্রযের উদ্দেশে, এ হেন জ্বলন্ত পথে যাত্রা কবার—চিন্তাতেও শবীব শিহরিয়া উঠ্‌ছিল। ইচ্ছা হ'চ্ছিল যে, ষ্টেশনে যখন উপস্থিত হওয়া গেছে. তখন আর কষ্ট-ভোগেব প্রয়োজন নাই, টিকিট কেটে বাড়ী ফিবে যাওয়া যাক্।

কিন্তু এ আগ্রহ দমন ক'রে রঘুনাথজীব চরণ দর্শনই পরামর্শে ঠিক হ'লো। তখন কিছু ফল ও মিষ্টান্ন ল'য়ে একখানি টঙ্গা ডেকে মন্দিবেব উদ্দেশে যাত্রা ক'রলেম। প্রকৃতি যেন তপ্ত কটাহ, আর টঙ্গাখানি তাহে ভর্জ্জিত হ'য়ে র'য়েছে। এ হেন সুখযানে প্রখর সূর্য্যাগ্নিব মধ্যে সুখসেবন ক'রতে ক'রতে এক মাইল দূবে রঘুনাথজীর মন্দিরে এসে উপস্থিত হ'লেম।

রঘুনাথজীর মন্দির একটী প্রকাণ্ড পান্থশালা বিশেষ। প্রকাণ্ড মন্দিরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে অসংখ্য যাত্রী রাত্রি যাপন করে। এতদ্‌ব্যতীত প্রাঙ্গণের প্রান্তে অনেকগুলি ঘব আছে। ঐ ঘরগুলি বিদেশী পান্থগণেব জন্য নির্দ্দিষ্ট। তিন দিন যাবৎ এই পান্থশালায় আশ্রয় পাওয়া যায়।

প্রকাণ্ড ফটকের দুই পার্শ্বে নহবৎখানার মত দু'টী দ্বিতল গৃহ। বিশিষ্ট ভদ্রপরিবার হ'লে এই স্থানে আশ্রয় পাওয়া যায়। রাজ-সরকারের পরম আতিথ্যে আমরা এই দ্বিতলের একটী ঘরে আশ্রয় পেলাম। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের নানা দিকে অনেকগুলি কল। ভদ্রমেয়েদের স্নানের জন্য নির্দ্দিষ্ট নিভৃতে দু'একটী কল আছে। প্রাতঃকৃত্যাদি মন্দিরের বাহিরে পাহাড়তলীতে সারিতে হয়। ঐ দিকে স্ত্রীলোকদিগের জন্য পাইখানা আছে। রাজ-সরকার হ'তে যাত্রীদের প্রার্থনামত ডাল, আটা প্রভৃতি বিতরিত হয়। মন্দিরের বাহিরেই ব্রাহ্মণদের কয়েকখানি হোটেল আছে, ঐ সব হোটেলে প্রাতঃকাল হ'তে রাত্রি পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই গরম গরম ডালরুটি, ভাত ও তরকারি পাওয়া যায়। দু'চার পয়সার বা তদধিক ইচ্ছামত লওয়া যায়। কিন্তু এই সব হোটেলে কোনও প্রকার আমিষ দ্রব্য পাওয়া যায় না। হোটেলগুলি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং খাদ্যগুলি অতি উপাদেয়। বাজারে লুচি, পুরি, গরম দুধ, মালাই, ভাল ভাল মিষ্টান্ন—কিছুরই অভাব নাই। ফল, ফুল ইত্যাদি জম্মুতে প্রচুর পাওয়া যায়। যাহা হোক, আমরা মন্দিরে পৌঁছে একটু স্থান লাভ করবার পর, দু'টী বালককে কিছু পয়সা দিয়ে ঘরটি পরিষ্কার করিয়ে শয়নের এবং জলের ব্যবস্থা ক'রে নেওয়া গেল। এ সময় একটু শীতল জলের সন্ধান পেলাম না। প্রচণ্ড তাপে উত্তপ্ত ট্যাঙ্কের জলে কোনও মতে হাত-মুখ ধুয়ে, যৎসামান্য কিছু আহারাদি ক'রে শয়ন ক'রলেম। তৃষ্ণায় বুক শুষ্ক হ'য়ে যাচ্ছে, কিন্তু তৃষ্ণা নিবারণের উপায় নাই। শ্রীনগরে পাগলা বাবা নামক সাধু, এই রঘুনাথজীর মন্দিরের ঠিকানা দিয়েছিলেন। নচেৎ হিন্দু খাল্‌সা হোটেলে উঠ্‌লে অবশ্যই কিছু সুবিধা হ'ত। আমি এ দিন অত্যন্ত অসুস্থ হ'য়ে প'ড়েছিলাম। দুর্ব্বল অবস্থায় এতটা পথশ্রম সাধ্যের অতীত হ'য়েছিল।

আমার অসুস্থতার দরুণ উঁহার সমধিক কষ্ট হ'য়েছিল। কারণ দু'দিন অনাহারে ও অনিদ্রায় এবং পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হ'য়েও উঁহাকেই সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রে নিতে হ'লো। এ দিন আর ভগবান রঘুনাথজীর চরণ দর্শন ক'রতে পারলেম না। উনি পূর্ব্বোক্ত হোটেল হ'তে ব্রাহ্মণের দ্বারায় উত্তপ্ত অন্ন-ব্যঞ্জন আনিয়ে আহার ক'রে শয়ন ক'রলেন।

রঘুনাথজী—দেবদর্শন

পরদিন ৮ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার সকালে সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন ক'রে ভগবান রঘুনাথজীর শ্রীচরণ-দর্শনোদ্দেশে উভয়ে যাত্রা ক'রলেম। গেটের উপরই পূজার উপকরণ সমস্তই পাওয়া যায়। যথাসাধ্য সংগ্রহ ক'রলেম। প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ পার হ'য়ে দেবালয়ে উপস্থিত হ'লেম। একটী প্রকাণ্ড রক্ বৃত্তাকারে ঘুরে এসেছে, এবং কতকগুলি মন্দির ও কতকগুলি ছোট ছোট কুঠুরি ক্রমান্বয়ে একটির পর একটি ক'রে গ্রথিতাকারে মালার ন্যায় ঘুরে এসেছে। মন্দিরগুলিতে বড় বড় দেবমূর্ত্তি, শিকের দরোজা দেওয়া কুঠুরিগুলিতে, বেদীতে গ্রথিত অসংখ্য শালগ্রাম শিলা। সম্মুখেই বৃহৎ পিতলের দরোজা—ভিতরে প্রবেশ-পথ নির্দ্ধারণ ক'র্‌ছে। এই দরোজা পার হ'লেই মর্ম্মর পাথরে বাঁধান চত্বর দেখ্‌তে পাওয়া যায়। দরোজার দুই পার্শ্বে বড় বড় শ্রেণীবদ্ধ চক্‌মিলান ঘর। এই ঘরগুলির সম-সমান প্রশস্ত গলিপথ পার হ'য়ে আর একটি প্রাঙ্গণে এলে বামদিকে লোহার শিক দেওয়া দরোজার মধ্যে একটি ছোট কুঠুরিতে মহাবীরের রক্তবর্ণ প্রকাণ্ড মূর্ত্তি, এবং সম্মুখেই প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড এবং অতি উচ্চ, স্বর্ণ কলস-চূড়া-সমন্বিত মন্দিরের মধ্যে সানুজ লক্ষ্মণ ও সীতাসহ সীতাপতি রঘুনাথের বৃহৎ মূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে। মর্ম্মর-মণ্ডিত চাঁদনি,—চাঁদনির পর চক মিলান দরদালান। দরদালানের মধ্যস্থলে ভগবানের শ্রীমন্দির।

মন্দিরের অভ্যন্তর-ভাগ অতি বৃহৎ ও সমচতুষ্কোণ। উচ্চ সিংহাসনাকৃতি চতুর্দ্দোলের ন্যায় বেদীর উপর শ্রীরাম, লক্ষ্মণ এবং সীতা দেবীর দীর্ঘাকার শ্রীমূর্ত্তি—কোমলতা এবং বীরত্বব্যঞ্জক দৃঢ়তার সংমিশ্রণে, মানবকে অভয়

এবং ভয় উভয়ই প্রদান ক'রছেন। দেবতার বস্ত্রালঙ্কার আড়ম্বরহীন। তথাপি আজানুলম্বিত বাহু, দৃঢ়তা ও কোমলতাব্যঞ্জক দেহাবয়ব, করুণা-ময় দৃষ্টি নবদুর্ব্বাদলশ্যাম রামরূপে ঘর আলো ক'রে র'য়েছেন। করুণার জীবন্ত মূর্ত্তি চম্পকবরণী সীতাদেবী বাম ভাগে এবং দক্ষিণ ভাগে গৌর-বর্ণ অনুজ লক্ষ্মণ। উচ্চ বেদীস্থিত দেবতা,—বহুদূরে পথের উপর হ'তে দর্শন পাওয়া যায়। দেবতার চরণতলে পাদপীঠের উপর পূজার দ্রব্য-সম্ভার স্থাপিত। মধ্যে কিছু স্থান ব্যবধান রেখে, গ্যালারির মত বৃহৎ একটি মঞ্চ। মঞ্চের উপর অতি বৃহৎ বৃহৎ অনেকগুলি শালগ্রাম শিলা সজ্জিত র'য়েছেন। এই শিলাপীঠ এবং দেবপীঠের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে পূজক দেব-সেবা ক'রে থাকেন। অন্যের দেবতা-সন্নিধানে যাওয়া সম্ভব নয়। মন্দিরের মধ্যে যাত্রীর যাওয়া নিষেধ। মন্দিরের দরোজার সম্মুখে একখানি পিতলের থালা দেওয়া থাকে। ভক্তগণ পূজার সম্ভার ঐ থালের উপর অর্পণ করেন, এবং পূজক ঐগুলি দেবতার চরণতলে পৌঁছিয়ে দেন। নিষেধ না ক'রলে সমস্ত প্রসাদই ফিরিয়ে দেন।

দেব দর্শন ক'রে ফিরছি, এমন সময় একটি বৃদ্ধ মন্দির-রক্ষক, আমা-দের যত্নপূর্ব্বক আহ্বান ক'রে সমস্ত ঠাকুর-বাড়ীটী দর্শন করিয়ে নিয়ে এলো। অতি বৃহৎ ব্যাপার। ভগবান রঘুনাথজীউর শ্রীমন্দিরের বাহিরের অংশে দরদালানের মধ্যে কুলুঙ্গির ভিতর, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত শ্বেত পাথরের নবগ্রহ দেবতার মূর্ত্তি স্থাপিত র'য়েছে। এই মূর্ত্তিগুলির সেবা, আরত্রিক—প্রত্যহ ভগবান রঘুনাথজীউর সেবা, আর-ত্রিক আদির পরই সম্পন্ন হয়। দালানের দুই কোণে উচ্চ ফ্রেমের মধ্যে স্থাপিত প্রকাণ্ডকায় দুটি দামামা, দুটি মাদল ও দু'টি ঝাঁঝর র'য়েছে। আরত্রিকের সময় দুটি সৈনিকের পরিচ্ছদ-পরিহিত ব্যক্তি কাঠের সোপান বেয়ে উপরে উঠে ঐ গুলি বাজায়। তখন শঙ্খ, ঘণ্টা, ঘড়ি, কাঁসর প্রভৃতি

বাদ্যের সঙ্গে এই বাদ্যগুলির শব্দ মিলিত হ'য়ে বহুদূর পর্য্যন্ত শ্রুতি-গোচর হয়।

শ্রীমন্দিরের বাহিরে চাঁদনির পর, অঙ্গনের অপর পার্শ্বে যে ঘরগুলি চক্‌মিলান শ্রেণীবদ্ধ অবস্থায় শ্রীমন্দিরকে বেষ্টন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, ঐ গুলি সব শালগ্রাম শিলার বেদীতে পরিপূর্ণ। ঘরগুলিব বাহিরের অংশে দেওয়ালের গায়ে বড বড কুলুঙ্গিতে হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে অসংখ্য দেবদেবীর ও অসংখ্য মুনি-ঋষিগণের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। মূর্ত্তিগুলি সমস্তই শ্বেত পাথরের। এ গুলির নিত্য পূজা ও আরত্রিক হ'য়ে থাকে। ধরগুলির মধ্যে অসংখ্য শিলাবেদীতে অসংখ্য শালগ্রাম শিলা। বেদীগুল্লি গ্যালারির আকারে নির্ম্মিত। ছোট বড চৌদ্দ লক্ষ শালগ্রাম-শিলা এই সকল ঘবের মধ্যে বেদী-বক্ষে অর্দ্ধ প্রোথিত করা র'য়েছে। স্বর্গীয় মহারাজা রণবীর সিংহের চেষ্টায় গণ্ডকী নদী হ'তে আনীত দ্বাদশ লক্ষ এবং তৎপরে স্বর্গীয় মহারাজা প্রতাপ সিংহের আনীত দু'লক্ষ শালগ্রাম শিলা এই স্থানে স্থাপিত আছেন। প্রকৃতপক্ষে ভগ 'ান রঘুনাথ শালগ্রাম-পরিবেষ্টিত হ'য়ে বিরাজ ক'র্‌ছেন। ঘরগুলির ভিতরের দেওয়ালের অসংখ্য খিলানের মধ্যে শ্বেত পাথরের অসংখ্য দেবদেবী এবং মনি-ঋষির প্রতিমূর্ত্তি ব'য়েছে।

অসংখ্য গ্যালারির মধ্যে সরু সরু পথগুলি গোলক ধাঁধাঁর মত ঘুরে ঘুরে চ'লে গেছে। ঐ গুলির কোলে কোলে স্নান-জল যাবার জন্য সরু সরু নালা ঘুরে ফিরে একত্রিত হ'য়ে প্রত্যেক ঘরের মধ্যেই যে এক একটি কুণ্ড স্থাপিত আছে, উহাতে গিয়ে প'ড়ছে, এবং জমির নীচে স্থাপিত বড় বড় পাইপের মধ্য দিয়ে ঐ সকল কুণ্ডের জল একটি বড় কুণ্ডে গিয়ে পতিত হ'চ্ছে। এই বড় কুণ্ডটির নিম্নভাগে প্রবাহিতা ক্ষুদ্র কায়া প্রবাহিণীতে পতিত হ'য়ে চ'লে যাচ্ছে।

শ্রীমন্দিরের পশ্চাৎভাগে স্থাপিত একটি ছোট সুড়ঙ্গের মধ্যে দুটি সোপান চ'লে গেছে, এবং ঐ স্থানে একটি পবিত্র স্রোতস্বতী প্রবাহিতা হ'চ্ছে। উপরটি আচ্ছাদিত। ঐ জলে কেহ চরণ স্পর্শ করে না,—বা তাহার উপায়ও নাই। লোটায় দড়ি বেঁধে ঐ জল তোলা হয়। এই প্রবাহিণীর জলে ঠাকুর-বাড়ীর এতগুলি দেবদেবীর সেবা হয়।

পূর্ব্বোক্ত শালগ্রামশিলা-রক্ষিত ঘরগুলির পর যে বড় বড় মন্দিরগুলি রঘুনাথজীউর মন্দির বেষ্টন ক'রে র'য়েছে, উহাতে বড় বড় মনুষ্যাকৃতি বিগ্রহ সকল স্থাপিত আছে। ভরত, শত্রুঘ্ন, বামন, কল্কি, বরাহ, মৎস্য, নৃসিংহ, কূর্ম্ম, পরশুরাম, রাধাকৃষ্ণ, কৃষ্ণ-বলদেব, অষ্ট নায়িকা, শিবলিঙ্গ প্রভৃতি মূর্ত্তিগুলি সুন্দর এবং মৃন্ময়-প্রতিমার মত বিবিধবর্ণে রঞ্জিত। এতদ্ভিন্ন শিবমন্দিরে অন্নপূর্ণার এবং সাবিত্রীদেবের ভাস্কর-মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। বাহিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণের দিকে, রকের উপর মন্দিরগুলির সম্মুখ ভাগ। শ্রীমন্দির-বেষ্টিত বহিঃপ্রাঙ্গণের সীমানায় কর্ম্মচারিগণের বাসস্থান ও পান্থশালা ইত্যাদি বিদ্যমান। রাস্তার উপর গেটের দুই পার্শ্বে চারটি স্বর্ণমণ্ডিত উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট বিরাট মন্দির। ইহার তিনটি স্বর্গীয় মহারাজা রণজিৎ সিংহ, গোলাপ সিংহ ও অমর সিংহের চিতা-ভস্মের সমাধি-মন্দির; এবং আর একটা প্রকাণ্ড মহাবীরের মন্দির। মন্দিরগুলির কোলে বারাণ্ডা ও তাহার পর বিস্তীর্ণ বাঁধান রক্। বহু বহু যাত্রী পরিবার এই স্থানে আশ্রয় লয়। এই সকল মন্দিরে পৃথক পৃথক পূজক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছেন। ভগবান রঘু-নাথের মন্দিরে ও এক লিঙ্গের মন্দিরের সেবার ব্যবস্থা ও আয়োজন কিছু অধিক। নিয়ত রৌপ্য-ঝারার বারিধারায় দেবাদিদেব সিক্ত হ'চ্ছেন। একটি প্রকাণ্ড রূপার ফণি শিবলিঙ্গ বেষ্টন ক'রে দেবতার মাথার উপর ছত্রাকারে ফণা বিস্তার ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কালো পাথরের নাতিদীর্ঘ

বিঘৎ প্রমাণ আটটি শিবলিঙ্গ গৌরীপট্টের উপর চক্রাকারে বসানো আছে। উপরে দেওয়ালের খিলানের মধ্যে উপবিষ্টা কর্ম্মপ্রসবিনী জগৎজননী মা অন্নপূর্ণার নিকট, শুভ্রোজ্জ্বল জ্ঞানরূপী জগৎগুরু করুণাময় পরমপিতা দেবাদিদেব মহাদেব, কর্ম্মরূপ বিচিত্র অম্বরে জ্ঞানের অনাবিল শুভ্র জ্যোতি আংশিক আচ্ছাদিত ক'রে ক্রিয়ারূপ হু'টী প্রসারিত হাতে, জন্ম-মৃত্যু-পরিপাকরূপ শুভ্র অনাময় অন্নরাশি ভিক্ষ ক'রে নিচ্ছেন। আহা দেবাদিদেবের সত্ত্ব-রজ-তম-রূপ ত্রিগুণবিশিষ্ট ত্রিকালদর্শী তিনটি নয়ন, চিন্ময়ানন্দ মদিরা পানে ঢুলু ঢুলু! কুলকুণ্ডলিনী বিচিত্রবরণী মা আমার, ফণির আকারে যোগীরাজের কোটি বেষ্টন ক'রে ক্রমে উর্দ্ধ মুখে সরল রেখায় উত্থিত হ'য়ে, শিব-পদ্মে মোহনচূড়ার শোভা বর্দ্ধন ক'রে ছত্রাকারে বিরাজ ক'রছেন। হুটি কর্ণে সুশুভ্র হু'টি ধুতুরার ফুল সাধন-তত্ত্বের বিকাশ ক'রে, প্রকৃতিরঞ্জন শ্রীমুখের অপূর্ব্ব শ্রীসম্পাদন ক'রছে। আহা কি অপরূপ রূপ—দর্শনে তৃপ্তির পরিসমাপ্তি নাই।

তমোময় এলায়িত চিকুরজালের মধ্যে রজোগুণোন্মেষিণী চম্পক-বরণী মা আমার, জন্মরূপ রক্তবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত ক'রে ব্রহ্মাণ্ডকটাহ-রূপ স্থালী কক্ষে ল'য়ে, কালরূপ দর্ব্বির দ্বারায়,—জন্মমৃত্যু কর্ম্মের দ্বারায়, পরিপক্ক জীবব্রহ্মরূপ অন্নরাশি স্থিতিরূপ করপুটে পরিমাপ পরিবেশন ক'রছেন। এ হেন অপরূপ রূপ, আমা হেন অযোগ্যার বর্ণনার সাধ্য নাই। শোক-দগ্ধ-হৃদয়া সামান্যা নারী আমি, কি শক্তি মা আমার যে, তোমায় হৃদয়ে ধারণ করি,—অথবা তোমার স্বরূপ বর্ণনা করি। হে মহাত্মা জ্ঞানিগণ,—দীনার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা ক'রবেন। উন্মত্ত হৃদয় বাধা মানে না।

কক্ষের অপর পার্শ্বে মন্দির-গাত্রে সৃষ্টি-জনক তমোহর সবিত্রীদেবের ভাস্কর মূর্ত্তি। এই হুই প্রতিমা, হুটি জ্যোতিষ্কের মত মন্দিরের হুই

স্থানে ঝক্‌ঝক্ ক'রছে। ইহার সেবা-পারিপাট্য রাজরাজেশ্বরের মত ও হৃদয়গ্রাহী। সত্ব, রজ, তম—সৃষ্টি স্থিতি লয়—যেন এক স্থানে বিরাজ ক'রছেন। বৃহৎ ঠাকুর-বাড়ীর সমস্ত পরিদর্শন করা অনেক সময়সাপেক্ষ। বাসায় ফিরে এসে উনি স্নানাহারের সন্ধানে গেলেন, এবং আমি মুক্ত বায়ুতে ঘরের মেঝেয় একখানি কম্বল বিছায়ে শুয়ে প'ড়লেম। রন্ধনের সুবিধা ক'রতে পারলেম না, কারণ হিমসমাচ্ছন্ন হিমবৎ শৈল-শিখর হ'তে নেমে এসে, অকস্মাৎ প্রখর সূর্য্যতাপের জ্বালা-মালাময় কিরণের মধ্যে বিষম গ্রীষ্মে হাবু ডুবু খেয়ে আমরা হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, তার উপর কোনও লোকের সাহায্য না পাওয়ায় নিজেদেরই হাট-বাজার ক'রে এনে রন্ধনাদি করা কষ্টকরও বটে এবং সময়-সাপেক্ষও বটে, কাজেই ঐ পন্থা পরিত্যাগ করা গেল।

কিছুক্ষণ পরে উনি স্নান ক'রে স্নিগ্ধ হ'য়ে এলেন। উপযুক্ত স্থানের অভাবে আমার আর স্নান করা হ'লো না। হোটেল হ'তে উত্তপ্ত পবিত্র অন্নব্যঞ্জন ব্রাহ্মণের দ্বারা ঘরে আনিয়ে তৎসহ দধি সহযোগে পরিতোষ রূপে উনি আহার ক'রলেন। এ দেশের রীতি-নীতি ভিন্ন প্রকার। উঁহার আহারের পর ঐ ব্রাহ্মণই উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি নিয়ে গেল, এবং আমার জন্য আর এক পাত্র অন্নব্যঞ্জন এনে উপস্থিত ক'রলে। বহু-কালের পর মেঝের উপর আসন পেতে ব'সে অন্নাহার ক'রে বড়ই তৃপ্তি হ'লো। কাশ্মীরে চেয়ারে ব'সে টেবিলে আহার ক'রে এক দিনও তৃপ্তি পাই নাই। এত দিন উদর পূর্ণ ক'রলেও অনাহারের মত অনুভব হ'য়েছে।

আহারের পর দরোজা-জানালাগুলি বন্ধ ক'রে দিয়ে বিশ্রামের আয়োজন ক'রে শুয়ে প'ড়লেম। নিদাঘের প্রচণ্ড আতপ তাপে পৃথিবী দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। নিরাশ্রয় পথিক এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত নাগরিক ভিন্ন এ

সময় আশ্রয় পরিত্যাগ ক'রে—কার সাধ্য? উনি একখানি টঙ্গা গাড়ীর ব্যবস্থা ক'রে এসেছিলেন, ঘড়িতে সাড়ে তিনটা বাজ্‌তেই গাড়ী এসে উপস্থিত। তখন সহর দেখ্‌বার জন্য উভয়ে বেরিয়ে প'ড়লেম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাসায় ফিরতে হবে, কারণ—সন্ধ্যাবেলা আরাত্রিকাদি দেখ্‌তে হবে।

জম্বু—রাজবাড়ী

জম্বুর রাজবাড়ী অতি সুন্দর। প্রকাণ্ড হাতার মধ্যে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত সুন্দর কারু-কার্য্যময় সুবৃহৎ সৌধাবলী। হাতার মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড ময়দানের উপর রেলিংঘেরা ছোট একটি পুষ্পোদ্যানের মাঝখানে সুন্দর একটি উচ্চ বেদী সম্প্রতি নির্ম্মিত হ'য়েছে। অধুনা মহারাজ হরিসিংহ এই স্থানে দরবার করেন। পুরাতন দরবার-গৃহ রাজবাড়ীর মধ্যে সুবৃহৎ সুসজ্জিত হল। দেখ্‌লেম, দরবারের গৃহসজ্জাগুলি আস্তরণ ঢাকা দিয়ে রাখা হ'য়েছে, এবং মূল্যবান কার্পেটাদি এক দিকে স্তূপাকার হ'য়ে আছে। রাজবংশীয় স্বর্গীয় কতিপয় রাজপুরুষের তৈলচিত্র এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়া হ'তে বর্ত্তমান ইংলণ্ডেশ্বর ও ইংলণ্ডেশ্বরীর তৈলচিত্র দরবার-গৃহের গাত্রে বিলম্বিত র'য়েছে। দরবার গৃহটী উপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিত।

খুব বড় বড় কাচের দরোজার মধ্য দিয়ে ঘরের ভিতরের সমস্ত জিনিষই দেখা যাচ্ছে। দরোজাগুলি বন্ধ। সারি সারি দপ্তরখানা এখন তালাবন্ধ র'য়েছে।

রাজবাড়ীটির গঠন-প্রণালী বিলাস-বর্জ্জিত ও যেন ছন্দে লীলায়িত। মর্ম্মরতুল্য শ্বেত শোভায় অতি মনোহর হ'য়েছে। এক্ষণে জ্যৈষ্ঠ মাসে সমস্ত আফিস উঠে কাশ্মীরে চ'লে যাওয়ার জন্য রাজবাড়ী নীরব ও তালাবন্ধ; কিন্তু সর্ব্বত্রই শাস্ত্রিগণ পাহারা দিচ্ছে। বর্ত্তমান মহারাজা হরিসিংহের মহিষীর নূতন ভবন প্রস্তুত হ'য়েছে। অতি সুন্দর কারু-কার্য্যময় ললিত শিল্প-কলা, প্রাচীর গাত্রে ও স্তম্ভ-গাত্রে
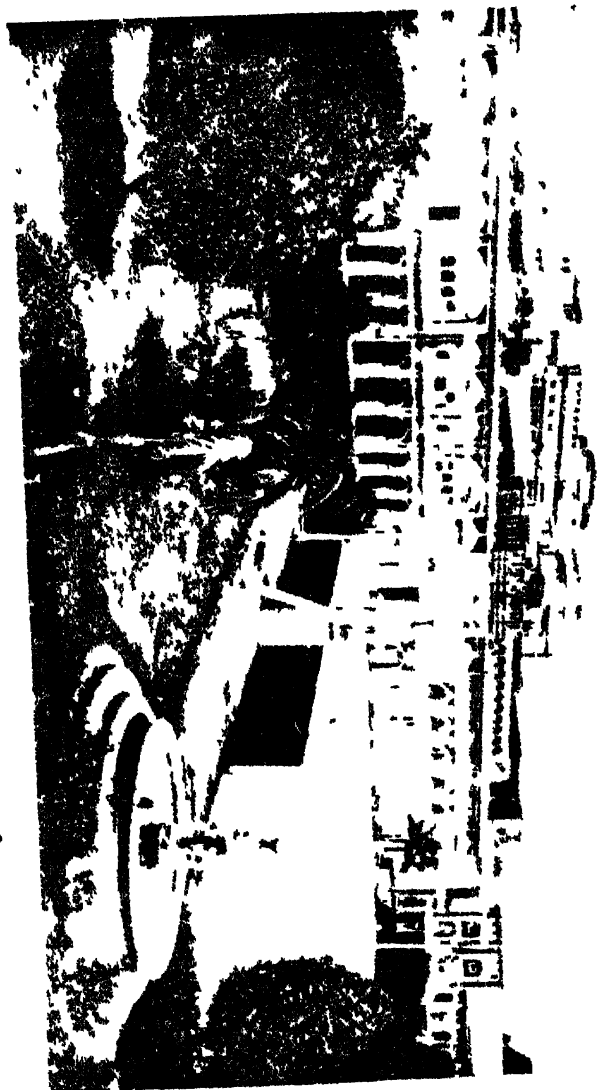
ঝলসিত হ'চ্ছে। অতি প্রকাণ্ড অট্টালিকা। বৃদ্ধ মহারাণী ও রাজমাতাগণের পুরীখানিও অতি প্রকাণ্ড। প্রকাণ্ড স্তম্ভাবলী বিরাজিত সুবৃহৎ অট্টালিকা। ভূতপূর্ব্ব কোন কোন মহারাজাদের বাস-ভবন সকল অধুনা তোষাখানা, হাতিখানা, অশ্বশালা প্রভৃতির সামিল করা হ'য়েছে। রাজবাটীর সান্নিধ্যে উচ্চশ্রেণীর রাজ কর্ম্মচারিগণের পল্লী। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীন ও আধুনিক সুদৃশ্য বাড়ী-গুলি সুরুচির ও সমৃদ্ধির পরিচায়ক। রাজবাড়ীর বহুদূরে রাণী-মহল্যা নামে একটী বৃহৎ পুরাতন অট্টালিকা আছে। পূর্ব্বতন রাজাগণের উপপত্নীগণ আত্মীয়-স্বজনাদি সহ ঐ বাড়ীটীতে বাস করেন। আমরা সহরটী মোটামুটি দেখে ঠাকুরবাড়ীতে ফিরে এলেম।

ঠাকুরবাড়ীর পূজা ও আরত্রিকাদি-পদ্ধতি

সহর দেখে বাসায় ফিরে আবার এক দর্শনাভিলাষে প্রস্তুত হ'য়ে পিতলের ফটক পার হ'য়ে ঠাকুরের সান্নিধ্যে উপস্থিত হ'লেম। তখন ধর্ম্মশীলা রমণীগণ দু'টী একটী ক'রে রকের উপর এসে উপবেশন ক'রছেন। আমরা আর ঐ স্থানে অপেক্ষা না ক'রে ভিতরে প্রবেশ ক'রলেম। দেখ্‌লেম—ভগবানের সম্মুখেই অঙ্গনের উপর সতরঞ্চ বিছিয়ে গীত-বাদ্যের মজলিস হ'য়েছে। বাঁয়া, তবলা এস্রাজ, বীণ, সারেঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র সব এসে প'ড়েছে। দু' একজন ভদ্রলোক এসে উপবেশন ক'রছেন। আমরা একটু অন্তরে ও নির্জ্জনে গিয়ে উপবেশন ক'রলেম। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই পূর্ব্ববর্ণিত বৃদ্ধ মন্দির রক্ষক এসে আমাদের দু'খানি আসন প্রদান ক'রলো। দলবল নিয়ে ওস্তাদ এলেন, পরে সঙ্গীত আরম্ভ হ'লো। বড় মধুর, সুতান সংযোগে ভগবানের নাম কীর্ত্তন। কর্ণে অমৃত বর্ষণবৎ সুমধুর বোধ হ'লো। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই আসর ভঙ্গ হ'য়ে গেল। বিজলীর আলোতে সমস্ত ঠাকুরবাড়ীটী আলোকিত হ'য়ে উঠ্‌লো। মন্দির ঘণ্টা হ'তে দামামা প্রভৃতি বাদিত্রে সকল বাদিত হ'য়ে সমস্ত জগৎ সহরে সন্ধ্যার আগমন জানিয়ে দিল। আমরাও উঠে উদাস প্রাণে মন্দিরে প্রবেশ ক'রলেম। সেখানে বহু নর-নারী সমবেত হ'য়েছেন। যোষিদ্‌গণ মূল্যবান সাটী ও অলঙ্কারে ভূষিতা, এবং পুরুষগণ পবিত্র শ্বেতবস্ত্রে শোভিত। মন্দির-দ্বারে শুভ্রবস্ত্র পরিহিত একজন সশস্ত্র সৈনিক প্রহরায় নিযুক্ত র'য়েছে। চারজন সৈনিক দামামা প্রভৃতি পিটুচ্ছে। তিন চার জন সেবক ব্রাহ্মণ মন্দিরের মধ্যে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পুরোহিতের মুখোচ্চারিত ওঙ্কার শব্দে বেদধ্বনি জেগে উঠ্‌তেই সমবেত সমস্ত নর-নারী তানলয়-সংযোগে উদাত্ত সুরে বেদপাঠে মগ্ন

হ'লেন। বেদপাঠের পর স্তব্ধনেত্রে সকলে আরতি দর্শন ক'রলেন, তারপর ভোগ সমর্পণ। পরে পুরোহিত একক বেদপাঠ ক'রলেন, জনগণ স্তব্ধ পুত্তলিকার মত দাঁড়িয়ে রইলেন। পুরোহিতের বেদপাঠের পর সমবেত ভক্তগণ সুরলয়-সংযুক্ত বাঁশরীর ন্যায় শতকণ্ঠে, একটি মাত্র মধুর ললিত সুরে গ্রাম্য বাল্যলীলা বিষয়ক গানে বিভোর হ'য়ে বাহ্যজ্ঞান-হীন-প্রায় পূজকগণের সহিত মগ্ন রইলেন। পরে পূজকগণ ভক্তগণের সঙ্গে স্তোত্র-গাথার মধ্য দিয়ে, আরতির দ্রব্যাদিসহ মন্দির হ'তে বেরিয়ে দরদালান-স্থিত নবগ্রহ দেবতার আরত্রিক ও ভগবানের প্রদক্ষিণ-ক্রিয়া সাঙ্গ ক'রে সমস্ত শালগ্রাম শিলার ও ঠাকুরবাড়ীর সমস্ত দেবদেবী বা গণদেবতাগণের এবং প্রধান ফটকের পাশে মহাবীরের ও সমাধি-মন্দিরগুলির আরত্রিকের কার্য্য সমাপ্ত ক'রলেন। কি বিরাট ব্যাপার! দর্শনে প্রাণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়। বলা বাহুল্য—ভগবান রঘুনাথের আরত্রিকের পর সমস্ত দেবদেবীর আরত্রিক হয়। যদিচ প্রত্যেক শালগ্রাম শিলা গৃহে এবং অন্যান্য দেবালয়ে পৃথক পৃথক পূজক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছেন, তথাচ রঘুনাথের আরত্রিকের পর, তাঁহারই পূজকের দ্বারায় সমস্ত দেবদেবীর পুনশ্চ আরত্রিক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রঘুনাথের পূজকই সমস্ত ঠাকুরবাড়ীর প্রধান পূজক।

শালগ্রাম শিলাগুলির সেবাকার্য্যও এমনই বিরাট। প্রত্যেক ঘরে সেবক নিযুক্ত আছেন। এক ব্যক্তি 'স্নানীয়ং সমর্পয়ামি' মন্ত্রে বেদী-পীঠে জল ঢেলে হাত ঘর্ষণ ক'রতে ক'রতে চ'লে যান। ঐরূপ এক ব্যক্তি একটা প্রকাণ্ড পাথর বাটীতে চন্দন নিয়ে হাত ভর্ত্তি ক'রে চন্দন উঠিয়ে ঐরূপে চন্দন মাখিয়ে দেন। এইরূপ সেবা-কার্য্যের পর পুরোহিত নৈবেদ্যাদি নিয়ে ঘরের মধ্যস্থলে উপবেশন ক'রে পূজা সমাপ্ত

করেন। তত্রাচ সেবার ব্যবস্থা সকল ঘরে পর্য্যাপ্ত নয় ব'লেই বোধ হ'লো।

আরত্রিকের পর প্রসাদ বিতরণ হয়। আমরা মন্দির হ'তে বেরিয়ে বৃদ্ধ মন্দির-রক্ষককে তল্লাস ক'রে ধ'রে এনে মন্দিরের তথ্যাদি যথাসম্ভব সংগ্রহ ক'রে নিলেম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ব্ব-রক্ষিত এবং আজিকার জম্মু সংক্রান্ত সংগ্রহ-লিপি হারিয়ে যাওয়ায়, সন তারিখ সহ বিস্তৃত তথ্য সকল লিপিবদ্ধ ক'র্‌তে পার্‌লেম না। যাক, পাছে অনেক রাত হ'য়ে যায়, এই কারণে আমরা ফির্‌লেম। আশঙ্কা—দোকানগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ক্ষুন্নিবৃত্তি করণের আর উপায় থাক্‌বে না। রজনী দ্বিযাম উত্তীর্ণ হ'লে, সিংহদ্বার বন্ধ হ'য়ে যায়, এবং শেষ যামে চারটা বাজ্‌লেই ঐ দ্বার মুক্ত হয়। যাহা হোক, তখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব ক'রলেও আহার্য্য প্রাপ্তির আশা আছে দেখে বাকী সমাধি-মন্দিরগুলি দর্শনের জন্য অগ্রসর হ'লেম। ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে দু'টী সমাধি-মন্দিরের দর্শন পেলেম এবং ভিতরে আলো দেখে অগ্রসর হ'লেম। কিন্তু ভিতর বিজলীর আলোর উদ্ভাসিত হ'লেও কাচের দরোজা বন্ধ হ'য়ে গেছে। ঘরের মেঝেটি রূপা দিয়ে বাঁধান। উচ্চ মঞ্চের উপর স্বর্গীয় মহারাজা গোলাবসিংহের তৈলচিত্র স্থাপিত। পিতলের বালগোপাল, বলরাম, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতির ছোট ছোট মূর্ত্তি তৈলচিত্রের নিকট মঞ্চের উপর স্থাপিত। রূপা-বাঁধান মেঝের উপর অতি স্বচ্ছ স্ফটিকের এক হাত উচ্চ শিবলিঙ্গ। লিঙ্গের অভ্যন্তর দিয়ে প্রতি বস্তুটি সুন্দর দেখা যাচ্ছে, এজন্য দেবতা হঠাৎ দৃষ্টিগোচর হ'চ্চে না। রূপার বাসনগুলি ঝক ঝক্ ক'রছে। শুভ্র রজতের উপর বিজলীর আলো পতিত হ'য়ে ঘরটীর মধ্যে বহু চন্দ্রের আভা বিকীর্ণ ক'রছে। দেওয়ালের গায়ে বীরবরের অস্ত্রগুলি রূপার খাপের মধ্যে ঝুল্‌ছে।

অপর মন্দিরটিতেও স্বর্গীয় যুবরাজ সমরসিংহের তৈলচিত্র এবং

আদালত

এক বিগ্রহ একটী স্ফটিকের মহাদেব। দরোজাগুলি লোহার শিক দেওয়া এবং পুরু কাচের দ্বারা আবৃত। আমরা কাচের মধ্য দিয়ে দেখে এলাম। গেটের অপর পার্শ্বে দুটি মন্দির বন্ধ হ'য়ে গেছে। আমরা এদিন আর দেখ্তে পেলেম না। মন্দির-রক্ষকের নিকট শুনেছিলাম যে, এ সকল মন্দির দর্শনের জন্য কেহ আসে না। পরে আহার্য্যাদি সংগ্রহ ক'রে আমরা উপরে চ'লে গেলাম।

পরদিন ৯ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার আঁধার থাকতেই শয্যা ত্যাগ ক'রে উঠে প'ড়লেম। ঐ সময়েই নগরবাসীরা দলে দলে নদীতে স্নানার্থে চ'লেছেন। আমরাও সব লোক জাগরিত হবার পূর্ব্বেই স্নানাদি সেরে নিলাম, এবং সন্ধ্যাহ্নিক সেরে নিয়ে ভোরেই শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হ'লেম। এ দিন আমি একা, আর কাহারও অপেক্ষা নাই। সব পরিচিত হ'য়ে গেছে। শ্রীমন্দিরে প্রণাম ও চাঁদমুখ দর্শন—পরে দেবতাগুলি সব দর্শন ক'রে ঘুরতে লাগ্লেম। প্রভাতের পূর্ব্বেই একটি একটি করে যাত্রী সমাগম হ'চ্চে। ভক্তগণ ভক্তবৎসল ভগবান সীতাপতির চাঁদমুখখানি দর্শন ক'রে [illegible] মত মন্দিরে মন্দিরে পূজা ও দর্শন ক'রে বেড়াচ্ছিলেন এবং সকলেই পুনরায় শ্রীমন্দিরে সমবেত হ'য়ে জপ-পূজায় রত হ'লেন। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের মুখোচ্চারিত বেদধ্বনি ও সমবেত নর-নারীর তান-লয়-সংযুক্ত সুললিত সুশিক্ষিত কণ্ঠোচ্চারিত গাত্রোত্থান স্তোত্র গাথার পবিত্র ধ্বনিতে মন্দিরের পবিত্র বায়ু মুখরিত হ'য়ে উঠে। সমবেত নাগরিকদিগের জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে ভগবান রামচন্দ্র, অনুজ লক্ষ্মণ ও মহালক্ষ্মী সীতাদেবীর নিদ্রাভঙ্গ হয়। তারপর বালক রামচন্দ্রের চারি সহোদর সহিত বাল্যলীলা—গ্রাম্য ভাষায় বাদ্যহীন ঐক্যতানে সুরের লহর তুলে গান ক'রতে থাকে। আহা সে কি মধুর—কি সুন্দর। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা এক তানে এক প্রাণে

তাহা অনুমান ক'রতে পারি নাই। বিস্মিত হ'য়ে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রলেম।

অদ্ভুত, অদ্ভুত—বিস্ময়ের উপর বিস্ময়!—মেঝেটী অতি কোমল ও অধিক পুরু পশমের কুসুমাকীর্ণ কার্পেট দিয়ে মোড়া। মহাদেবের গৌরীপট্টের গায়ে দু'দিকে দুটী কাঠের সিঁড়ি লাগান। এই সিঁড়ির উপর আরোহণ ক'রে মহাদেবের অঙ্গ-মার্জ্জনাদি সেবা সম্পন্ন হয়। গৌরীপট্টের উপর হ'তে দীর্ঘতায় মহাদেবের শিরোভাগ,—বোধ হ'লো কোনও দীর্ঘ পুরুষ ধাপের উপর হ'তে হাত বাড়িয়ে দিয়ে দেবাদিদেবের মস্তক স্পর্শ ক'র্‌তে পারেন কিনা সন্দেহ। একখানি রেশমী বস্ত্র লিঙ্গের অঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছে। চন্দন-চর্চ্চিত শিবের মাথার ঠিক উপরেই একগাছি মোটা শিক্‌লি মন্দির-চূড়া হ'তে নেমে এসেছে, এবং একটী ছোট জালার মত রূপার নাদা ঝারার আকারে ঐ শিকলিতে ঝুলছে। ঝারা হ'তে বিন্দু বিন্দু পুষ্পাসার-মিশ্রিত জল পতিত হ'য়ে, মহাদেবের গাত্র বস্ত্র এবং শিরোদেশ সিক্ত ক'রছে। বড় বড় চারখানি আয়না দেওয়ালের চার দিকে গাঁথা। রাজবংশধর স্বর্গীয় রণজিৎ সিংহ ও গোলাব সিংহের বড় বড় অয়েল পেন্টিং দেওয়ালে টাঙ্গান। সকলের উপর বিস্ময়কর,—বড় বড় উলঙ্গিনী নারী-মূর্ত্তি অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে দেওয়ালের গায়ে দর্পণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। যদিচ এগুলি পুতুল,—তথাপি এগুলিকে প্রথম দৃষ্টিতে মানবী ব'লেই ভ্রম হয়। বীভৎস দৃশ্য। এতদ্ভিন্ন দেওয়ালের গায়ে ঝাড় দেওয়া অনেকগুলি দেওয়ালগিরি আছে। উত্তম চামর, আড়নি পাখা, কৃপাণ, অসি, বন্দুক প্রভৃতি রত্নাদি-খচিত চামড়ার খাপের মধ্যে দেওয়ালে বিলম্বিত র'য়েছে। ধূপ-ধূনার পরিবর্ত্তে আতর-গোলাপের গন্ধে গৃহ আমোদিত। দেবতাকে প্রদক্ষিণ ক'রে ঘুরে আস্‌তে কিছু বিলম্ব হ'য়ে গেল। আমার দেহের প্রতিবিম্ব দর্পণে প্রতিফলিত

হওয়ায় বাহিরে পাহারায় নিযুক্ত শান্ত্রীর নজরে পড়ে গেলাম। সে ব্যক্তি অল্প স্বল্প উদ্ধত ভদ্রতার সঙ্গে জানিয়ে দিল যে, যখন ঘরে প্রবেশ করা নিষেধ, তখন কি নিমিত্ত আমি ঘরে প্রবেশ ক'রেছি।

আমি অতিশয় লজ্জিতা হ'য়ে বিনীত ভাবে জানালেম যে, আমায় কেহই নিষেধ করে নাই। আমি অজ্ঞতাবশেই প্রবেশ করেছি। বেচারা ভদ্র ঘরের রমণী দেখে এমত ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব বিনয়ের সহিত জানিয়ে দিল যে, ভিতরে প্রবেশ রাজার হুকুম নাই। সেবার পর মন্দির বন্ধ থাকে। এ স্থান হ'তে বেরিয়ে এ হেন সংবাদ দয়িতের নিকট উপস্থিত করবার জন্য ব্যাকুল অন্তরে ছুটলেম। আজ তো আর চিত্তরঞ্জন নাই, উমারাণীও আজ শ্বশুরালয়ে। এ হেন নূতন সংবাদ কার কাছে জানিয়ে হৃদয়ের ভার লাঘব ক'রবো। হে আমার প্রিয়তম, তুমি সত্বর একবার দেখে যাও। হয়তো দরোজা বন্ধ হ'য়ে যাবে,—আর দেখ্তে পাবে না ;—আমার দর্শনের সাক্ষ্য মিলবে না।

সত্বর পদে বাসায় উপস্থিত হ'য়ে দেখ্লেম, কম্বলের উপর লম্ব হ'য়ে শুয়ে শুয়ে হাত-পাখায় বাতাস খাচ্ছেন। অতি আগ্রহে অশেষ যত্নে একবার পাঠিয়ে দিলাম, একবার দেখে আস্তেই হবে। কি মানুষ—কিছুতেই উঠ্বেন না . .

যতক্ষণে ফিরে এসে এ হেন আঁতনর দর্শনের সংবাদ না দিলেন—, ততক্ষণ আমার আর সোয়াস্তি নাই। এ কি ব্যাকুলতা—এ ব্যাকুলতার কারণ অন্বেষণ ক'রতে গিয়ে দেখলাম চোখ দুটো ভিজে এলো। কিন্তু, এখন তো কেহই নিকটে নাই—আমি একলাই আছি। চিত্ত-রঞ্জন যাদু আমার। তুমি একবার এসে বল, -"মা, আমি তোমার সঙ্গেই আছি। আমি সকলই দেখ্তে পাচ্ছি,—মা—তুমি কেঁদনা।"

যাক—এখনই তিনি এসে প'ড়বেন। চোখদুটো মুছে সাগ্রহে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা ক'রে রইলাম

জম্মু সহর

দ্বিপ্রহরে হোটেল হ'তে অন্নব্যঞ্জনাদি আনিয়ে ঘৃত-দধির সংযোগে আহারাদি করা গেল। পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে উ'ঠে একখানি টঙ্গায় উঠে সহরটী আর একবার দেখ্‌তে চ'ল্লেম।

কাশ্মীর রাজ্যের অন্যতম রাজধানী জম্মু—তাপ্তী বা তাওয়াই নদীর তীরে অবস্থিত। শীত ঋতুতে শ্রীনগর তুষারপাতে আবৃত থাকায়, কাশ্মীরের মহারাজা ঐ সময় শ্রীনগর ত্যাগ ক'রে সপারিষদ জম্মুতে এসে অবস্থান করেন। তাপ্তী নদীর দক্ষিণ তীরে রাজবাড়ী ও সহর, এবং দুর্গটী বাম তীরে বিরাজিত। সহরের উপকণ্ঠে অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষগুলি অতীতকালের প্রবল পরাক্রান্ত রাজপুত রাজত্বের সাক্ষ্য প্রদান ক'রছে। জম্মু, মহারাজ রণজিৎ সিংহের অধিকারের পর তিনি এই প্রদেশ তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী গোলাব সিংহকে পারিতোষিক স্বরূপ দান করেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হ'য়েছে।

জম্মু খুব বড় সহর না হ'লেও নিতান্ত ছোট নয়। রাস্তাগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে নানাপ্রকার ফল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। শাক-সব্জী, বাসমতী চাল, দুধ, মালাই, মিষ্টান্ন প্রভৃতি সকলরকম আহারীয় দ্রব্য প্রচুর ও অন্যান্য স্থান হ'তে সুলভ। বিলাতি মনোহারীর দোকান, বিলাতি ছবির দোকান, বিলাতি ধরণের জামা-কাপড়ের দোকান প্রচুর। চাউল পটি, ডাইল পটি, বড় বড় বাজার, ভাল ভাল নানাবিধ মিষ্টান্নের দোকান, বহুবিধ ফলের দোকান—কিছুরই অপ্রতুল

জীউর মন্দিরের চূড়ায় পদ্ম, রণবীর সিংহের মন্দিরের চূড়ায় চক্র, গোলাব সিংহের মন্দিরের চূড়ায় শঙ্খ এবং [illegible] সিংহের মন্দিরের চূড়ায় পদ্ম-এর নকাকৃতি গদার দ্বারা ভূষিত। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, কাশ্মীরের মহারাজগণ একান্ত ধর্মপরায়ণ ও বীর পূজক। মহারাজা প্রতাপ সিংহ জম্মুর ঠাকুরবাড়ীগুলির এবং তাঁহার রাজ্যের সমস্ত তীর্থগুলির বিশেষ ভাবে সংস্কার ও উন্নতি সাধন করেন, কিন্তু তাঁহার সমাধি জম্মুতে নাই। কাশ্মীর শ্রীনগরে রাজপ্রাসাদের মধ্যে তাঁহার সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে।

ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত হিন্দু নরপতিগণের মধ্যে কাশ্মীরের মহারাজা অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ও সাধুবৎসল। ইঁহারা বংশানুক্রমে এ গৌরবে গৌরবান্বিত।

কাশ্মীরে অনেকগুলি হিন্দুর পবিত্র তীর্থক্ষেত্র আছে। তীর্থগুলির অধিকাংশই অত্যন্ত দুর্গম ও কষ্টসাধ্য। ঐ সকল তীর্থযাত্রী সাধুসন্ন্যাসী রাজ-সরকার হইতে ও বহু ধনী মহাজনের নিকট হইতে পাথেয়স্বরূপ অর্থ ও বস্ত্রাদি সাহায্য প্রাপ্ত হন, এবং কাশ্মীরে অবস্থানকালে রাজ অতিথি স্বরূপ আহার্য্য প্রাপ্ত হন।

ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থক্ষেত্রে কাশ্মীরের মহারাজার ছত্র আছে। চলিত কথায় এ সকল ছত্রের নাম ভণ্ড-ছত্র। এই সমস্ত ছত্রের ও কাশ্মীর রাজ্যের সমস্ত তীর্থক্ষেত্রের এবং সাধু-সন্ন্যাসী ও অতিথি সেবা প্রভৃতি কার্য্য-পরিচালনার জন্য ‘ধর্ম্মার্থ বিভাগ’ নামে মহারাজের একটী স্বতন্ত্র আফিস আছে। পরম পূজনীয় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীঠাকুর ভবনাথ এই বিভাগে প্রধান কর্ম্মচারীরূপে বহুকাল কাজ ক'রেছিলেন। পূজ্যপাদ ভবনাথ ঠাকুর, ভারতবর্ষের আসমুদ্র হিমাচল পর্য্যন্ত বিভিন্ন জাতির মধ্যে বহু লোকের বিশেষ স্মরণীয় ও পূজনীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার

উপদেশামৃত ও উপদেশপূর্ণ পত্রাবলীগুলি অমূল্য গ্রন্থ। তাহা পাঠে মনের মলিনতা দূর ক'রে প্রাণে শান্তিদান করে। তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত সরল ভক্তিপূর্ণ উপদেশ যিনি শ্রবণ ক'রেছেন, তিনিই মুগ্ধ হ'য়েছেন। এ ক্ষুদ্রা নারী তাঁহারই চরণাশ্রিতা।

আমরা একবার সহরটা প্রদক্ষিণ ক'রে বাসায় ফিরলেম, এবং বিশ্রামান্তে রঘুনাথজীউর আরত্রিক দেখ্‌তে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হ'লেম। আজ আমাদের আরত্রিক দেখার শেষ দিন। কারণ আগামী প্রত্যুষে জম্মু ত্যাগ ক'র্‌তে হবে। বাড়ী ফেরবার জন্য মনটা বড় অস্থির হ'য়েছে। কিন্তু ওঁর একান্ত ইচ্ছা যে, পেশওয়ার দেখে বাড়ী ফিরবেন। কাজেই বাড়ী ফির্‌তে এখনও কয়েক দিন বিলম্ব হবে। সুতরাং এখানে আর দেরী না ক'রে আগামী প্রাতেই রওনা হওয়ার দিন স্থির হ'য়েছে।

যথা সময়ে আরত্রিকাদি দর্শন ক'রে রাত্রি প্রায় দশটার সময় বাসায় এসে আহারাদির পর শয়ন ক'রলেম।

প্রত্যাবর্ত্তন

পরদিন ১০ ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার খুব প্রত্যূষে উঠে ভগবান রঘুনাথ জীউর শ্রীচরণ-দর্শন ক'রে সমস্ত ঠাকুরবাড়ীটি প্রদক্ষিণ ক'রে এলাম। পরে তল্পি-তল্পা বেঁধে ষ্টেশনের উদ্দেশে টঙ্গায় এসে ব'সলেম। ষ্টেশনের ধারে তাপ্তী বা তাওয়াই-বক্ষে সেতুটি উল্লেখযোগ্য। প্রশস্ত সুদীর্ঘ সেতুটি লোহার তারের সুন্দর বিনানের দ্বারা নির্ম্মিত। সুবৃহৎ উচ্চ গেটের ছাদ পর্য্যন্ত লোহার তারের দ্বারায় সংযুক্ত। তারের বিচিত্র বিনানের দ্বারায় সেতুর দুই পার্শ্ব প্রাচীরের ন্যায় সুরক্ষিত এবং চারপর্দ্দা তারের বিনানের দ্বারায় গেটের সঙ্গে সংযুক্ত। দর্শনীয় বস্তু বটে।

তাপ্তী-বক্ষে হাতীদের সঙ্গে মাহুতের জলক্রীড়া দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেতু পার হ'য়ে ষ্টেশনে প্রবেশ ক'রলাম। পেশওয়ার যাবার বাসনায় উনি পুনরায় রাওলপিণ্ডির টিকিট ক'রে রেলে উঠ্‌লেন, আমি তো পশ্চাতেই বাঁধা আছি।

সকাল সাতটার সময় আমরা জম্মু ত্যাগ ক'রে শিয়ালকোটের ভিতর দিয়ে ওয়াজিরাবাদ ষ্টেশনে বেলা দশটা আঠার মিনিটের সময় এসে পৌছালাম। এখানে গাড়ী বদল ক'রে বেলা বারটার সময় ফ্রণ্টইয়ার মেল ধ'রে বিকাল চারটা চল্লিশ মিনিটে রাওলপিণ্ডি ষ্টেশনে পৌছালাম; এবং মালপত্রসহ সরাসর কালীবাড়ী গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। পুরোহিত—ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিচিত, সুতরাং বিনা প্রশ্নে ঘর খুলে দিলেন। আমরাও তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে সংক্ষেপে কাশ্মীর-ভ্রমণের ইতিহাস শুনিয়ে দিয়ে তাঁহার কৌতূহলের কতকাংশ নিবৃত্তি ক'রে তখনকার মত ঘর-সংসারে মনোযোগ দিলাম।

পরিচিত স্থানে কোনওরূপ অসুবিধা না হওয়ায় সত্বরেই আহার্য্য প্রস্তুত ক'রে সমস্ত দিনের পর আহারাদি সম্পন্ন ক'রে বিশ্রাম করা গেল।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার হ'তে ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত রাওলপিণ্ডিতে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ দু'টিকে বিশ্রাম দেওয়া গেল। কারণ প্রথমতঃ নানাস্থানে ভ্রমণ জন্য অনাহার ও অনিদ্রায় আমার শরীর অত্যন্ত বিকল হ'য়ে প'ড়েছিল, সেজন্য একটু বিশ্রামেরও আবশ্যক, দ্বিতীয়তঃ কালীবাড়ীটি বেশ নির্জ্জন থাকায় ও কোনও অসুবিধা না হওয়ায় উনি বেশ আনন্দেই ছিলেন। সময়মত আহার, বেড়ান ও আমার এই ভ্রমণ কাহিনী লেখা, এবং উঁহার ইহাতে উৎসাহ দান ব্যতীত আমাদের আর কোন অন্য কোনও বিশেষ কাজই ছিল না—তার উপর পিতৃতুল্য পরম পূজনীয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যত্নে বেশ আনন্দেই ছিলাম। যদিচ মধ্যে মধ্যে দু'এক দিনের জন্য বা কয়েক ঘণ্টার জন্য কেনও কোনও ভ্রমণকারী এখানে আসছিলেন বটে, কিন্তু তাতে আমাদের বিশেষ কোনও অসুবিধা ভোগ ক'রতে হয় নাই, উপরন্তু বিদেশী মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হওয়ায়, বিদেশী তত্ত্ব সংগ্রহে সময়টা ভালই কাটছিল। ওঁর তো বাড়ী ফের্‌বার তত গা ই ছিল না, আমার কিন্তু এত সচ্ছন্দের মধ্যেও বাড়ীর জন্য মন মাঝে মাঝে বড়ই অস্থির হ'চ্ছিল। কাশ্মীর আস্‌বার সময় তো ওঁর পরামর্শমত আত্মীয় স্বজনকে—এমন কি স্নেহময়ী জননীকে পর্য্যন্ত না জানিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি এবং মোমের পুতুল অন্বের নড়ি দেবীকে আমার, কাঁদিয়ে রেখে গাড়ীতে উঠেছি,—দু'টা ছেলে মেয়ের মধ্যে, একটিকে ভগবান নিয়েছেন—অপরটিকে সঙ্গ ছাড়া ক'রে শ্বশুরবাড়ী রেখে একলা বেড়াতে এসেছি। তার উপর শৈশবে মাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র কমল,—

যাকে বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ ক'রেছি—যাদের ফেলে এক পা-ও কোথাও অগ্রসর হইনি, তাদেব কেহই এবার সঙ্গে নাই। এতদিন কি আর থাক্‌তে পারি!

ইতিমধ্যে একদিন উনি পেশওয়ার ঘুরে এলেন। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য পেড়াপিড়ী, কিন্তু এখানে আমার নব পরিচিতা বান্ধবীদের সহিত আলাপে পেশওয়ারে পাঠান্‌-ভীতির যে পরিচয় পেয়েছিলাম, বাপ্‌রে, তাতে আমার ইজ্জতের ভয়ে পেশওয়ার যাবার ইচ্ছা অন্তর হ'তে একেবারে দূর হ'য়েছিল। উনিও তো সে পরিচয় প্রবাসী বন্ধুদের নিকট পেয়েছিলেন। অগত্যা উনি একাই চ'লে গেলেন।

একদিন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে আমাকে রেখে সকাল ছ'টার গাড়ীতে যাত্রা ক'রে পেশওয়ারে 'খাইবার পাসের' পথে 'জামরুদ' দুর্গ পর্য্যন্ত অগ্রসর হ'য়ে, আমার জন্য কতকগুলি কাবুলী ও পেশওয়ারী ফল নিয়ে রাত এগারটার সময় কালীবাড়ীতে এসে হাজিরা দিলেন। অত রাত্রে পেশওয়ার ভ্রমণের বৃত্তান্তরূপ খোস গল্পের মধ্য দিয়ে রন্ধন ও আহারাদি সম্পন্ন হ'য়ে গেল।

এইরূপে আরও দু'চার দিন কাট্‌বার পর বাড়ী ফের্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'লাম। ওঁর যা সাধ—পেশওয়ার যাওয়া—তা তো পূর্ণ হ'য়েছে, তবে আর বাড়ী ফির্‌তে আপত্তি কি? আর আপত্তি হ'লেই বা শুন্‌ছে কে? সুতরাং আমার পেড়াপিড়ীতে বাড়ী আসার দিনস্থির হ'লো।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত রাওলপিণ্ডিতে কাটিয়ে ২০শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার খাওয়া-দাওয়া সেরে, কালী মায়ের ও ভট্টাচার্য্য ম'শায়ের কাছে বিদায় নিয়ে লোকজনকে কিছু কিছু বকশিস্‌ দিয়ে—রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় এ যাত্রার মত কালীবাড়ী ত্যাগ ক'রে ষ্টেশনের দিকে রওনা হ'লাম; এবং রাত্রি এগারটার এক্সপ্রেসে সাহারাণপুরের উদ্দেশে যাত্রা ক'রলাম্‌।

ইচ্ছা ছিল যে, লাহোর ও লক্ষ্ণৌতে বিশ্রাম (হল্ট) ক'রবো, কিন্তু বাড়ীর টানে এবং দাদুর সঙ্গে মিলিত হবার প্রবল আকর্ষণে সে সঙ্কল্প ত্যাগ ক'রে বরাবর হাওড়া আসাই স্থির ক'রলাম। পথে সাহারাণপুরে ও লক্সার জংসনে গাড়ী বদল ক'রে ডেরাডুন এক্সপ্রেসে ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার সকাল প্রায় সাড়ে ছ'টার সময় হাওড়া ষ্টেশনে এসে পৌছালাম, এবং মাল-পত্র সহ দেবীবাবুর বাড়ী ব্যাঁটরা কদমতলায় এসে উপস্থিত হ'লাম।

মোটরের শব্দে আমার দেবীধন, দূর প্রবাস-প্রত্যাগত তার দাদুমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য সদর দরোজায় এসে দাঁড়ালো। মোটর হ'তে নেমে তাড়াতাড়ি তাকে বুকে নিয়ে মুখচুম্বন ক'রে বাড়ীর ভিতর উষারাণীর কাছে চ'লে গেলাম।

শেষ

পরিশিষ্ট

স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে সৌন্দর্য্যময়ী কাশ্মীর,—ভারতের উত্তরে হিমালয়ের মধ্যে অবস্থিত। বহুদূরব্যাপী গভীর পর্ব্বতারণ্য ভেদ ক'রে কাশ্মীরের দ্বারে উপস্থিত হ'তে হয়। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর। সাধারণতঃ শ্রীনগরে যাবার দু'টি রাস্তা, সম্প্রতি আর একটি এবোটাবাদের ভিতর দিয়ে নূতন রাস্তা আবিষ্কৃত হ'য়েছে। রাস্তাগুলির ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।—

১। জম্মু—শ্রীনগর রাস্তা

যান—মোটর বা টঙ্গা

ষ্টেশনের নাম	ষ্টেশনের ব্যবধান মাইল	সমুদ্র-লেভেল হ'তে উচ্চতা ফুট	ভ্রমণকারীর আবশ্যকীয় স্থানের উল্লেখ
জম্মু তাওয়াই (নর্থওয়েষ্টার্ণ রেল ষ্টেশন) কলিকাতা হ'তে ১৩৬৬ মাইল		১২০০	প, ট, র, হ, ধ, ড*
ঝাঝর (জম্মুতাওয়াই হ'তে)	১৯	৩০০০	প, র
উদমপুর	২০	২০০০	প, ট, র
ধরমথাল	১৩	৩৭০০	প, র
বাটোট	২৫	৩৮০০	প, ট, র
রামবাণ	১৭	২৪০০	প, ট, র
রামসু	১৬	৪১০০	প, ড, চ

* প—পোষ্টঅফিস। ট—টেলিগ্রাফ অফিস। র—রেষ্টহাউস। হ—হোটেল। ধ—ধর্ম্মশালা। ড—ডাকবাঙ্গলা। চ—চটি।

ষ্টেশনের নাম	ষ্টেশনের ব্যবধান মাইল	সমুদ-লেভেল হ'তে উচ্চতা ফুট	ভ্রমণকারীর আবশ্যকীয় স্থানের উল্লেখ
বনিহাল	৯	৫৭০০	প, ট, র
বনিহাল পাস (টনেল)	১৯	৯০০০	
মুণ্ডা	১১	৭০০০	র
ভেবিনাগ	২	৬৫০০	প, র
অনন্তনাগ	২১	৫৩০০	প, ট, ব
অবন্তীপুব	১৩	৫২৫০	প, ব
শ্রীনগব	১৮	৫২৫০	
	২০৩		

২। রাওলপিণ্ডি মারি শ্রীনগর রাস্তা

যান—মোটর বা টঙ্গা

ষ্টেশনের নাম	ষ্টেশনের ব্যবধান মাইল	সমুদ্র-লেভেল হ'তে উচ্চতা ফুট	ভ্রমণকারীর আবশ্যকীয় স্থানের উল্লেখ
বাওলপিণ্ডি (নর্থওয়েষ্টার্ণ রেল ষ্টেশন) কলিকাতা হ'তে ১৪৩১ মাইল		১৭২৫	প, ট, হ, ধ
ববাকো (বাওলপিণ্ডি হ'তে)	১৪	১৮০০	
সাত্রামেল	৩	২০৬০	র, টোল
চ্ছাতাব	২	২১০০	র
ট্রেট	৭	৪০০০	প, ট, ড
ঘোড়াগলি	৬	৫২৮০	প, ট

ষ্টেশনের নাম	ষ্টেশনের ব্যবধান মাইল	সমুদ্র-লেভেল হ'তে উচ্চতা ফুট	ভ্রমণকারীর আবশ্যকীয় স্থানের উল্লেখ
স্যানিব্যাঙ্ক	৫	৬০৫০	প, ট, ড, হ
(মারি	৩	৬৭৫০	প. ট, ড, হ)
চিকাগলি	২	৬০০০	
বাগলা	৪	৫৫০০	ধ
ফাগওয়ারী	৭	৩০০০	
ছাবাটা	১০	২১০০	চ
কোহালা	৪	১৮৮০	টোল, প,ট,ড
ডুলাই	১০	২০০০	ট, ড
দো-মেল	১০	২২০০	প,ট,ড, টোল (এখানে মালপত্র পরীক্ষা করা হয়)
গড়হি	১৪	২৭০০	প, ট, ব
চেনারি	১৬	৩৫০০	প, ট, ব
উরি	১৮	৪৪০০	প, ট, ড, চ
রামপুর	১৪	৪৯০০	প
বাঁরমূলা	১৬	৫১০০	প, ট, ড, র
পত্তন	১৭	৫২০০	প, ট, ব
শ্রীনগর	১৮	৫২৫০	
	১৯৭		

প—পোষ্টঅফিস। ট—টেলিগ্রাফ অফিস। র—রেষ্টহাউস। ড—ডাকবাঙ্গলা। চ—চটি। হ—হোটেল। ধ—ধর্ম্মশালা। টোল—টোল গেট (এখানে টোল আদায় হয়)।

৩। হ্যাভেলিয়ান এবোটাবাদ শ্রীনগর রাস্তা

ষ্টেশনের নাম	ষ্টেশনের ব্যবধান মাইল
হ্যাভেলিয়ান—নর্থওয়েষ্টার্ণ রেল ষ্টেশন (তক্ষশীলার মধ্য দিয়া) কলিকাতা হ'তে ১৪৮৬ মাইল	
এবোটাবাদ হ্যাভেলিয়ান হ'তে	৯
মানসেহ্রা	১৬
গাবহি হাবিবুল্লা	১৯
মুজাফাবাবাদ	১৩
দো-মেল	২
.....	....
শ্রীনগর	১১৩
	১৭২

কাশ্মীর একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য। ইহার অধিবাসীর মধ্যে প্রায় চৌদ্দ আনা রকম মুসলমান। মুসলমানের সংখ্যা অধিক হ'লেও রাজাদেশে সমস্ত কাশ্মীরের মধ্যে গো-হত্যা নিষিদ্ধ।

শ্রীনগরের মধ্যে স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে থাক্‌বার যতগুলি হোটেল, ধর্ম্মশালা বা মন্দির আছে, নিম্নে তাহাদের নাম ও ঠিকানা দেওয়া গেল।

১। নেদস্ হোটেল * পোলো গ্রাউণ্ডের নিকট, শ্রীনগর কাশ্মীর।

২। খালসা হোটেল,—পহেলাপুল, (First Bridge), শ্রীনগর, কাশ্মীর।

---

* এই হোটেলটী অনেকটা য়ুরোপীয় ধরণের। অনেক ইংরাজ এখানে অবস্থান করেন।

৩। কাশ্মীর হিন্দু হোটেল [বোটের উপর] পহেলাপুল, শ্রীনগর, কাশ্মীর।

৪। পাঞ্জাব হিন্দু হোটেল—পহেলাপুল, শ্রীনগর, কাশ্মীর।

৫। মুসলিম সাতারা হোটেল—পহেলাপুল, শ্রীনগর, কাশ্মীর।

নিম্নলিখিত স্থানগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অভ্যাগত ৭ দিনের জন্য বিনা ব্যয়ে থাক্‌তে পারেন।

১। সনাতনধর্ম্ম প্রতাপ ভবন—পহেলা পুল, শ্রীনগর, কাশ্মীর।

২। শিক ধর্ম্মশালা—পহেলাপুল, শ্রীনগর, কাশ্মীর।

৩। বদ্রিনাথ ধর্ম্মশালা—শ্রীনগর, কাশ্মীর।

৪। আর্য্যসমাজ মন্দির [কলেজ সেক্সন] হাজুরীবাগ, শ্রীনগর, কাশ্মীর।

৫। আর্য্য সমাজ মন্দির [গুরুকুল সেক্সন] হাজুরীবাগ, শ্রীনগর, কাশ্মীর।

৬। দশনমীখারা—পহেলাপুল, শ্রীনগর, কাশ্মীর।

৭। নারায়ণ মঠ (বাঙ্গালী সাধুর জন্য)—রেশমের কারখানার নিকট, শ্রীনগর, কাশ্মীর।

৮। দুর্গানাগ মন্দির (সাধুদের জন্য)—শঙ্করাচার্য্য পর্ব্বতের নীচে, শ্রীনগর, কাশ্মীর।

৯। রামবাগ (সাধুদের জন্য)—ফ্লোড ক্যানেলের নিকট, শ্রীনগর, কাশ্মীর।

ভ্রমণকারীদের মধ্যে যাঁরা দীর্ঘকাল কাশ্মীরে অবস্থান ক'রবেন, তাঁরা বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত শ্রীনগরে, ও আষাঢ় মাস থেকে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত গুলমার্গ, গান্ধার বল বা পহেলগাম প্রভৃতি স্থানে কাটিয়ে পুনরায় শ্রীনগরে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে

কার্ত্তিক মাসের কয়েকদিন পর্য্যন্ত অবস্থান ক'রলে, সর্ব্ববিষয়ে আনন্দ ও আরাম উপভোগ ক'রতে পারবেন। কারণ ঐ ঐ সময় ভিন্ন অন্য সময় ঐ সকল স্থানে অত্যন্ত ঠাণ্ডা এবং ক্রমে বরফ প'ড়তে আরম্ভ হয়। কাশ্মীর ভ্রমণকারীদের উপযুক্ত শীতবস্ত্রের প্রয়োজন।

হরি পর্ব্বতের উপরিস্থিত দুর্গ হ'তে প্রত্যহ বেলা ১২টার সময় তোপধ্বনি হয় এবং রাত্রি ৮টার সময় সমস্ত সহরের বিজলীবাতি একবার মুহূর্ত্তের জন্য নির্ব্বাণোন্মুখ হয়। এই সঙ্কেত দ্বারা সকলেই নিজ নিজ ঘড়ি রেগুলেট বা সময় নিরূপণ ক'রে নেন।

৬ এবং ৭ নং পুলের মধ্যে 'জেনানা ডায়মণ্ড জুবিলি' হাসপাতাল। উহাতে যথেষ্ট পরিমাণ স্ত্রীলোকদিগের থাকবার ব্যবস্থা আছে। ইহা ভিন্ন পহেলাপুলের নিকট ঝিলমের বাম তীরে 'ষ্টেট হস্পিটাল' ও শঙ্করাচার্য্য পর্ব্বতের নিকট 'মিশন হসপিটাল' আছে।

হাজুরী বাগ এবং ক্লোড ক্যানেলের মধ্যে টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট। ইহাতে কাশ্মীরী শিল্প, চিত্র বিদ্যা, ছুতার মিস্ত্রীর কাজ ও অন্যান্য নানাবিধ শিল্পকলা শিক্ষা দেওয়া হয়।

শ্রীনগরের শিল্ক ফ্যাক্টরী বা রেশমের কারখানা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। প্রায় চারি হাজার ব্যক্তি প্রত্যহ এই কারখানায় কাজ করে।

ইহা ভিন্ন চার্চ্চ, শ্রীনগর ক্লাব, হরি সিং বাগ, প্রতাপ বাগ, স্মাইথ বাগ, সরদার সুলেখান সিং লাইব্রেরী, ষ্টেট ট্রেজারি, গভর্ণার্স আফিস, সি. এম. স্কুল, জুম্মা মসজিদ, সেনট্রাল জেল, কুষ্ঠাশ্রম প্রভৃতি অনেক রকম প্রতিষ্ঠান আছে।

কাশ্মীরে অনেকগুলি তীর্থস্থান আছে। তন্মধ্যে প্রধান এবং দুর্গম তীর্থ অমরনাথ। শ্রীনগর হ'তে ৮৮ মাইল। ১৩৫০০ ফিট উচ্চ

বরফের পর্ব্বতের উপর একটী গুহা,—দৈর্ঘে প্রায় ৫০ ফিট, এবং প্রস্থে প্রায় ৫৫ ফিট। গুহার মধ্যস্থলের উচ্চতা প্রায় ৪৫ ফিট, ইহাই অমরনাথ গুহা বা কেভ। এই গুহার মধ্যে গণেশ, পার্ব্বতী এবং মহাদেবের মূর্ত্তি বিরাজিত। মূর্ত্তিগুলি বরফের। পূর্ণিমায় মূর্ত্তিগুলি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং অমাবস্যায় বরফ গলে গিয়ে সম্পূর্ণ ক্ষয় হ'য়ে যায়। বৎসরের মধ্যে কেবলমাত্র শ্রাবণ পূর্ণিমায় মানব কর্ত্তৃক এই দেব-দেবীর পূজা হয়।

কাশ্মীরের আর আর অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। কিন্তু তাহা সংগ্রহ ক'র্‌তে না পারায় লিপিবদ্ধ ক'র্‌তে পারলেম না।

কাশ্মীর ও জম্বুর রাস্তার নাম—রাজপথ (রয়েল রুট)। কাশ্মীরের মহারাজা এই পথ দিয়ে কাশ্মীর ও জম্বু যাতায়াত করেন। বৈশাখ হ'তে প্রায় কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত এই পথ খোলা থাকে, পরে বরফ প'ড়ে বন্ধ হ'য়ে যায়। শীতকালে মহারাজা সপারিষদ জম্বুতে এসে বাস করেন। জম্বু বহু পুরাতন সহর। তাপ্তী বা তাওয়াই নদী জম্বুকে দু'ভাগে বিভক্ত ক'রে গেছে। তাওয়াই বক্ষে সুন্দর সেতু। নদীর একদিকে রাজবাড়ী ও সহর—অন্যদিকে জম্বু রেলওয়ে ষ্টেশন। সহরের দিকটা জম্বু এবং ষ্টেশনের দিকটা জম্বু তাওয়াই বলে। ষ্টেশনের দিকে সেতুর পরই চুঙ্গি পুলিস (কাষ্টম পোষ্ট) আছে। নূতন মালের উপর মাশুল আদায় করে। জম্বুতে অনেক দেখ্‌বার জিনিষ আছে, তার মধ্যে যে-গুলির বিবরণ সংগ্রহ ক'র্‌তে পেরেছি, সে-গুলি পুস্তকের যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা হ'য়েছে। জম্বুরও সকল তথ্য সংগ্রহ ক'র্‌তে পারি নাই।

'আর্য্যাবর্ত্ত' গ্রন্থের কয়েকটি অভিমত—

বিশ্ববরেণ্য কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় বলেন,—

আর্য্যাবর্ত্ত বইখানিতে লেখিকা সহজ ভাষায় তাঁর ভ্রমণ কাহিনী লিখে গেছেন। তিনি যা—কিছু দেখেছেন ও শুনেছেন তা ব্যক্ত করেছেন নিরলঙ্কার সরল ভাবে, এই কারণে তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অবকাশ কালে পাঠ করবার কালে এ রকম স্বচ্ছ রচনার ধারা পাঠকের কৌতূহলকে স্পর্শ করে যায় এবং তাকে তৃপ্তি দান করে। ইতি ৩০ মার্চ্চ ১৯৩৮ সাল।

মনস্বী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম, এ. বি, এল পি, আর, এস, বলেন,—

শ্রীমতী ননীবালা ঘোষ রচিত—'আর্য্যাবর্ত্ত' পাঠ করে বেশ তৃপ্তি ও প্রীতিলাভ করেছি। এ গ্রন্থ কাশ্মীর ও জম্মু প্রদেশে লেখিকার ভ্রমণ কাহিনী। কাশ্মীরে ভেরিনাগ হইতে মানসবল ও গুলমার্গ হইতে চন্দনবাড়ী পর্য্যন্ত এবং জম্মু সহরের যাবতীয় দর্শনীয় দৃশ্য ও মন্দিরাদির মনোরম বিবরণ নিবদ্ধ থাকায় গ্রন্থখানি কাশ্মীর যাত্রীর অবশ্য সঙ্গী হইয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে সাড়া দিবার এবং ঐ সৌন্দর্য্য বোধ সুচারু ভাষায় বর্ণন করিবার লেখিকার বেশ ক্ষমতা আছে। তাঁহার লেখনীর গুণে বর্ণিত বস্তু চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠে এবং চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের আনন্দ দান

করে লেখিকার প্রাণের মধ্যে একটি গভীর ধর্ম্ম ভাব প্রচ্ছন্ন আছে—গন্থের স্থানে স্থানে যেন অনিচ্ছায় তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ গ্রন্থের বহুল প্রচার দেখিলে সুখী হইব।

লেখিকা ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন—রাজপুতানা ঐ সকল স্থানের অন্যতম তিনি যদি রাজস্থানের একখানি ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশ করেন তবে বাঙ্গালী পাঠক তাহা সাদরে গ্রহণ করিবে।

সাহিত্যাচার্য্য রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলেন,—

কোন স্থানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, যিনি যেমন ক'রেই লিখুন না কেন, আমার পড়তে ভাল লাগে, আমি পরম আগ্রহের সঙ্গে সে বৃত্তান্তের আগাগোড়া না পড়ে থাকৃতে পারিনে। তার পরে, সে বৃত্তান্ত যদি সুলিখিত হয়, তাতে লেখকের প্রাণের যোগ থাকে, তা হ'লে আমি সে বৃত্তান্ত একবার দুইবার নয়, বহুবার পড়ি, তা'তেও আমার আশা মেটে না এই 'আর্য্যাবর্ত্ত' গ্রন্থখানিকে আমি শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত করেছি—আমি এখানি অনেক বার পড়েছি, আরও অনেক বার পড়ব। একে ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের বিবরণ, তাতে লিখেছেন এক পুত্রশোকাতুরা বঙ্গ জননী; এ বই যে ভাল না হয়েই পারে না—এতে যে লেখিকার মাতৃহৃদয় ঢেলে দেওয়া আছে।

কাশ্মীর ভ্রমণ সম্বন্ধে ইংরাজি ভাষায় লিখিত কয়েকখানি সুন্দর গ্রন্থ আছে, বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত দুই চারিখানি গ্রন্থও পড়েছি, মাসিক পত্রেও কয়েকটী প্রবন্ধ পড়েছি। 'আর্য্যাবর্ত্ত' গ্রন্থের লেখিকার গ্রন্থও পড়লাম, বর্ণনার কোন ত্রুটী ত দেখ্‌তে পেলাম না, সংগ্রহেরও কোন অভাব বোধ হোলো না। তবে, আমার ভাগ্যে কাশ্মীর ভ্রমণ হয় নি,

কাজেই আমি কাশ্মীরের শোভা সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ করবার অধিকারী নই; আমার পড়া—বিদ্যার উপরনির্ভর করেই উপরি উক্ত মন্তব্য করলাম। তবে, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বল্‌তে পারি যে, এই ভ্রমণ বৃত্তান্তের লেখিকা মহোদয়া যা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা, যারা কাশ্মীর বেড়িয়ে দেখে এসেছেন, তাঁদেরও মনোরঞ্জন করবে, আমি যে দেখিনি, এ জীবনেও আর দেখবার সুযোগও হবে না, আমি এই বইখানি পড়েই আমার কাশ্মীর ভ্রমণের সাধ মিটালাম। লেখিকা মহোদয়াকে আমি সাহিত্য ক্ষেত্রে সাদরে বরণ করছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় বলেন,—

শ্রীমতী ননীবালা ঘোষ প্রণীত—"আর্য্যাবর্ত্ত" পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। হাওড়া হইতে ট্রেণযোগে রাওলপিণ্ডি যাত্রা পরে তক্ষশীলা পরিদর্শন করিয়া কাশ্মীরযাত্রা কালে সমস্ত অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সহজ সরল ভাষায় সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। কাশ্মীরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে লেখিকা স্বয়ং মুগ্ধা হইয়া অন্যকেও ততোধিক মুগ্ধ করিতে সমর্থা হইয়াছেন। পুস্তকখানি কাশ্মীর যাত্রীর পক্ষে যেরূপ অত্যাবশ্যকীয় সাধারণ পাঠক পাঠিকার পক্ষেও সেইরূপ উপন্যাসের ন্যায় মনোরম। এই গ্রন্থ বঙ্গ সাহিত্যে এক বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছে। আশা করি লেখিকা তাঁহার অন্যান্য ভ্রমণ কাহিনীও এইরূপ সরস ভাষায় বর্ণনা করিয়া

সাধারণের কৌতূহল ও আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। পুত্র শোকাতুরা জননীর স্বর্গীয় পুত্রের উদ্দেশে গ্রন্থোৎসর্গ পাঠে কোন সহৃদয় ব্যক্তি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিবে না। ইতি তারিখ ২২শে ফাল্গুন, সন ১৩৪ সাল।

সাহিত্যরসজ্ঞ প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস, মহোদয় লিখিয়াছেন,—

লেখিকার স্বামী শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ ঘোষ মহাশয়, আমার বহু দিনের সুপরিচিত। ইনি একজন নিপুণ চিত্রশিল্পী, কিন্তু ইঁহার স্ত্রীও যে এরূপ উচ্চদরের রচণাশিল্পী ও কবি, ইহা আমার আদৌ জানা ছিল না। লেখিকা বনিষ্ঠ বাঙ্গালী ঘরের কুলবধূ। ইঁহার ধর্ম্মভাব এবং ইঁহার অসাধারণ বাহ্য ও অন্তঃদৃষ্টি, ইঁহার লেখার, প্রত্যেক ছত্রে প্রতিভাত। পুস্তকখানি, বাঙ্গালার ভ্রমণ সাহিত্যের, একটি রত্ন বিশেষ সাধারণ স্ত্রীলোকের রচনায়, যে সকল উদ্দাম ভাবের উচ্ছাস থাকে, তাহা এই পুস্তকে আদৌ নাই ইঁহার ভাষা সংযত মার্জ্জিত এবং সুনিপুণ। পাকা হাত ভিন্ন এরূপ লেখা সম্ভবে না। পুস্তক-বর্ণিত স্থানগুলি, কখন নিজ চক্ষে না দেখিলেও পাঠকালে যেন, চক্ষের সামনে দেখিতেছেন বলিয়া ভ্রম হইবে। আবার, আমার মত, যাহারা এই স্থানগুলি পূর্ব্বে একবার দেখিয়াছেন, তাঁহারাও এই পুস্তকের বর্ণনা পড়িয়া, স্থানগুলিকে পুনরায় দেখিবার জন্য, ব্যাকুল হইয়া উঠিবেন। রচনার সজীবতা সরসতা ও মর্ম্মস্পর্শীতা এতই অসামান্য। লেখিকা, এই পুস্তকে আমাদের জাতীয় ইতিহাস, অতি যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়াছেন, পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে প্রত্যেক ঘটনার খুটিনাটীর প্রতি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং প্রাণ ঢালিয়া

নিজেকে বিলাইয়া, বিষয় সকল, অতি নিপুণ ভাবে বর্ণন করিয়াছেন ভূস্বর্গ কাশ্মীর দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ঘটিলেও দৃষ্টির অভাবে, উপভোগের তারতম্য সকলকেই ভোগ করিতে হয়। এই পুস্তকখানি সঙ্গে থাকিলে, উপভোগের মাত্রা যে সকলেরই অনেক গুণ বর্দ্ধিত হইবে, ইহা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি ভগবান, লেখিকার পুত্রশোক নিবারণ করিয়া, তাহাকে সত্বর শান্তি দিউন ও দীর্ঘায়ুঃ করুন, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিন্দ্রনাথ ঠাকুর বি. এ, তত্ত্বনিধি বলেন,—

গ্রন্থখানির নাম আর্য্যাবর্ত্ত, কিন্তু ইহা প্রকৃত পক্ষে কাশ্মীর যাত্রার একখানি ভ্রমণ কাহিনী। ইহা ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি আকারের ২৬৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহাতে ৫৮ খানি চিত্র ও কাশ্মীরের একখানি মানচিত্র আছে। বই খানির কাগজ ছাপা এবং বাঁধাই ভালই হইয়াছে। গ্রন্থখানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি এবং লেখিকার রচনা ভঙ্গী দেখিয়া খুবই আনন্দ অনুভব করিয়াছি। আনন্দ অনুভবের আর একটি কারণ এই যে, ইহাতে ব্রাহ্ম সমাজ প্রবর্ত্তিত স্ত্রী শিক্ষার প্রভাব পদে পদে দেখিতে পাই। সেই যে, বেথুন সাহেব, বেথুন স্কুল স্থাপন করিবার পর ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত পরিবার হইতে বালিকা শিক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিল, আজ তাহারই ফলে, স্ত্রী শিক্ষা বলিতে গেলে প্রত্যেক ভারত বাসীর গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ইহাই আমাদের বিশেষ আনন্দের কারণ।

এই গ্রন্থ কাশ্মীর যাত্রীর পক্ষে বিশেষ সহায় হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। লেখিকা তাঁহার যাত্রা পথের, প্রত্যেক স্থানের সম্বন্ধে, যথা সম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই কারণে কোন কাশ্মীর যাত্রীর পক্ষে কোন বিষয়ে সন্ধান পাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না

আমরা কাশ্মীর ভ্রমণ সম্বন্ধে আরও কয়েক খানি বঙ্গভাষায় লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। সেগুলিও বিশেষ মনোরম বটে, কিন্তু এই লেখিকার রচনা ভঙ্গি তাহাদের হইতে একটু পৃথক এবং সেই পার্থক্যের ভিতর হইতে এই গ্রন্থের সৌন্দর্য্য বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিযাছে। গ্রন্থের রচনা বেশ প্রাঞ্জল এবং সেই কারণে ইহা কোমলমতি বালক বালিকাদের পড়িবার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ইংরাজিতে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত সুন্দর সুন্দর ভ্রমণ কাহিনী যথেষ্ট আছে এবং ইংরাজ বালক বালিকাগণ সেই সকল পাঠ করিযা অন্তরে ভ্রমণ স্পৃহা পোষণ করে। সুখের বিষয় বঙ্গভাষায় লিখিত অনেকগুলি বালক বালিকাদের পড়িবার উপযুক্ত ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশিত হইতেছে, এবং আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি সেই সকল ভ্রমণ কাহিনী পড়িয়া অনেক বাঙ্গালী বালক ও যুবক ভ্রমণ স্পৃহা চরিতার্থ করিতে সক্ষম হইতেছে। লেখিকার রচনা গুণে গ্রন্থখানি উপন্যাসের ন্যায় মনোরম হইযাছে। তবে আমাদের মনে হয় যে ইহাতে ব্যক্তিগত ভাবে যে সকল বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে সে গুলি কতক কতক বাদ দিলে ভাল হইত।

এই গ্রন্থে লেখিকা অনেক গুলি মূল্যবান ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। যাঁহারা কাশ্মীর পথের স্থান বিষযে অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এই সকল তত্ত্ব হইতে গবেষণার অনেক ইঙ্গিত পাইবেন।

আমরা প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পাঠাগারে এই গ্রন্থ রক্ষিত দেখিলে বড়ই সুখী হইব।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ দাস মহাশয় বলেন,—

আর্য্যাবর্ত্ত। শ্রীমতী ননীবালা ঘোষজায়া প্রণীত। পড়িয়া যুগপৎ কৌতূহল, আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। প্রণেত্রীকে পূর্ব্বে জানিতাম বটে, কিন্তু কেবল বন্ধুপত্নী বলিয়া: এখন নূতন করিয়া রচয়িত্রী বলিয়া চিনিলাম। রচয়িত্রীর স্বভাব বর্ণনা, সরল হৃদয়স্পর্শী ও মনোমুগ্ধকর। তাঁহার লেখনী গুণে আমার একসঙ্গে কাশ্মীর দর্শন হইল ও কাশ্মীর দর্শনের বলবতী পিপাসাও জন্মিল। বহিখানি প্রচার করিয়া কাশ্মীর যাত্রী মাত্রেরই এক পরম সহায় ও সঙ্গী দিয়াছেন ও সর্ব্ব সাধারণকে ঘরে বসিয়া কাশ্মীর ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করাইয়াছেন, এ জন্য গ্রন্থকর্ত্রী সকলের ধন্যবাদের পাত্রী। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, বি, এ, লিখিয়াছেন,—

কল্যাণী শ্রীমতী ননীবালা ঘোষ,—আপনার উপহৃত পুস্তক 'আর্য্যাবর্ত্ত' পাইয়া অনুগৃহীত ও পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। আপনার পুস্তক সম্বন্ধে মত প্রকাশে আমি কুণ্ঠানুভব করিতেছি; তাহার কারণ, ইহার উৎসর্গাংশেই আপনার ও আমার মধ্যে ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি করিয়াছে। আমিও সন্তান

বিয়োগ বেদনা বুকে বহন করিয়া দিনপাত করিতেছি, আমিও সাহিত্য সেবায় সে বেদনা প্রশমিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

আমাকে কার্য্যব্যপদেশে স্বদেশে ও বিদেশে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে, কাজেই অল্পকাল মধ্যে দৃষ্ট স্থানের সৌন্দর্য্য ভাষায় প্রকাশ করা কিরূপ দুষ্কর তাহা আমি জানি। আপনি সেই দুষ্কর কার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। একরূপ ভ্রমণ পুস্তক বাঙ্গালা সাহিত্যে অধিক নাই এবং ইহা যে কাশ্মীর শোভা সম্ভোগাভিলাষী বাঙ্গালী নরনারীর অবলম্বন হইবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। আপনার রচনার স্বাভাবিক গতি পাঠককে মুগ্ধ করে।

আশীর্ব্বাদ করি, আপনি এইরূপ আরও রচনার দ্বারা আমাদিগের জাতীয় সাহিত্য সমৃদ্ধ করুন এবং সাহিত্য সাধনায় যে শোকের শান্তি নাই তাহাতে সান্ত্বনা লাভ করুন। শুভার্থী শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

"কান্তকবি রজনীকান্ত" প্রণেতা সাহিত্য বন্ধু শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলেন,—

আমার বহুদিনের পরিচিত বন্ধু শ্রীযুক্ত শশীভূষণ ঘোষ মহাশয়ের পত্নীর লেখা "আর্য্যাবর্ত্তের" পাণ্ডুলিপি যখন আমি প্রথম পাঠ করি, তখনই আমি বিশ্বাসই করিতে পারি নাই যে, ইহা একজন মহিলার রচনা এবং তিনি আমার শ্রদ্ধেয়া বন্ধুপত্নী। প্রথম পাঠকালেই আমার মনে হয়, ইহা পাকা হাতের লেখা এবং প্রকাশের একান্ত উপযোগী। শীঘ্রই ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার জন্য আমি বন্ধুবরকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি।

আমার সে অনুরোধ বন্ধুবর রক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহার ও আমার

উভয়েরই বিশেষ আনন্দের কথা এই যে পুস্তকখানি ইতিমধ্যেই সাধারণে আদৃত হইয়াছে।

সরল ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তিনি কাশ্মীরের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা কেবল ভ্রমণকারীর কাছে নয়, ঐতিহাসিকের নিকটেও আদৃত হইবে। করুণার যে মর্ম্মঘাতি আঘাতে একদিন মহাকবি বাল্মীকির অমর লেখনীমুখে রামায়ণ মহাকাব্যের উদ্ভব হইয়াছিল, শ্রদ্ধেয়া লেখিকাও তেমনি একমাত্র পুত্রের বিয়োগ বেদনায় আহত হইয়া এই গ্রন্থের সূচনা করিয়াছেন। আমার মনে হয়, শোক সঞ্জাত বলিয়াই গ্রন্থখানি এমন সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। পরলোকগত পুত্রের উদ্দেশে লিখিত "উৎসর্গ পত্র" পড়িতে পড়িতে চোখের জল ফেলিতে হইয়াছে। জানি না—ইহলোকের মায়াজাল কাটাইয়া যে আজ পরলোকের অধিবাসী হইয়াছে—মাতৃদত্ত এই মর্ম্মঘাতী অশ্রুহার তাহারও নয়নকে অশ্রুসিক্ত করিতেছে কি না? তিনি তীক্ষ্ণধীশালিনী ও ভাবময়ী—প্রকাশের ভাষার উপরেও তাঁর বেশ অধিকার আছে। প্রার্থনা করি, কেবল একটি পুষ্পহারে নয়, 'অগণিত পুষ্পহারে তিনি বঙ্গ ভারতীর কমকণ্ঠের শোভা বর্দ্ধিত করুণ; তাঁহার একনিষ্ঠ সেবায় বঙ্গভাষার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হউক।

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার মনীষী ডক্টর শ্রীযুক্ত আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, পি, আর, এস, পি, এইচ ডি, আই, ই, এস, মহোদয় বলেন,—

I have read with great pleasure, and also profit, "Arya-Varta" or an account of travels in Kashmir by Srimati Nani Bala Ghosh The writer has a natural graceful, vivid style holding up to the eyes the places which she visited. The verses suggested by the places which she describes, and with which the book is inter spersed, are the outcome of an earnest, religious soul, and breathe a pure lofty, beautiful sentiment. The excellent photographs further enhance the value of the book. I have nothing but unstinted praise for this work, and it will be a very valuable addition to Bengali Literature which contains very few books of travels.

প্রবীণ সাহিত্যসেবী ডক্টর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ, ডি, লিট্, বলেন,—

শ্রীমতী ননীবালা ঘোষ প্রণীত—'আর্য্যাবর্ত্ত' নামক ১৬৬ পৃষ্ঠা ব্যাপক ভ্রমণ কাহিনীখানি পড়িলাম। যাঁহারা উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ভ্রমণ করিবেন, তাঁহাদের হাতে এই বইখানি থাকিলে অনেক উপকার হইবে।

ইহা এক সঙ্গে আর্য্যাবর্ত্তের ভূগোল ও ইতিহাস, কিন্তু মাঝে মাঝে কতকগুলি শুষ্ক বিষয়ের বিবরণ থাকিলেও লেখার ভঙ্গীটি এমনই সরস ও কৌতুহলোদ্দীপক, যে এই বৃহৎ পুস্তকখানি আমরা একটি চিত্তাকর্ষক গল্পের মত এক টানা মনোযোগের সঙ্গে পড়িয়া ফেলিয়াছি।

আর্য্যাবর্ত্তের বিচিত্র দৃশ্য—বিশেষ করিয়া ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের বিবরণ আলেখ্যের মত মনোজ্ঞ হইয়াছে, যেখানে বন্ধুর পাহাড় গাত্র হইতে ঝিলম নদী বহির্গত হইয়া নূপুর সিঞ্জিত চরণা কিশোরীর মত চটুল গতিতে বহিয়া চলিয়াছে, সেখানে লেখিকা মনে করিয়াছেন যেন কোন রূপসী বালিকা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে,—তাঁহার বর্ণনা, স্থানে স্থানে এইরূপ কবিত্ব-ছন্দে পাঠককে মুগ্ধ করিবে; এই কবিত্ব কোন কোন স্থানে গদ্যের নিগড় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ছন্দ পরিগ্রহ পূর্ব্বক পয়ার অথবা ত্রিপদী রূপে ধরা দিয়াছে।

এই বহু ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বৃত্তান্ত সমন্বিত বহিখানি-প্রকৃত পক্ষে ইতিহাসও নহে ভূগোলও নহে। এই দুই উপাদান ইহার বাহ্য মুখোস মাত্র।

এই দীর্ঘ কাহিনীর সর্ব্বত্র আমরা বঙ্গলক্ষ্মীর স্নেহসারে স্নিত কোমল হৃদয়ের পরিচয় পাই, ইহাতে সন্তান বিরহী মায়ের ছবি যেমন ফুটিয়াছে, তেমনই তীর্থদর্শন কামী ভক্তিপ্লুত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নির্ঝরের মত চারিদিকে বহিয়া গিয়াছে। লেখিকার সঙ্গী তাঁহার স্বামী। স্বামী—প্রেম বঙ্গলক্ষ্মীর হৃদয়ের গুপ্তধন—কিন্তু লেখিকার লজ্জা ও সম্ভ্রমের কোথায়ও কোন ব্যত্যয় না হইলেও সেই সুগভীর দাম্পত্য-প্রেম তিনি পাঠকের কাছে গোপন করিতে পারেন নাই। অর্দ্ধ স্ফুট পুষ্পের ন্যায় তাহা মাঝে মাঝে ধরা পড়িয়াছে। কাশ্মীরে যাইবার কোন প্রবৃত্তি লেখিকার ছিল

া, কিন্তু পাছে স্বামী ক্ষুন্ন হন—এজন্য তিনি নিজের অনিচ্ছা হৃদয়ে গোপন রিয়া হাসি মুখে স্বামীর সাহচর্য্য গ্রহণ করিলেন। যেখানে কাশ্মীরের াহাড়—পথে ইনি ছায়ার ন্যায় স্বামীর পেছন পেছন যাইতেছিলেন, খন তাঁহার মনে হইয়াছিল—হিমাদ্রি-পথে যেরূপ দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের শ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে যাইতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেইরূপ ইলে সে মৃত্যু কি সুখের হয়। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে স্বামীর হৃদয়ে কি াব উপস্থিত হইবে, তাহা জানিতে ঔৎসুক্য হইয়াছিল, পরক্ষণেই াহাকে হারাইয়া সেই নির্জ্জন শৈল প্রদেশে তাঁহার স্বামীর কি দুর্দ্দশা ইবে ভাবিয়া মন ব্যথিত হয় এবং তিনি তাঁহার অবাধ কল্পনার গতি ংযত করেন। দাম্পত্য প্রেমের সঙ্গে দাম্পত্য কলহ অবিচ্ছিন্ন, তাহারও ারিচয় পুস্তক খানিতে আছে। কোন ষ্টেশনে স্বামী অতি দ্রুততায় লখিকার পানের কৌটাটি ফেলিয়া আসিয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলেন। রৌদ্র-বৃষ্টিতে উজ্জ্বল মাঘমাসের আকাশের মত হাসি প্রেম ও অশ্রু লখিকার ছবিখানি আমাদিগের চক্ষে বড়ই চিত্তাকর্ষক করিয়াছে।

ইতিহাসাংশের মধ্যে তক্ষশীলার প্রাচীন কাহিনীটি আমাদের নিকট অতি শিক্ষাপ্রদ ও উপাদেয় মনে হইয়াছে।

AMRITABAZAR PATRIKA. April 1,—1934

Aryavarta—By Srimati Nanibala Ghose · Profusely Illustrated. To be had of Sj. Sashibhusan Ghose, Dhap-dhapi (24 Parganas) and of Messrs. Gurudas Chatterjee

and Sons. 203 1-1, Cornwallis Street, Calcutta. Pp. 258: Price Rupees Two only.

We welcome the publication of this fascinating book of travel as such books written by women are very few in number. It is the account of a journey taken to the fairy land of Kashmir not by the modern English educated woman but by one who passes her days in the peaceful privacy of the Hindu home. She has said all that could possibly be said about Kashmir which has always attracted visitors of diverse nationalities. To Bengalee visitors the book will serve not only as a faithful guide but as one that is full of interesting descriptions of many temples and institutions The printing and get-up of the book leave nothing to be desired

---

হিতবাদী, ১৮ই ফাল্গুন---১৩৭০

লেখিকা এই গ্রন্থে রাওলপিণ্ডি তক্ষশীলা, কাশ্মীর, শ্রীনগর ও জম্মু ভ্রমনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিযাছেন। ঐ সকল স্থানের বহু চিত্রও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। এত দূরদেশে যাওয়া সকল বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটিযা উঠে না; যাহারা যাইতে অসমর্থ, তাঁহাদিগকে ঐ সকল দেশের কথা বুঝাইয়া দিয়া আনন্দ প্রদানই গ্রন্থকর্ত্রীর লেখনীধারণের উদ্দেশ্য। তাঁহার সে উদ্দেশ্য যে সার্থক হইয়াছে, তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক সুবিখ্যাত শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার

মহাশয়ের লিখিত নিম্নোদ্ধৃত কয়টি লাইন পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—"বইএর ভিতর পাই, পর্য্যটনের গতিভঙ্গী, আর নদী, পর্ব্বত, বন, জঙ্গল ও হরেক রকম নরনারীর সঙ্গে কুটুম্বীতা পাতাইবার নেশা। * * খুটিনাটি গুলা বেশ ঠিকঠাক ধরিয়া রাখিবার দিকেই তাঁহার মেজাজ খেলিয়াছে।" আমরাও বইখানি পাঠ করিয়া ভ্রমণের আনন্দ লাভ করিয়াছি। লেখিকা ভ্রমণের সময় সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধেই অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং সেই অনুসন্ধানের ফলাফল বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকে প্রদত্ত চিত্রগুলিও বেশ চিত্তাকর্ষক। লেখিকার এই উদ্যম প্রশংসনীয়। যাঁহারা দেশবিদেশের কথা জানিতে চাহেন ও ভ্রমণের বাতিক যাহাদের আছে, তাঁহারা এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারেন, সময়ে ইহা কাজে লাগিবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ই মাঘ---১৩৪০

বহু হাপ-টোন চিত্র শোভিত এবং কাশ্মীরের মানচিত্র সহ কাশ্মীর ভ্রমণ কাহিনী। লেখিকা ভূঃস্বর্গ কাশ্মীরের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া যাহা দেখিয়াছেন শুনিয়াছেন, তাহাই অতি সরল ও সুললিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। কাশ্মীরের নৈসর্গ শোভায় মুগ্ধ লেখিকা কয়েকটি কবিতাও লিখিয়াছিলেন, তাহাও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাশ্মীর সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ ও অথচ সুখপাঠ্য এই সুন্দর বইখানি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

বঙ্গবাসী, ১৯শে ফাল্গুন---১৩৪০

আর্য্যাবর্ত্ত। (সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী)। শ্রীমতী নলিনীবালা ঘোষ

প্রণীত। মূল্য ২৲ দুই টাকা। প্রকাশক—শ্রীবিভূতিভূষণ বসু মল্লিক বি-এস-সি, ৩০ নং নরসিংহ দত্ত রোড, দক্ষিণ বাঁটরা, হাওড়া।

পল্লীগ্রামের এক বিদূষী হিন্দু মহিলার লেখা এই পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। ইহার নাম 'আর্য্যাবর্ত্ত' কিন্তু আদ্যোপান্ত কেবল কাশ্মীরের বিবরণে পূর্ণ। লেখার একটা নিজস্ব ভঙ্গী আছে এবং তাহা মনোরম। তবে, তিনি লেখার ভাষার গণ্ডী ছাড়িয়া কথার ভাষাতেই পুস্তকখানি আরম্ভ ও শেষ করিয়াছেন। লেখিকা কাশ্মীরের নানা স্থানে ঘুরিয়া যাহা দেখিয়াছেন, তাহারই বিবরণ নিপুণতার সহিত এই পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনার সরসতা ও সজীবতা পুস্তকখানিকে বাঙ্গালা সাহিত্যভাণ্ডারে মূল্যবান উপহারের মর্য্যাদা দান করিয়াছে। কাশ্মীরের শোভা যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে ঘরে বসিয়াই অনেকটা দেখার আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাও এই পুস্তক পাঠে আনন্দলাভ করিবেন কারণ, ইহার বর্ণনাকৌশলে দৃশ্যগুলি অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। রঙীন অরঙীন অনেকগুলি চি[ত্র] পুস্তকের অঙ্গ সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

দৈনিক বসুমতী, ২৮শে মাঘ—১৩৪০

আর্য্যাবর্ত্ত—শ্রীমতীননীবালা ঘোষ প্রণীত, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালি ষ্ট্রীটে ও অন্যান্য গ্রন্থালয়ে প্রাপ্তব্য মূল্য দুই টাকা।

এখানি সচিত্র ভ্রমণ কাহিনী। এখানির 'আর্য্যাবর্ত্ত' সংজ্ঞা না হইয়া 'কাশ্মীর' আখ্যা হইলেও সঙ্গত হইত। কারণ, এই সুদীর্ঘ ২ শত ৬৫ পৃ[ষ্ঠা]

ব্যাপী ভ্রমণ বৃত্তান্তে কেবল কাশ্মীর ও জম্মুর বিবরণ পাওয়া যায়। আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য অংশের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। ভূস্বর্গ কাশ্মীরের বিবরণ ইহার পূর্ব্বে অনেকেই লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও ইহার বর্ণনা কখনও পুরাতন অথবা অপ্রীতিকর বলিয়া মনে হয় না। ভারতবর্ষে এক পেশোলা হ্রদতটস্থ আরাবল্লী পর্ব্বতমালা বেষ্টিত উদয়পুর ব্যতীত কাশ্মীরের ন্যায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমণ্ডিত স্থান আর কোথাও আছে বলিয়া জানা নাই। গ্রন্থ রচয়িত্রী শিক্ষিতা মহিলা, পরন্তু হিন্দু গৃহিণী সুতরাং তাঁহার রচনায় যাহা আশা করা যায়, তাহাই আছে। কথিত ভাষা ব্যবহার করিলেও রচয়িত্রী তাঁহার বর্ণনা ভঙ্গিতে এবং অনায়াস গতি হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে পাঠককে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি কাশ্মীরে তুষারমণ্ডিত উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালার, বেগবতী গিরিনদী, বৃক্ষ লতা মণ্ডিত মনোরম উদ্যান এবং সৌধ প্রাসাদ মন্দিরাদির কথা রচয়িত্রী চিত্তাকর্ষক ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন। বিশেষতঃ কয়েকখানি চিত্র ও কাশ্মীরের মানচিত্র যোজনা করায় গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। শীতের তুষারপাতে সমগ্র দেশ শ্বেতবর্ণ ধারণ করে, বৃক্ষ সকল পল্লবহীন হয়; কিন্তু বসন্তাগমে নব অঙ্কুরিত চিত্র বিচিত্র তৃণগুল্মে সমস্ত পর্ব্বতগাত্র ও উপত্যকাভূমি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, আর পর্ব্বত-দুহিতা বিতস্তার রজতধারার শোভায় সৌগন্ধে কাল ভুজঙ্গিনীর মত শ্রীনগরকে বেষ্টন করিয়া চন্দন-তরুর স্বরূপ রূপের লহরী লীলা ছড়াইয়া আনন্দে কলকল স্বরে নিম্নগামিনী হইতেছে,—এ দৃশ্য যে দেখিয়াছে, সে ভুলিতে পারে না। গ্রন্থ রচয়িত্রীও যে ভুলিতে পারেন নাই, তাহার পরিচয় তাঁহার রচনার বহুস্থানে পাওয়া যায়।